মুদ্রাভঙ্গ

সমরেশ মজুমদার

মুদ্রাভঙ্গ

সমরেশ মজুমদার

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২

© সমরেশ মজুমদার

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-088-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

MUDRABHANGA
[Novel]
by
Samaresh Majumder
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

কমল চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

চারপাশে ছায়াছায়া অন্ধকার। কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না সে। খানিক বাদে বুঝতে পারল জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে বুনো ঝোপ, লতানো উদ্ভিদ। সে শুয়ে আছে চিত হয়ে অথচ মাথার ওপর কোনও আকাশ নেই। ধীরে ধীরে উঠে বসল। দুটো পা সামনের দিকে প্রসারিত, কোমর থেকে ঊর্ধ্বাঙ্গ সোজা হল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল আশপাশে কোনও পথ নেই।

এখন তার শরীরে কোনও ক্লান্তি নেই। যেন দীর্ঘ এবং শান্তির ঘুম তাকে পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছে। কিন্তু আশপাশের বুনো ঝোপ আর লতাগুলো কীরকম অদ্ভুত! কোনও গন্ধ নেই, সে হাত বাড়িয়ে দেখল কোনও পাতাও নেই। ডালগুলো খুব শুকনো, খসখসে। এরকম জায়গায় সে কীভাবে এল? মনে করতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু কেবলই ধাক্কা খাচ্ছিল তার স্মরণশক্তি। শুধু মনে হচ্ছিল সে শুয়েছিল। এই একটু আগে যেভাবে চিত হয়েছিল ঠিক সেভাবেই। তার শায়িত শরীর দুলছিল। আশপাশে কেউ কথা বলছিল না। তার মতোই কি সবাই ঘুমন্ত ছিল? কিন্তু তার আগে অথবা পরের কিছুই তার মনে পড়ছিল না। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল। আঃ, খুব হালকা লাগছে নিজেকে। কেউ যেন তাকে ওজন কমাতে বলেছিল। ওজন কমালে শরীর ভাল থাকে। যেহেতু এখন নিজেকে খুব হালকা লাগছে তাই তার শরীর নিশ্চয়ই ভাল হয়ে গেছে! কিন্তু তার শরীর কি আগে খারাপ ছিল? মাথা নাড়ল সে, মনে আসছে না।

কয়েক পা হাঁটল সে বুনো ঝোপ সরিয়ে। তাকে ওপরে উঠতে হচ্ছে। অর্থাৎ পাহাড়ের একটা ধাপে রয়েছিল এতক্ষণ। আর একটু উঠতেই পাহাড়ের ওপাশে ছায়াছায়া উপত্যকা দেখতে পেল। আশ্চর্যে ভরা উপত্যকা। এবং তখনই সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ল সেই উপত্যকায়। চারধার সাদা হয়ে যাচ্ছিল। আলো ঘন হতে হতে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ল পাহাড়ে আর সেই ঢেউয়ে সে ভেসে যাচ্ছিল। কখনও ডুবে যাচ্ছে কখনও শ্বাস নেওয়ার জন্যে মুখ তুলছে ওপরে। কতক্ষণ ধরে সে নাকানি-চোবানি খেয়েছিল জানা

নেই, হঠাৎ পায়ের পাতা দুটো একটা শক্ত জায়গা ছোঁয়ামাত্র আটকে গেল। তখন সমস্ত শরীর ঢেউয়ের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে কিন্তু দুটো পা নড়ছে না। তারপর আচমকা ঢেউ সরে গেল। চারধার ছায়ায় মোড়া। সামনেই একটা পথ যেটা নীচ থেকে ওপরে উঠে গেছে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে পথের পাশের জঙ্গলে। কোনও পাখিকেই উড়তে দেখতে পেল না। সে চোখ বন্ধ করল। এই পথ কোথায় গিয়েছে? এই অন্ধকার অরণ্য যেন ক্রমশ বুকের ভেতরে চলে এল। সে তার ভেতরে নিজেকে খুঁজতে শুরু করল। তার মনে হল চারপাশে ভয়ংকর পশুরা ওত পেতে আছে। এই বন্য জন্তুরা মাঝে মাঝেই হুংকার ছাড়ছে। এরা কি তার একজীবনের পাপ? সে কি এখন পাপের পরিমণ্ডলে আটকে রয়েছে? তার লোভ, অহংকার, স্বার্থপরতাগুলো এখন বন্য হিংস্র জন্তুর মতো আহত হয়ে গোঙাচ্ছে? তার পরেই পথের প্রান্তে একটি সিংহকে দেখা গেল। তার দুটো চোখে আগুন জ্বলছে, কেশর ফুলে ভয়ংকর দেখাচ্ছে। দ্রুত সে ছুটে আসছে গর্বিত পদক্ষেপে। কিন্তু তার কাছাকাছি আসামাত্র সে আর্তনাদ করতেই সিংহ মিলিয়ে গেল। দেখা দিল একটি হিংস্র নেকড়ে। পথের মাঝখানে বসে সে তার লেজ মাটিতে আছড়াচ্ছে। সিংহ যদি অহংকার হয় তা হলে এই নেকড়ে নির্ঘাত লোভ ছাড়া কিছু নয়। নেকড়েটা বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে তার দিকে। গজরাচ্ছে, কষ দিয়ে লালা পড়ছে। সে পিছনে হাঁটার জন্যে চেষ্টা করল কিন্তু তার দুটো পা নড়ল না। নেকড়েটা আরও এগিয়ে এসেছে। তার কোনও অবলম্বন নেই। সে চিৎকার করে বলল, "দয়া করো, দয়া করো আমাকে।" কিন্তু নেকড়ে শূন্যে লাফ দিল। ভয়ংকর সেই লাফ। সে আর্তনাদ করে উঠল।

খানিক বাদে চোখ খুলতেই সে অবাক হয়ে গেল। নেকড়েটা ধারে কাছে নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে পথের মাঝখানে। দুটো পা আর মাটিতে আটকে নেই। কিন্তু চারধারে ছায়া আরও ঘন হয়ে গেছে। তারপর খেয়াল হল পথটা আগের থেকে অনেক সরু হয়ে গেছে। জঙ্গলে যেমন পায়ে চলা পথ থাকে চেহারাটা তেমনই।

এসব কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে বোঝার চেষ্টা না করে সে এগোতে লাগল। নীচ থেকে ওপরে উঠে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে না যাওয়া ছাড়া কিছু করার নেই বলে তার মনে হচ্ছিল। দু'পাশে জঙ্গল কিন্তু কোনও পরিচিত গাছ নেই। শব্দ নেই। খানিকটা হাঁটতেই জঙ্গল ফাঁকা হয়ে এল এবং সে অবাক হয়ে গেল।

সামনেই একটা চওড়া রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছে অগুনতি মানুষ। চলেছে পা টেনে টেনে। যেন যেতে হবেই তাই যাওয়া। ওইসব মানুষের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দেশের কোনও কোনও প্রদেশের মানুষের মুখ দেখে আন্দাজ করা যায়, এখন সেটাও করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া মানুষগুলো হাঁটছে মাথা নিচু করে। তার মনে হল এরকম দৃশ্য যেন সে কোথাও দেখেছে। কোথায়? সে মনে করতে পারল না। মনে করার শক্তিটা কীরকম অকেজো হয়ে গেছে তার। কেবলই মনে হচ্ছিল এই দৃশ্য সে দেখেছে। অনেক মানুষ মাথা নিচু করে হাঁটছিল। কিছু বহন করার পরিশ্রমে তারা ঝুঁকে পড়ছিল। আর তাদের পাশে কিছু বলশালী চাবুক হাতে শাসন করছিল।

কিন্তু এরা কেউ কিছু বহন করছে না। এদের পাশে বলশালী ব্যক্তিরা নেই তাই চাবুকের শাসনও অবান্তর। তবু এরা মাথা নিচু করে ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটছে কেন? আচমকা সে টান অনুভব করল। যেন অদৃশ্য কোনও শক্তি তাকে টেনে নিয়ে ওই মিছিলে ঢুকিয়ে দিল। মিছিলের মানুষ হওয়ামাত্র সে পা টেনে টেনে হাঁটতে শুরু করল, মাথা নিচু হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছিল তার এখন আলাদা কোনও পরিচয় নেই।

"এই, তুই তো মেয়েমানুষ! হা হা হা।"

ঠিক পাশে হাঁটা শরীর থেকে কি বাক্য বেরিয়ে এল? কিন্তু মেয়েমানুষ বলে ওইভাবে হাসার কী আছে! লোকটা যদি কথাগুলো বলে থাকে তা হলে সামনে পিছনের হাঁটিয়েরা শুনতে পেল না কেন? তা ছাড়া লোকটা তাকে তুই বলে সম্বোধন করল! বোঝাই যাচ্ছে হয় ও শিক্ষিত নয় কিংবা অতি-দাম্ভিক।

"হাঁটছি তো হাঁটছি। আর কত দূরে যেতে হবে কে জানে। বেশ তো আরামে রাতের ট্রেনে ঘুমোচ্ছিলাম—উঃ! কপালে সুখ সহ্য হল না।"

রাতের ট্রেন? তার মানে এই লোকটাও সেই ট্রেনে ছিল যার কথা তার একটু একটু মনে আছে। ওই অবধি গিয়েই স্মৃতিটা ধাক্কা খেয়ে থেমে যাচ্ছে। এই লোকটার স্মৃতিতে আর কিছু থাকলেও থাকতে পারে!

"আমিও একটা ট্রেনে ছিলাম। ঘুমোচ্ছিলাম।" সে ঠোঁট নাড়ল।

"নতুন কথা নাকি! এখানে যারা হাঁটছে সবাই ওই ট্রেনে ছিল। কী জোরে ছুটছিল ট্রেনটা! কী দুলুনি! তাতেই ঘুম জমে গিয়েছিল।"

"তারপর? তারপর?"

"ইয়ারকি হচ্ছে? তারপর কী হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারছি না বলে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, তারপর? তারপর? তারপর কিছু জানি না। ট্রেনে শুয়েছিলাম আরাম করে, জেগে দেখি হাঁটছি," লোকটা বলল।

হঠাৎ ঘন ছায়া আরও ঘন হয়ে গেল। সামনে যারা হাঁটছিল তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন চারপাশে কাক-অন্ধকার। পাশের লোকটা বলল, "এসব কী হচ্ছে? ম্যাজিক?" তারপরে ওই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসল সে, "কী মজার ব্যাপার। স্মৃতিগুলো সব মরে হেজে গেছে কিন্তু কথাগুলো দিব্যি বলতে পারছি।"

ওর কথা শেষ হওয়ামাত্র ভয়ংকর আওয়াজ করে বাজ পড়তে লাগল একের পর এক। অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে আগুন ছুটে যেতে লাগল চারধারে। সেইসব আগুন পরস্পরের স্পর্শ পেতেই গোলাকার হয়ে মাথার ওপরে উঠে গেল। তারপর যখন তাদের ওজন এবং আয়তন বেড়ে গেল তখন প্রবল বেগে নেমে আসতে লাগল নীচের রাস্তার দিকে। ছাই হয়ে যাওয়ার ভয়ে সম্মিলিত আর্তনাদ ছিটকে উঠল।

গলা শুকিয়ে কাঠ, হৃৎপিণ্ড উঠে এসেছে কণ্ঠনালির প্রান্তে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সংহিতা। দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁপাতে হাঁপাতে মনে করল সে মরে যাচ্ছে। তার পরনের নাইটি অতিদ্রুত ভিজে গেছে ঘামে, যদিও মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে তিন পয়েন্টে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সে বিছানা থেকে দ্রুত নেমে ঢাকা দেওয়া গ্লাসটা তুলে ঢকঢক করে অর্ধেকটা জল খেয়ে ফেলল। যেন বালি ভিজিয়ে জল সমস্ত ধুলোকে শুষে নিল। নেওয়ার পর একটু শান্ত হল বুক, স্থির হল মন। শরীর থেকে নাইটি টেনে বের করতেই বাতাস এল ঘাম শুকিয়ে দিতে। আঃ, কী আরাম! কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল সংহিতা।

হঠাৎ তার খেয়ালে এল। বছর তিনেক আগে একটা ছবি এঁকেছিল সে। মহাপ্রলয়ের পর পৃথিবী থেকে যখন জল নেমে ভূমণ্ডল নতুন করে জেগে উঠেছে তখন নোয়ার নৌকো থেকে মিছিল করে নেমে আসছে যাবতীয় প্রাণীকুল। যেহেতু তখনও মাটি কাদা কাদা, পলিতে ভরা, তাই তারা হাঁটছিল পা টেনে টেনে। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে মাথা ঝুঁকে পড়েছিল সামনে। ছবিটা খুব প্রশংসা পেয়েছিল। আমদাবাদের একজন শিল্পপতি আঠারো

লক্ষ টাকায় কিনেছিলেন এগজিবিশন থেকে। আজ, এই একটু আগে, যে-মিছিলের দৃশ্য তার ঘুমে চলে এসেছিল তার সঙ্গে ওই ছবির মিছিলের বেশ মিল আছে। শুধু ছবিতে ছিল পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল আর তার স্বপ্নে এসেছে মানুষ। নোয়ার প্রাণীরা নতুন জীবনের পথে এগিয়েছে, তার স্বপ্নের মিছিলের ওপরে নেমে আসছিল ভয়ংকর আগুনের গোলা যা তাদের ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যেহেতু ভয়ে তার ঘুম ভেঙে গেছে, তাই মিছিলটা ছাই হয়ে গিয়েছে কিনা তা জানা সম্ভব নয়। সেই যে-লোকটা মেয়েমানুষ বুঝে হা হা করে হেসেছিল সে তা হলে এখন ছাই।

কিন্তু এরকম স্বপ্ন সে কেন দেখল? দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল সংহিতা। রাত এখন আড়াইটে। ভারতের সব পরিচিত মানুষ এখন গভীর ঘুমে। কাউকে ফোন করার সময় এখন নয়। হঠাৎ বব্-এর কথা মনে এল। সাতাশি বছরের আর্ট ক্রিটিক। এখনও সমান সক্রিয়। থাকেন নিউ ইয়র্কের স্যাটান আইল্যান্ডে। বারো বছর আগে সংহিতার সোলো এগজিবিশন দেখতে এসেছিলেন বব্। ছোটখাটো, টাকমাথার মানুষটির চিবুকে সাদা দাড়ি। ছবি দেখার পর সেই যে আলাপ করেছিলেন তার ছেদ এখনও পড়েনি। শুধু ছবি নয়, তার বাইরেও অনেক কথা হয়েছে বব্-এর সঙ্গে। মাসে একবার কথা তো হয়ই। গতবার ফোন করতে দেরি হয়েছিল। বব্ বলেছিলেন, "মাই ডিয়ার লেডি, তুমি সাতদিন দেরি করেছ। আমার তো ভয় করছিল, তোমার কিছু হয়ে গেছে নাকি! বয়সটা তো ভাল নয়!"

সাতাশি বছরের বৃদ্ধ কথাগুলো বলেছেন আটান্নর প্রৌঢ়াকে। হো হো শব্দ করে হেসেছিল সংহিতা। তারপর বলেছিল, "ঠিক আছে বব্, এখন থেকে আমরা পাক্ষিক ফোন করব। একবার আমি আর একবার আপনি।"

স্যাটান আইল্যান্ডে এখন ক'টা বাজে? বিয়োগ করে সংহিতা হাসল, বিকেল পাঁচটা। বব্-এর এখন বিকেলের চা খাওয়ার সময়। সে মোবাইল তুলে বব্-এর নাম বের করে বোতাম টিপল। দুই কি তিন সেকেন্ডে রিং শুরু হল, তার চার সেকেন্ড বাদে বব্-এর গলা, "এ কী! তোমার কী হল? রুটিনের বাইরে ফোন? তোমার তো এখন অনেক রাত।"

"বব্, আপনার স্বপ্ন নিয়ে কোনও পড়াশুনো আছে?"

"মাই ডিয়ার লেডি, স্বপ্ন তো উপভোগ করার জন্যে, গবেষণা করে কী লাভ?"

"তা নয়, আমি আজ একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলাম। ঘুম ভাঙল এমন ভয় পেয়ে যে, কয়েক সেকেন্ড ধরে মনে হচ্ছিল আমি মরে যাচ্ছি। সমস্ত শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে গিয়েছিল। উঃ, কিন্তু আমি কেন স্বপ্নটা দেখলাম?"

"ওয়েল, শোনা যাক বিষয়টা।"

সংহিতা যতটা মনে করতে পারল বলল বব্‌কে। শোনার পর বব্ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা, এবার বলো, তুমি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' কবে পড়েছ?"

"'ডিভাইন কমেডি'?"

"হ্যাঁ। যে-পার্টটায় হেল-এর কথা বলা আছে, সেটা কবে পড়েছ?"

সংহিতা চিন্তা করল। মাথা নেড়ে বলল, "মনে পড়ছে না। হয়তো পড়েছি। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য'-এ যে-নরকের বর্ণনা আছে তার সঙ্গে নাকি দান্তের ডিভাইন কমেডির নরকের খানিকটা মিল আছে।"

"আমি জানি না। ওই বই পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি।" বব্ বললেন, "কিন্তু একেই বলে ব্লেসিং ইন ডিসগাইজ। মৃত আত্মারা নীরব মিছিলে যোগ দিয়ে হাঁটছে। তারা কোথায় যাবে, কী পরিণতি হবে জানে না। তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ সামনে ঝুঁকে আছে, পা টেনে টেনে হাঁটছে, নিঃশব্দে। সেই অদ্ভুত চরাচরের মিছিলের ওপর আগুনের ভয়ংকর গোলা তৈরি হচ্ছে আরও-একটি ধ্বংস করার জন্যে। এঁকে ফেলো মাই ডিয়ার লেডি। আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে তোমার ওপর। দারুণ ছবি হবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ বব্। আই উইল ট্রাই। কিন্তু আঁকার আগে আমি একবার দান্তের বইটা পড়ে নিতে চাই।"

"নো। কখনও না। ওই স্বপ্নই হোক তোমার ছবির উপাদান। ডিভাইন কমেডি তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। এবার ঘুমোতে যাও লেডি। গুড নাইট।"

বব্-এর সঙ্গে কথা বলার পর মন শান্ত হল। টেলিফোন রেখে সংহিতা শোওয়ার ঘর থেকে পড়ার ঘরে এল। প্রচুর বই তার। দিনটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছে সে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আঁকার ঘরে থাকে, লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম নিয়ে পড়ার ঘরে রাত ন'টা পর্যন্ত। বাংলা এবং ইংরেজির কত ভাল বই এক জীবনে না-পড়া থেকে যাবে!

সংহিতার এই ফ্ল্যাটের ভেতরটা আঠারোশো স্কোয়ার ফুট। পাঁচ বছর আগে

যে দামে সে কিনেছিল এখন সেটা তিন গুণ বেড়ে গেছে। সবচেয়ে বড় হল আঁকার ঘর। আর একটা ছবি আঁকা শেষ হলেই এগজিবিশন শুরু করা যায়। শহরের দুটো বড় গ্যালারি খুব চাপ দিচ্ছে এগজিবিশনের জন্যে। কিন্তু নতুন কোনও আইডিয়া পছন্দ হচ্ছিল না বলে বেশ কয়েকটা ক্যানভাস বাতিল করেছে সে। একসময় কোনও গ্যালারি অনেক শিল্পীর ছবির সঙ্গে তার ছবি এগজিবিশনে রাখলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করত সংহিতা। সেসব দিন অনেক পিছনে ফেলে এসেছে সে। এখন কোন ছবি আঁকবে, কখন আঁকবে, কখন তার এগজিবিশন হবে তা সে নিজেই ঠিক করে। চল্লিশটা বছর পার হয়ে গেছে এখানে পৌঁছোতে।

আঁকার ঘরের বাঁ দিকের দেওয়ালের অনেকটা জুড়ে একটা আয়না আছে। দামি আয়না, কোনও ফ্রেম নেই। ওর সামনে দাঁড়ালে সমস্ত ঘর চোখের সামনে এসে যায়। সংহিতা জেনেছে সরাসরি তাকালে ঘরটাকে যেমন দেখায় আয়নার দিকে তাকালে তা থেকে একটু আলাদা মনে হয়। ওই আলাদাটুকু উপভোগ করে সংহিতা।

এখন সাদা ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করল সে। বব্ যা বলেছে তা আঁকলে ছবি কতটা অর্থবহ হবে? মনে মনে ছবিটাকে আঁকার চেষ্টা করল সে। মানুষগুলো জন্তুর মতো বেঁকে হেঁটে যাচ্ছে। দু'পাশে নিষ্পত্র গাছেদের ভিড়। মাথার ওপর ভয়ংকর আগুনের গোলা। সে মাথা নাড়ল। ঠিক জমছে না। কোথাও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। সংহিতা আয়নার দিকে তাকাতেই নিজেকে দেখতে পেল। আপাদমস্তক নিরাভরণ শরীর। আয়নার শরীরে চিকচিকে আলো ছড়ানো। ঘরের আলো শরীরে ধাক্কা খেয়ে ওই কাণ্ড করেছে। সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এখনও, এই আটান্নতেও শরীর যেন আটত্রিশেই থেমে গেছে। স্নানের ঘরের বাইরে নিজেকে এই প্রথম পুরোটা দেখতে পেল আজ। আচ্ছা, আপাদমস্তক বলে কেন? পা থেকে শুরু করে মাথায় পৌঁছোয়, কেন মাথা থেকে শুরু হয় না? নিজের কপাল নাক চিবুকে আঙুল ছোঁয়াল সংহিতা। হেসে ফেলল তখনই, এই মুখ কত দিন একই থেকে গেল।

ওপাশের ঘরে শব্দ হল। এগিয়ে গিয়ে আঁকার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল সংহিতা। তারপরেই দরজার ওপাশ থেকে সিক্তার গলা ভেসে এল, "দিদিমণি, আপনি কি এই ঘরে?"

"হ্যাঁ। কী ব্যাপার?"

"এত রাত্রে ঘুমোননি?"

"তুমি তো ঘুমিয়েছিলে, উঠলে কেন?"

"কী জানি। মনে হল কিছু হয়েছে। আপনি চিৎকার করছেন। তারপর শুনলাম ফোনে কথা বলছেন। তারপর দেখি এই ঘরের আলো জ্বলছে। আপনি ভাল আছেন তো?"

"হ্যাঁ। তুমি শুয়ে পড়ো। আলো নিভিয়ে দাও।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে আবার ক্যানভাসের সামনে ফিরে গেল সংহিতা। সিক্তা তাকে এই অবস্থায় দেখলে নির্ঘাত ধরে নিত সে পাগল হয়ে গেছে। বছর পাঁচেক আগে যখন সেন্টার থেকে ওকে পাঠিয়েছিল বাড়ির কাজের জন্যে তখন নাম বলেছিল, রিক্তা। বিরক্ত হয়েছিল সংহিতা। বলেছিল, "এই নামের কাউকে আমি বাড়িতে রাখব না। তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও তা হলে নাম বদলাতে হবে।"

"কেন?"

"আমি হাহাকার, হতাশা সহ্য করতে পারি না। নাম পালটাবে?"

"বলুন।"

"তোমার এখনকার নামের সঙ্গে মিল রেখে তোমাকে সিক্তা বলে ডাকব।"

"বেশ, ডাকবেন।"

কিছুদিনের মধ্যেই সংহিতা বুঝতে পারল মেয়েটি সুন্দর কাজকর্ম করে, হাতের রান্নাও ভাল কিন্তু কখনওই হাসে না। দম দেওয়া পুতুলের মতো সচল থাকে। শেষপর্যন্ত ওকে সামনে দাঁড় করিয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোমার কি আমার এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে?"

মুখ নিচু করেছিল সিক্তা, "আমি তো একবারও ভাবিনি।"

"কিন্তু আমার অসুবিধে হচ্ছে।"

"ও!"

"দেখো, তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার অশৌচ চলছে। কোনও প্রিয়জন চলে গেছে। তোমার বয়সের একটা মেয়ে যদি ওইরকম মুখ করে আমার সামনে ঘোরাফেরা করে তা হলে আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। আমি কি সেন্টারকে বলব তোমাকে বদলে দিতে?"

বলতে বলতে সংহিতা দেখল সিক্তার দু'চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল।

"কাঁদলে হবে না। কিছু বলার থাকলে বলো।"

"তা হলে সেন্টার আমাকে যেখানে পাঠাবে সেখানে পুরুষমানুষ থাকবে।"

"তাতে কী হবে?"

"আমি আপনার এখানে থাকতে চাই দিদি। পুরুষমানুষকে আমার খুব ভয়।"

"কেন?"

"বিয়ে করা বউ থাকা সত্ত্বেও ওরা আমার শরীরের দিকে হাত বাড়ায়। আপত্তি করলে আমার ওপরেই দোষ চাপায়।" ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাল সিক্তা।

"কিন্তু আমার যে অসুবিধে হচ্ছে।"

সে আঁচলে জল মুছল, "আমাকে একটু সময় দিন দিদি।"

মাঝে মাঝে সংহিতার মনে হয় মেয়েটা অভিনয় করছে। হাসিখুশি হয়ে থাকার অভিনয়। ছটফটে পায়ে এঘর থেকে যে ওঘরে যাচ্ছে তা বোধহয় মন থেকে নয়। কিন্তু আর এই নিয়ে কথা বাড়ায়নি সে। ওর অতীত, ওর কষ্টের কাহিনি শুনতে চায়নি একবারও। খোঁড়াখুড়ি করলে যে-গরল উঠে আসবে তার স্বাদ নেওয়ার কোনও মানে হয় না।

শূন্য ক্যানভাসের দিকে তাকাল সংহিতা। ছবিটাকে কল্পনা করতে গিয়ে হোঁচট খেল। এ কী ভাবছে সে? ওই মিছিল তো মানুষের মিছিল নয়। ওদের স্মৃতি একটা চলন্ত ট্রেনের দুলুনিতে আটকে যাচ্ছিল। তার মানে ওরা ট্রেনে চেপে কোথাও যাচ্ছিল। সেটা কোথায়, কোন ট্রেন তা আর মনে আসছে না। তা হলে কি সেই ট্রেনটা ভয়াবহ দুর্ঘটনায় পড়েছিল? লাইন তুবড়ে, চৌচির হয়ে যাওয়া কামরায় মানুষগুলোর প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল কিছু বোঝার আগেই? নিশ্চয়ই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে গিয়েছিল চারপাশে। তাদের শনাক্তকরণ সম্ভব হয়নি। কোনও কোনও দেহ মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল, জ্বালিয়ে দিতে হয়েছিল অনেকগুলোকে। সেইসব মৃত মানুষের আত্মারাই কি মিছিলে ছিল? সে নিজেও, স্বপ্নের মধ্যে সে নিজেকেও যা দেখেছে তা কি তারই আত্মা? আত্মা কি মরণের পরে জেগে ওঠে? জীবিত অবস্থায় মানুষের শরীরে আত্মা তো থাকেই নইলে ওই কথাটা চালু থাকবে কেন, আত্মারাম খাঁচাছাড়া! কিন্তু

সেই আত্মা মানবশরীরের ভেতরে নিরাপদে বাস করে। মৃত্যুর পরে যখন শরীর ধ্বংস হয় তখন সে বেআবরু হয়ে যায়। সেই আত্মার অস্তিত্ব যদি হিন্দুরা বিশ্বাস না করত তা হলে ঘটা করে শ্রাদ্ধ করত না। শ্রাদ্ধ মানেই তো ইহলোক থেকে আত্মাকে মুক্তি দেওয়া।

সেই শরীরবিহীন আত্মার অবয়ব কী হবে? মানুষের শরীর আঁকলে তো আত্মাকে বোঝানো যাবে না। ঘড়িতে সময় বাজল। ইচ্ছে করেই সময়-শব্দে-জানানো ঘড়িটাকে সংহিতা কিনে এনেছিল এক নিলামঘর থেকে। আওয়াজ কানে এলেই মনে হয়, সময় চলে যাচ্ছে, তোমার সময় ফুরোচ্ছে।

নাঃ। মাথায় আসছে না কিছু। সংহিতা ফিরে এল নিজের ঘরে। শুকনো একটা নাইটি বের করে শরীরে চাপিয়ে নিল। আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে ভাবল বব্‌কে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়! বব্ তো সারাজীবন বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেছেন। তাদের কেউ-ই কি আত্মার ছবি আঁকেনি? নাঃ, বব্‌কে জিজ্ঞাসা করতে কোথায় যেন বাধছে। সম্পর্ক যতই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠুক ক্যানভাসে আঁকা ছবির ব্যাপারে বব্‌কে সে তার সমালোচক হিসেবে দেখতেই এতদিন অভ্যস্ত ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।

আজ ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। এই দ্বিতীয়বারের ঘুমে কোনও স্বপ্ন দেখেনি সে। বাথরুম থেকে তৈরি হয়ে খাওয়ার টেবিলে আসতেই দেখতে পেল ইংরেজি-বাংলা কাগজ দুটো সযত্নে রাখা হয়ে গেছে। সিক্তা বলল, "গুড মর্নিং দিদি।"

মাথা নেড়ে চেয়ার টেনে বসে সংহিতা জবাব দিল, "গুড মর্নিং।"

"আবার ভাল ঘুম হয়েছে?"

আবার শব্দটা কানে বাজল। কথা না বলে মাথা নাড়ল সে। সিক্তা চলে গেল চায়ের পট আনতে। সকালবেলায় প্রথম দেখার সময় গুড মর্নিং বলাটা সে-ই চালু করেছিল। এখন মনে হচ্ছে না করলেই ভাল হত। প্রতিটি সকালে মনে হয় রোবট কথা বলছে।

চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজে চোখ বোলাল সে। প্রথম পাতা যেমন হয় সেরকম। মানুষ মানুষকে সহ্য করতে পারছে না। খুন, হামলা, শাসানো চলছে তো চলছেই। ছয় নম্বর পাতায় এসে থমকে গেল সে। এক কলমে খবরটা ছাপা হয়েছে। শিল্পী অনীশ সোমের জীবনাবসান। বাহাত্তর বছর বয়সে কিছুদিন

অসুখে ভুগে চলে গেছেন অনীশবাবু। তাঁর আঁকা ছবি দেশ-বিদেশে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছে। মাত্র সাত লাইনে খবরটা ছাপা হয়েছে। মন খারাপ হয়ে গেল সংহিতার। অনীশবাবুর জন্যে কী সাত লাইনের বেশি জায়গা দেওয়া যেত না? তার পরেই খেয়াল হল, ওদের দোষ দিয়ে লাভ কী, ভদ্রলোক যে অসুস্থ ছিলেন খবরটা তো তারও জানা ছিল না। অথচ তার আগের প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা নিজের ঘরানা তৈরি করতে পেরেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনীশ সোম অবশ্যই অন্যতম। এবং তখনই সংহিতার মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। অনীশ সোম ছবি আঁকতেন ফর্ম ভেঙে। তাঁর আঁকা মানুষের ছবি অদ্ভুত বাঁকাচোরা থাকত। নারীচরিত্র আঁকার সময় স্তন দুটিকে সূর্যের মতো ভয়ংকর দেখাতেন। মুখের গঠন ভাঙাচোরা। ওইভাবে আঁকতে আঁকতে এমন প্রচার পেয়েছিলেন যে, কেউ ফর্ম ভেঙে চেহারা পালটালেই দর্শকরা ভাবত অনীশ সোমের ছবি। কিছু বছর আগে ওঁর এগজিবিশনে গিয়েছিল সংহিতা গ্যালারির মালিকের আমন্ত্রণে। সেখানে অনীশ সোম বসেছিলেন। মাঝারি চেহারার মানুষটির মুখ দাড়িতে ঢাকা। টাঙানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে সংহিতার মনে হয়েছিল কেউ এগুলো কিনে বাড়ির দেওয়ালে টাঙাবে না। তবু ইদানীং ভাল দামে বিক্রি হচ্ছে ওঁর ছবি। যাঁরা ছবির ব্যাবসা করেন তাঁরা নাকি ভবিষ্যতে আরও বেশি দাম পাবেন ধরে নিয়ে কিনে থাকেন। ছবি দেখা শেষ হয়ে গেলে সংহিতাকে বসানো হল অনীশ সোমের পাশের চেয়ারে। অনীশ সোম হেসে বললেন, "কেমন দেখলেন গর্ভবতী জননীদের?" অবাক হয়ে তাকিয়েছিল সংহিতা।

অনীশ সোম বললেন, "একটু আগে একজন বিদেশি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার ছবির নারীরা মনে হয় গর্ভবতী অথচ তাদের মুখচোখ হিংস্র, শরীর ডিফর্মড, নিম্নাঙ্গ অযথা অনেক ভারী। কেন? কী বলব ভাই? জবাব দিয়েছিলাম, ওরা সবাই গর্ভবতী জননী। আমরা কেউ আমাদের জননীকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখিনি।"

হেসে ফেলেছিল সংহিতা, "মনে হচ্ছিল ওরা এই পৃথিবীরই, আবার তা বোধহয় নয়।"

"কারেক্ট। ওরা আমাদের ভেতরে বাস করে।"

পাশে বসে শুনছিলেন যে-ভদ্রলোক, জিজ্ঞাসা করলেন, "মানুষের আত্মা?"

"আপনার যা খুশি নাম দিতে পারেন।" অনীশ সোম মাথা নেড়েছিলেন।

আজ সকালে সংহিতার মনে হল, আমি যদি ওদের আত্মা বলি। যারা মাটির তলায় শরীর পচিয়ে গলিয়ে অথবা আগুনে শরীর জ্বালিয়ে ছাই হয়ে শেষপর্যন্ত এক অনন্তের দিকে যাত্রা শুরু করেছে তাদের চেহারা আঁকতে যদি অনীশ সোমের ফর্ম ব্যবহার করি তা হলে যথার্থ হবে। ছবি দেখে লোকে বলতেই পারে অনীশ সোমের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বলুক। উত্তরে বলা যাবে, এই ছবি অনীশ সোমের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য! এইসব ভেবে খুব তৃপ্ত হল সংহিতা।

চা-কাগজ শেষ করে সে চলে এল আঁকার ঘরে। ঢুকতেই আয়নার দিকে চোখ গেল। সেখানে আটান্ন বছরের সংহিতা তার রুচি এবং ব্যক্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও ব্যতিক্রমী ব্যাপার নেই। অথচ এই আয়নায় গত রাতে তার পোশাকহীন শরীর ধরা পড়েছিল। আচ্ছা, আয়না যদি তার বুকে যেসব ছবি ফুটে ওঠে তার সবগুলো পরের পর ধরে রাখতে পারত? যেমন, তার এখনকার এই ছবি সরিয়ে দিলেই রাত্রের নগ্ন শরীর দেখা যেত! আহা!

বড় ছবি আঁকার আগে খাতায় ড্রইং করে নেওয়া সংহিতার দীর্ঘকালের অভ্যেস। অনেক শিল্পী সোজা ক্যানভাসে চলে যান। কিন্তু সংহিতার মন খুঁতখুঁত করে। পেনসিলে আঁচড় কাটা শুরু করল সে। অনীশ সোমের পুরুষ বা নারী যেরকম হয় তা তার আবিষ্কার করতে বোধহয় কয়েক বছর লেগেছিল, আবিষ্কার করার পর তারই সম্পত্তি হয়ে গেল। কিন্তু এখন সেরকম পুরুষ বা নারীকে আঁকতে কয়েক মিনিট খরচ হয়। দু'জনকে পাশাপাশি আঁকল সংহিতা। যাঁরা সামান্য খোঁজখবর রাখেন তাঁরা এই দুটিকে দেখলেই বলে দেবেন অনীশ সোমের আঁকা ছবি। যেমন তার নিজের ছবিতে যে-টান এবং রঙের ব্যবহার আছে, নারীচরিত্রের চিবুকের যে-আদল তা যাঁরা জানেন তাঁরা তার নাম বলতে ভুল করবেন না। বিকাশ ভট্টাচার্যের দুর্গা সিরিজের পর আর কার সাহস হবে আটপৌরে মেয়ের কপালে চোখ আঁকার? কিন্তু এই দুটো যতই ডিফর্মড হোক, এদের আত্মা বলে কি মনে হচ্ছে? প্রথম কথা হল আত্মার শরীর যেমন থাকে না তেমনই তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে। সেই ক্ষমতা কি মন ছাড়া সম্ভব?

গোটা সকাল ওই ফর্মভাঙা ফিগারগুলো নিয়ে গবেষণা করে গেল সংহিতা।

কিছুতেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। শেষপর্যন্ত উঠে পড়ল সে। ব্রেকফাস্টের সময় হয়ে গিয়েছে। তার আগে কয়েকটা আসন করে না নিলে পৃথিবীর সব আলস্য শরীরে ভর করবে।

ব্রেকফাস্টে ফল, ডিমসেদ্ধ, একটা সেঁকা পাউরুটি আর কালো কফি খেতে পছন্দ করে সংহিতা। মাঝে মাঝে সিক্তা মেনু পালটায়। ডিম-পাউরুটির বদলে কর্নফ্লেক্স-দুধ। আজ হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল, "দিদি, একটু অন্যরকম খাবেন?"

"কীরকম?"

"গরম গরম লুচি আর আলুর চচ্চড়ি।"

"ওরে বাব্বা! ওসব খেলে আর দেখতে হবে না। প্রথমত, অ্যান্টাসিড খেতে হবে, তারপর ওজন বাড়বে।" সংহিতা না হেসে পারল না।

"কিস্যু হবে না। মাসে একদিন খেলে জিভের স্বাদ বদলাবে। আপনি শেষ কবে লুচি খেয়েছেন ভেবে দেখুন?" সিক্তার গলায় আবদার।

সংহিতা মাথা নাড়ল, "না না। ওসব করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।"

"একদম না। ঠিক দশ মিনিটে টেবিলে দিয়ে দেব।"

"বেশ, বলছ যখন।" বলেই খেয়াল হল, "শোনো, আলুর চচ্চড়ি নয়, তুমি চাকাচাকা করে আলু ভেজে দাও, সঙ্গে নুন আর কাঁচালঙ্কা।"

"ওরকম শুকনো শুকনো খেতে পারবেন?"

"ছেলেবেলার প্রত্যেক রবিবারে ওটাই খেতাম।"

সিক্তা দ্রুত চলে গেল। এই যে একটু নিয়মের বদল হল তাতেই মেয়েটা খুশি হয়ে গেল। এই খুশিটা কি বানানো? অভিনয়? সংহিতার মনে হল সিক্তা আজ স্বাভাবিক।

রবিবার সকালের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত ওরা। সংহিতা আর তার দুই খুড়তুতো ভাই। সকাল ন'টায় কাকিমা ময়দা মেখে লুচি বেলতে শুরু করতেন, মা ভাজতেন। প্রথম ভাজা লুচিগুলো যেত বাবা-কাকার জন্যে। তারপর তাদের দেওয়া হত। লুচি ভাজার গন্ধে পড়াশুনো থেমে যেত অনেকক্ষণ। ডাক আসামাত্র তিনজনে ছুটত। চারটের বেশি লুচি দেওয়া হত না তাদের। সঙ্গে চার পিস আলু চাকা করে ভাজা। পাশে একটু নুন। সেই বয়সটায় লঙ্কা খাওয়ার সাহস হত না। তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে বলে সে প্রতিটি লুচি

তিন টুকরো করে খেত। শেষেরটা শুধু নুন দিয়ে খাওয়া। তাই অমৃত বলে মনে হত।

যখন বোঝার বয়স এল তখন জেনেছিল ওইভাবে আলু ভাজলে পরিশ্রম যেমন কম হয়, খরচও। যেহেতু বাবার মাঝারি রোজগারের সঙ্গে কাকার সামান্য রোজগার মিললেও সংসারের সব হাঁ-মুখ বন্ধ করা যেত না তাই রবিবারের ব্রেকফাস্টে লুচি খাওয়াকে খানিকটা বিলাসিতাই বলা যেতে পারত। তাদের চারটের বেশি লুচি দিলে মা-কাকিমারা বঞ্চিত হতেন। এখন ওসব কথা ভাবলেই বুকে চাপ আসে। হাড়গুলো কনকনিয়ে ওঠে। তখন বোঝার বয়স ছিল না, আজ কিছু করার সুযোগ নেই। তবু আজ সিক্তার কথা শুনে সেই সকালগুলো উঠে এল তার সামনে।

"দিদি, হয়ে গেছে, আসুন।" সিক্তার ডাক শুনে টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে দেখতে পেল বড় চিনেমাটির সাদা প্লেটের একপাশে একটা কাঁচালঙ্কা রাখা আছে, পাশের পাত্রে ফুলকো লুচির পাহাড়। চেয়ার টেনে নিয়ে সংহিতা বসল, "সিক্তা, আমাকে ঠিক চারটে লুচি দেবে।"

"ওমা! কেন?" চোখ বড় করল সিক্তা।

"তার কারণ আমি ঠিক চারটে লুচি খাব।"

"দিদি, লুচিগুলো দেখুন, একদম বড় নয়।"

"আমি যা বলছি তাই তোমার করা উচিত।"

বাধ্য হয়ে চারটে লুচি প্লেটে রাখল সিক্তা, হাতায় তুলল অনেকগুলো আলুভাজা।

"না। ঠিক চারটে দেবে।" সংহিতা তাকে থামাল।

"মাত্র চারটে?"

"ঠিকই শুনেছ।"

চারটে আলুভাজা প্লেটে রাখল সিক্তা ঠোঁট টিপে। সংহিতা হাত বাড়িয়ে লবণের পাত্রটা টেনে নিল। সিক্তা জিজ্ঞাসা করল, "কফি করি?"

"না। আজ চা দাও।"

সিক্তা তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিচেনে চলে গেল কিন্তু লুচি এবং আলুভাজার পাত্রগুলো নিয়ে গেল না। মজা লাগল সংহিতার। এই চারটে লুচি তখনও এরকমই দেখতে ছিল। নুন মাখিয়ে মুখে পোরার আগে ভাবল ছিঁড়ে তিন টুকরো করবে কিনা। হাসল সে। তখন চারটের বেশি হাজারবার

চাইলেও পাওয়া যেত না। এখন না চাইলেও টেবিলে অনেক লুচি মজুদ রয়েছে।

মন অনেক কিছু ভুলে যায় অথবা ভুল করে। কিন্তু শরীর যেসব স্বাদে আমোদিত হয় তা আমৃত্যু মনে রাখে। লুচি এবং আলুর মিশ্র স্বাদ জিভে পৌঁছোনোমাত্র সেই ছেলেবেলার রবিবারের সকালগুলো ঝিমঝিম করতে লাগল মনে। আঃ। একই স্বাদ, একই গন্ধ। তখন এসব খেলে অ্যান্টাসিড লাগত না, এখন লাগতে পারে বলে ভয় হয়। তখন লুচি শেষ করেই জলের গ্লাস ধরত। আজ জল খাবে না বলে ঠিক করল সংহিতা।

চা নিয়ে এসে সিক্তা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি লঙ্কা খেলেন না দিদি?"

প্লেটের দিকে তাকাল সংহিতা। ওটার কথা মাথাতেই ছিল না। ছেলেবেলার অভ্যেসটা হুড়মুড়িয়ে চলে এসেছিল বলে লঙ্কার দিকে তাকায়নি। বরং শেষ লুচিটা টুকরো করে শুধু নুন দিয়ে খেয়েছে।

"খাওয়া হল না।"

সিক্তা নিশ্চয়ই অবাক হবে। সে দেখেছে খাওয়ার সময় সংহিতার লঙ্কা না হলে চলে না। প্রায়ই অনুযোগ করে, "কোথায় এই লঙ্কাগুলো পাও? একটুও ঝাল নেই!" কাল বিকেলে বাজার থেকে এসে বলেছিল, "আজকের লঙ্কায় খুব ঝাল পাবেন।" কিন্তু ও তো বুঝবে না কেন তার লঙ্কা খাওয়ার কথা মনে আসেনি।

এখন মা বা কাকিমা নেই। বাবা এবং কাকাও চলে গেছেন। তাঁদের কথা মনে পড়ে এইভাবেই। যেমন লুচি আলুভাজার গন্ধে ওঁরা যেন তার সামনে এসে বসলেন। তা হলে এই যে সে ব্রেকফাস্ট করল ওঁদের প্রিয় খাবার দিয়ে তার খবর কি জেনেছেন ওঁরা? যদি ভাবতে ভালবেসে ধরে নিই, জেনেছেন, তা হলে তাঁদের আত্মায় একটা মন আছে। সংহিতা আঁকার ঘরে চলে এল। স্কেচবুকটা নিয়ে সকালে আঁকা ফিগারগুলো পাল্টাতে লাগল। একটা বড় বেঢপ ঊর্ধ্বাঙ্গ যার ভেতরে মন রয়েছে, ঊর্ধ্বাঙ্গের ওপর ছোট্ট মুন্ডু যার একটাই চোখ, নিম্নাঙ্গে গোলাকার জালা, তার তলায় দুটি হাঁসের পা। নারী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে সংহিতা পুরুষদের ঊর্ধ্বাঙ্গ রুগ্ণ করে নিম্নাঙ্গ তার সঙ্গে মানানসই করে ফেলল। নারীদের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত। তাদের মন যেমন বড়, নিম্নাঙ্গও বিশাল। এটা করার পর সে বুঝতে পারল অনীশ সোমের ভাবনা এদের মধ্যে নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাললাগা তৈরি

হয়ে গেল। আর তার ফলেই আলস্য শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ড্রইংরুমের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, এখন এরাই হবে তার সঙ্গী। আত্মার চেহারা যদি এরকম হয় তা হলে মন্দ কী!

পরপর অনেকগুলো, অনেক রকম আত্মার স্কেচ করার পর তার মনে পড়ল পাশে হাঁটা সেই উদ্ধত লোকটার কথা। লোক না বলে পুরুষাত্মা বলাই সঠিক। এই, তুই তো মেয়েমানুষ। হা হা হা। এরকম কথা যে বলতে পারে তার মুখের আদল নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে। কিছুক্ষণ লোকটাকে আঁকার চেষ্টা করে যখন মনমতো হচ্ছিল না তখন খেয়াল হল, দরকার কী! আত্মাদের কারও মুখ তো দেখা যাওয়ার কথা নয়। সবাই মুখ নিচু করে শরীর সামনে বেঁকিয়ে হাঁটছে। বরং এই আত্মার মাথার ওপর যে-একমাত্র চোখ সেটা আধখোলা থাক।

এসব করতে করতে যে দুপুর চলে এসেছে তা শব্দ-ঘড়ি জানিয়ে দিল। স্কেচবুক রেখে আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। সিক্তা দাঁড়িয়েছিল বাথরুমের দরজার সামনে, জিজ্ঞাসা করল, "গিজার অন করে দেব?"

"একটু পরে।"

এটা ওর অভ্যেস। শীতকালে তো বটেই, গরমের সময়েও ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করলে শরীরটা চাঙ্গা থাকে। শোওয়ার ঘরের টেবিলে রাখা মোবাইলটা তুলে নিয়ে সে জিভে শব্দ করল। আটটা মিস্‌ড কল। যেহেতু সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল তাই শব্দ শোনা যায়নি। প্রথম ফোনটা এসেছিল সকাল আটটায়, লীনা ফোন করেছিল। তারপর গ্যালারি সি থেকে তিনবার। নতুন গ্যালারি, প্রচুর সাজিয়েছে। মালিক ছেলেটি অল্পবয়সি। তার পিছনে লেগে আছে এগজিবিশনের জন্যে। তার পরের ফোনটা করেছিলেন হিমাদ্রি সেনগুপ্ত। প্রবীণ শিল্পী। সে নম্বরটা টিপল। রিং হচ্ছে ওপাশে। হ্যালো শব্দটা কানে আসতেই সংহিতা বলল, "আমি সংহিতা বলছি, আপনি ফোন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তুমি দেশেই আছ তো?"

হেসে ফেলল সংহিতা, "হ্যাঁ। আছি।"

"তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ অনীশ আর আমাদের মধ্যে নেই!"

"হ্যাঁ। কাগজে পড়লাম।"

"ও! তা সে তো আমাদেরই একজন ছিল। আমরা ওকে নিয়ে একটু

কথাবার্তা বলব, শ্রদ্ধা জানাব। তুমি কি আসতে পারবে?" হিমাদ্রি সেনগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

"নিশ্চয়ই যাব।"

"তা হলে কোথায় হচ্ছে তা জেনে নিয়ো।"

"আমি আপনাকে ফোন করব।"

"ভাল থেকো ভাই।"

"আপনিও ভাল থাকবেন।" হিমাদ্রি সেনগুপ্ত ফোনটা রেখে দিলে সংহিতার খেয়াল হল, ওঁর বয়স আশির অনেক ওপরে। অনীশবাবু ওঁর অনুজ ছিলেন। কীরকম একটা শিরশিরে অনুভূতি হল। আচ্ছা, হিমাদ্রি সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার চেহারা কেমন হবে!

হিমাদ্রি সেনগুপ্তের পরে তিনটে মিস্‌ড কল এসেছিল। দশ মিনিটের মধ্যে তিনবার। নম্বরটা কার তা বুঝতে পারল না সংহিতা, সে মোবাইল নামিয়ে রাখল। অচেনা নম্বরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে হবে, "আপনি কে!" তার চেয়ে যার এত প্রয়োজন সে নিশ্চয়ই আবার ফোন করবে। সিক্তাকে গিজার অন করে দিতে বলে টুকটাক কাজগুলো সেরে নিতে নিতে সংহিতার মনে হল আজ অনীশবাবুর বাড়িতে তার যাওয়া উচিত। কিন্তু বাড়িটা কোথায় তা সে জানে না। অবশ্য যে-কোনও গ্যালারিকে ফোন করলে ঠিকানা পেতে অসুবিধে হবে না। সকালে কখনও বের হয় না সে, ড্রাইভারকে বলা আছে ঠিক বারোটায় আসতে। রাত দশটা পর্যন্ত তার ডিউটি। যদি সে না বের হয় তবু ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে হবে নীচে। আগে দরকার না থাকলে দুপুরেই ছেড়ে দিত। কিন্তু একদিন ছেড়ে দেওয়ার পর বিকেলে আচমকা খুব প্রয়োজন হল বাইরে যাওয়ার। তখন ড্রাইভার নেই। ফোন করে শুনেছিল তার মোবাইলের সুইচ অফ। সেই থেকে ড্রাইভারকে ডিউটিতে থাকতে হচ্ছে দশ ঘণ্টা।

বাথরুমে যাওয়ার সময় মোবাইল জানান দিল। বিরক্তমুখে ওটা তুলে নম্বর দেখল সংহিতা। সেই অচেনা নম্বর যা থেকে তিনটে মিস্‌ড কল এসেছিল। সে বোতাম টিপে জিজ্ঞাসা করল, "কে বলছেন?"

চার কি পাঁচ সেকেন্ড নীরবতা। পাঁচ সেকেন্ডে পঞ্চাশ গজ দৌড়ে যায় পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ। তারপর গলা শোনা গেল, "সংহিতা কি?"

"আপনি কে বলছেন।?"

হয়ে গেল। আর তার ফলেই আলস্য শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ড্রইংরুমের দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, এখন এরাই হবে তার সঙ্গী। আত্মার চেহারা যদি এরকম হয় তা হলে মন্দ কী!

পরপর অনেকগুলো, অনেক রকম আত্মার স্কেচ করার পর তার মনে পড়ল পাশে হাঁটা সেই উদ্ধত লোকটার কথা। লোক না বলে পুরুষাত্মা বলাই সঠিক। এই, তুই তো মেয়েমানুষ। হা হা হা। এরকম কথা যে বলতে পারে তার মুখের আদল নিশ্চয়ই অন্যরকম হবে। কিছুক্ষণ লোকটাকে আঁকার চেষ্টা করে যখন মনমতো হচ্ছিল না তখন খেয়াল হল, দরকার কী! আত্মাদের কারও মুখ তো দেখা যাওয়ার কথা নয়। সবাই মুখ নিচু করে শরীর সামনে বেঁকিয়ে হাঁটছে। বরং এই আত্মার মাথার ওপর যে-একমাত্র চোখ সেটা আধখোলা থাক।

এসব করতে করতে যে দুপুর চলে এসেছে তা শব্দ-ঘড়ি জানিয়ে দিল। স্কেচবুক রেখে আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। সিক্তা দাঁড়িয়েছিল বাথরুমের দরজার সামনে, জিজ্ঞাসা করল, "গিজার অন করে দেব?"

"একটু পরে।"

এটা ওর অভ্যেস। শীতকালে তো বটেই, গরমের সময়েও ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করলে শরীরটা চাঙ্গা থাকে। শোওয়ার ঘরের টেবিলে রাখা মোবাইলটা তুলে নিয়ে সে জিভে শব্দ করল। আটটা মিস্‌ড কল। যেহেতু সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল তাই শব্দ শোনা যায়নি। প্রথম ফোনটা এসেছিল সকাল আটটায়, লীনা ফোন করেছিল। তারপর গ্যালারি সি থেকে তিনবার। নতুন গ্যালারি, প্রচুর সাজিয়েছে। মালিক ছেলেটি অল্পবয়সি। তার পিছনে লেগে আছে এগজিবিশনের জন্যে। তার পরের ফোনটা করেছিলেন হিমাদ্রি সেনগুপ্ত। প্রবীণ শিল্পী। সে নম্বরটা টিপল। রিং হচ্ছে ওপাশে। হ্যালো শব্দটা কানে আসতেই সংহিতা বলল, "আমি সংহিতা বলছি, আপনি ফোন করেছিলেন?"

"হ্যাঁ। তুমি দেশেই আছ তো?"

হেসে ফেলল সংহিতা, "হ্যাঁ। আছি।"

"তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ অনীশ আর আমাদের মধ্যে নেই!"

"হ্যাঁ। কাগজে পড়লাম।"

"ও! তা সে তো আমাদেরই একজন ছিল। আমরা ওকে নিয়ে একটু

কথাবার্তা বলব, শ্রদ্ধা জানাব। তুমি কি আসতে পারবে?" হিমাদ্রি সেনগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

"নিশ্চয়ই যাব।"

"তা হলে কোথায় হচ্ছে তা জেনে নিয়ো।"

"আমি আপনাকে ফোন করব।"

"ভাল থেকো ভাই।"

"আপনিও ভাল থাকবেন।" হিমাদ্রি সেনগুপ্ত ফোনটা রেখে দিলে সংহিতার খেয়াল হল, ওঁর বয়স আশির অনেক ওপরে। অনীশবাবু ওঁর অনুজ ছিলেন। কীরকম একটা শিরশিরে অনুভূতি হল। আচ্ছা, হিমাদ্রি সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার চেহারা কেমন হবে!

হিমাদ্রি সেনগুপ্তের পরে তিনটে মিস্‌ড কল এসেছিল। দশ মিনিটের মধ্যে তিনবার। নম্বরটা কার তা বুঝতে পারল না সংহিতা, সে মোবাইল নামিয়ে রাখল। অচেনা নম্বরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে হবে, "আপনি কে!" তার চেয়ে যার এত প্রয়োজন সে নিশ্চয়ই আবার ফোন করবে। সিক্তাকে গিজার অন করে দিতে বলে টুকটাক কাজগুলো সেরে নিতে নিতে সংহিতার মনে হল আজ অনীশবাবুর বাড়িতে তার যাওয়া উচিত। কিন্তু বাড়িটা কোথায় তা সে জানে না। অবশ্য যে-কোনও গ্যালারিকে ফোন করলে ঠিকানা পেতে অসুবিধে হবে না। সকালে কখনও বের হয় না সে, ড্রাইভারকে বলা আছে ঠিক বারোটায় আসতে। রাত দশটা পর্যন্ত তার ডিউটি। যদি সে না বের হয় তবু ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে হবে নীচে। আগে দরকার না থাকলে দুপুরেই ছেড়ে দিত। কিন্তু একদিন ছেড়ে দেওয়ার পর বিকেলে আচমকা খুব প্রয়োজন হল বাইরে যাওয়ার। তখন ড্রাইভার নেই। ফোন করে শুনেছিল তার মোবাইলের সুইচ অফ। সেই থেকে ড্রাইভারকে ডিউটিতে থাকতে হচ্ছে দশ ঘণ্টা।

বাথরুমে যাওয়ার সময় মোবাইল জানান দিল। বিরক্তমুখে ওটা তুলে নম্বর দেখল সংহিতা। সেই অচেনা নম্বর যা থেকে তিনটে মিস্‌ড কল এসেছিল। সে বোতাম টিপে জিজ্ঞাসা করল, "কে বলছেন?"

চার কি পাঁচ সেকেন্ড নীরবতা। পাঁচ সেকেন্ডে পঞ্চাশ গজ দৌড়ে যায় পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ। তারপর গলা শোনা গেল, "সংহিতা কি?"

"আপনি কে বলছেন।?"

"আমি, আমি জয়ব্রত। মনে আছে? হা-হা-হা।"

চোখ ছোট হল সংহিতার। গলা অচেনা লাগছে কেন? জিজ্ঞাসা করল, "কোন জয়ব্রত?"

আরও কিছুক্ষণ কথা নেই। তারপর লাইনটা বিচ্ছিন্ন হল। সংহিতা বুঝল ওপাশ থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থেকে ওটা রেখে বাথরুমে চলে গেল সংহিতা। পোশাক ছেড়ে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে কল খুলে দিল। হুড়মুড়িয়ে জল পড়তে লাগল মাথায়, শরীরে। তার পরেই খেয়াল হল জলটা এখনও গরম হয়নি তবে ঠান্ডার ঝাঁঝটা কমে গেছে। প্রতিদিন সে আর-একটু গরম জলে স্নান করে। চুলোয় যাক প্রতিদিনের অভ্যেস। জয়ব্রত! না, তার গলা চিনতে ভুল হয়নি। যতই বয়স স্বরটাকে অচেনা করুক শোনামাত্র সংহিতার মনে হয়েছে এ সে-ই। হঠাৎ, এতদিন পরে, কতদিন? চট করেই সময়ের ব্যবধান স্পষ্ট হল, তিরিশ বছর। তিরিশ বছর আগে কেউ যদি গভীর নদীতে ডুব দিয়ে হারিয়ে যায় এবং তিরিশ বছর পরে জলের ওপরে মাথা তুলে নিজের নাম উচ্চারণ করে তা হলে তাকে চিনতে হবে কেন? জলের ওপরে যেমন অনেক ধুলো ওড়ে, সেই ধুলো আড়াল করে দেয় সবুজ তেমনি জলের নীচেও শ্যাওলা জমে যা শরীরকে আঁশটে গন্ধে অচেনা করে দেয়।

আমি জয়ব্রত! কোন সাহসে শব্দ দুটো উচ্চারণ করল লোকটা! তারপর ওই হাসি! মনে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করে ওরকম হাসির কারণ কী! ব্যঙ্গ করা? ব্যঙ্গ করতে হলে ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে হয়। ওই হাসি সে শুনেছে। হ্যাঁ, এই তো গতকালই এই, তুই তো মেয়েমানুষ। হা হা হা। অবিকল। ওই উদ্ধত আত্মার সঙ্গে মোবাইলে ভেসে আসা কণ্ঠস্বরের কোনও পার্থক্য নেই। চোখ বন্ধ করল সংহিতা। শাওয়ারের জল তার সর্বাঙ্গ সিক্ত করে নীচে নেমে যাচ্ছে। আঃ, কী শান্তি!

গ্যালারি থেকে বাড়ির নম্বর নিয়ে যখন সংহিতার গাড়ি অনীশ সোমের বাড়ির সামনে পৌঁছোল তখন সেখানে কোনও মানুষ নেই। এমনকী বাড়ির বাইরের দরজাও আধভেজানো। গাড়ি থেকে নেমে ইতস্তত করলেও সংহিতা এগিয়ে গেল। সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে আধভেজানো দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভেতরটা দেখতে পেল। একজন প্রবীণা মহিলা পিছনে শরীর হেলিয়ে বসে

আছেন চোখ বন্ধ করে। সংহিতা দরজায় শব্দ করতেই তিনি ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। সংহিতা খুব নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "ভেতরে আসতে পারি?"

"হ্যাঁ।" প্রৌঢ়া নিজেকে গুছিয়ে নিলেন।

ভেতরে ঢুকে সংহিতা বলল, "আমার নাম সংহিতা। অল্পস্বল্প ছবি আঁকি।"

"ও! কিন্তু ওরা এখনও শ্মশান থেকে ফিরে আসেনি। নার্সিংহোম থেকে আনতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর এখানে একে একে ওরা জড়ো হয়েছিল অনেক সময় ধরে। বলা যায় না, শ্মশানে গেলে ওকে দেখলেও দেখতে পেতে পারেন।" প্রৌঢ়া কেটে কেটে কথাগুলো বললেন।

"কাগজে খবরটা পড়ে আমি ভেবেছিলাম ওসব অনেক আগেই হয়ে গেছে। নইলে সকালেই আসতে পারতাম। ঠিক কী হয়েছিল অনীশবাবুর?"

"আপনি দেখছি ওকে বাবু বলছেন। সবার মুখে তো অনীশদাই শুনি। অতিরিক্ত মদ্যপানে যেসব অসুখ হয় তার কয়েকটা একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল দিন সাতেক আগে। তা ডাক্তাররা আর কী করবে? সবক'টাকে তো একসঙ্গে সামলানো যায় না।" মাথা নাড়লেন প্রৌঢ়া।

"ওঃ।" সংহিতার গলা থেকে আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

"আজ জনা তিনেক মহিলা ওঁর শরীরের পাশে বসে খুব কান্নাকাটি করেছে। ওদের দু'জন নাকি ছবি আঁকে, একজন কবিতা লেখে।" প্রৌঢ়া বললেন।

"আপনি কি অনীশবাবুর স্ত্রী?"

"ছিলাম। আমাদের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভাই, আপনি যা বুঝছি তাতে মনে হচ্ছে ওঁকে দেখতে আসেননি। অর্থাৎ দেখার টান অন্য তিন মহিলার মতো আপনার মনে ছিল না। তা হলে কী কারণে এখন এসেছেন?" প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করলেন।

সংহিতা লক্ষ করছিল প্রৌঢ়া কথা বলছেন আর তাঁর বাঁ হাতটা সমানে কেঁপে যাচ্ছে। তাকে বসতে বলার কথাও ওঁর বোধহয় খেয়ালে নেই।

সে নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার যদি খুব আপত্তি না থাকে তা হলে একটু কি বসতে পারি?"

"হ্যাঁ। বসুন। আজকাল আমার কথা বলতে একটুও ইচ্ছে হয় না। তা

অনীশের সঙ্গে আপনার কি অনেকদিনের পরিচয়?"

"আলাপ হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। দেখা হয়েছে সাকুল্যে তিন কি চারবার। তার মধ্যে বেশি কথা হয়েছিল শেষবার যখন আমি ওঁর এগজিবিশনে যাই। আমি আপনাদের বাড়িতে এসেছি কারণ একজন শিল্পী চলে গিয়েছেন যিনি একটি আলাদা ধারা তৈরি করেছিলেন। যে-ঘরে তিনি ছবি আঁকতেন সেখানে একটু দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার জন্যে প্রার্থনা করে যেতে চেয়েছি।" সংহিতা বলল।

"কিন্তু উনি তো মৃত্যুর পর আত্মা আছেন বলে বিশ্বাসই করতেন না। বলতেন, যাদের আমরা আত্মা বলি তারাই নাকি এখন পৃথিবীতে মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই ওঁর ছবির মানুষের চেহারা ভাঙাচোরা, মেয়েদের শরীরের মেয়েলি অংশগুলো বড় উৎকট।"

হঠাৎ মনে হতেই সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আপনার শাশুড়িকে দেখেছেন?"

"কী করে দেখব! শুনেছি ওকে জন্ম দিয়েই তিনি গত হয়েছিলেন। কিছুদিন ধরে ওর একটা বাতিক শুরু হয়েছিল। নিজের গর্ভধারিণীকে প্রসবের আগের স্টেজে কীরকম দেখতে লাগত তাই কল্পনা করে আঁকার চেষ্টা করত। আমার মনে হত ব্যাপারটা খুব বিকৃত রুচির প্রকাশ। কিন্তু কিছু বলিনি। ওকে কিছু বলাই ছেড়ে দিয়েছিলাম বহু বছর ধরে।"

"কেন?"

"আমাকে সারাজীবন ধরে ভালবাসতে হবেই এমন মাথার দিব্যি ওকে কখনও দিইনি। কিন্তু যে-মেয়ে ওর সংস্পর্শে আসবে তাকে ভাল না লাগলেই সম্পর্ক ত্যাগ করবে কেন? আর বেশি দিন যে ভাল লাগবে না তা ওর জানা ছিল। তা হলে সম্পর্ক তৈরি করা কেন? বললে বলত, আমার আত্মা যেমন চাইছে তেমন করছি। বাহানা!"

সংহিতা প্রৌঢ়ার দিকে তাকাল, "আপনি কি অনীশবাবুকে মিস করছেন না?"

"মিস করতে করতে তাতেই অভ্যস্ত হয়ে আছি ভাই।"

সংহিতা বলল, "ওঁর আঁকার ঘরে একবার যেতে পারি?"

"যাবেন? যান। ওই সিঁড়ি দিয়ে ডান দিকের দরজা।" আঙুল তুলে দেখালেন প্রৌঢ়া।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল সংহিতা। সব আছে। তুলি, রং, পেনসিল, ক্যানভ্যাস কিন্তু কোনও ছবি নেই। না দেওয়ালে না টেবিলে। ঘরটাকে খুব ক্যাটকেটে দেখাচ্ছে বললে কম বলা হবে, খাঁ-খাঁ করছে। দ্রুত নীচে নেমে এল সংহিতা, "ওখানে তো কোনও ছবি নেই!"

"থাকবে কী করে? যে-কয়েকটা ছিল, নার্সিংহোমে যাওয়ার আগে সেগুলো গ্যালারিকে দিয়ে গেছে বিক্রি করার জন্যে। গ্যালারির মালিক আজ ফুল নিয়ে এসেছিল। বলে গেল, খুব শিগ্‌গির এগজিবিশন করবে। শোনো ভাই, আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।"

মাথা নাড়ল সংহিতা। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করলে সে অনীশ সোমের মুখটা ভাবল। এত সব শোনার পরেও লোকটার ওপর রাগ, বিতৃষ্ণা অথবা বিরক্তি হচ্ছে না কেন? আর পাঁচটা মানুষের মতো না হয়ে তিনি নিজের মতো বেঁচেছিলেন বলে? নিজেকেও তা হলে আত্মা বলেই মনে করতেন। সংহিতা জানলার বাইরে তাকাল। ছুটন্ত ফুটপাথ ধরে যারা হাঁটছে তারা সবাই আত্মা? পৃথিবী থেকে লীন হয়ে যাওয়ার আগে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য! মানুষ নিজেকে আত্মা মনে করে বলেই তো ঈশ্বরকে নাম দিয়েছে পরমাত্মা। এই আত্মাদের ছবি আঁকার সময় অনীশ সোম যেমন পারেন তেমন বিকৃত ভঙ্গি করেছেন। গর্ভধারিণীকে প্রসবের আগে আঁকতে চেয়েছিলেন তিনি। অর্থাৎ গর্ভধারিণীর গর্ভে যে ছিল সে আত্মা হয়ে জন্মেছে। জন্মেই জন্মদাত্রীকে মৃত অবস্থায় দেখেছে। শ্বাস ফেলল সংহিতা।

তখনই তার মনে এল গত রাতের স্বপ্নটা। সে তো নিজের আত্মাকেও দেখেছে। প্রথমে শায়িত অবস্থায়, তারপর আলোর ঢেউয়ে টালমাটাল হতে, মাটিতে দুটো পা আটকে যেতে, তারপর মিছিলে শরীর বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটতে। তখনও শুনতে হয়েছিল, "তুই তো মেয়েমানুষ! হা হা হা।" অর্থাৎ আত্মার পর্যায়ে গেলেও মেয়েমানুষ বলে তাকে চেনা গিয়েছিল? হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে ব্রেক চাপল ড্রাইভার। অল্পের জন্যে মাথা ঠুকল না সংহিতার। ড্রাইভার চিৎকার করল, "এই ঘাটের মড়া, এখানে মরতে এসেছিস কেন?"

বিরক্ত হল সংহিতা, "কী করে চালাচ্ছ?" ধমক দিল সে।

"কী করব দিদি! বলা নেই কওয়া নেই হুট করে সামনে চলে এসেছে। কিছু হলে পাবলিক তো আমার দোষ দেবে!" ড্রাইভার গজগজ করছিল।

যে চাপা পড়তে যাচ্ছিল তার বয়স বোঝা মুশকিল। কাঁপতে কাঁপতে জানলার পাশে এসে ড্রাইভারকে বলল, "ঠিক বলেছ ভাই। আমি ঘাটের মড়া। মরে ঘাটে বসে আছি। আমি কি বেঁচে আছি যে চোখ মেলে চলব!"

ড্রাইভার কথা না বলে গাড়ি চালু করল। সংহিতার কানে কথাগুলো কিছুক্ষণ সেঁটে রইল। ওরকম শুকিয়ে যাওয়া শরীর, কোটরে ঢুকে থাকা চোখ, এই লোকটির আত্মাও মরে গেছে।

আজ রুটিন বদলাল সংহিতা। বাড়িতে ফিরে এসে এক কাপ চা খেয়ে পড়ার ঘরের বদলে আঁকার ঘরে ঢুকে গেল সে। ড্রইংবুকটায় কিছুক্ষণ চোখ রাখার পর সরাসরি ছবি আঁকা শুরু করল। ঘণ্টাখানেক আঁকার পর মনে হল, কিছুই হচ্ছে না। তার ছবির ফিগারগুলো যেন ক্রীতদাসের মতো ঝুঁকে হাঁটছে। এইটে সে চায় না। আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সংহিতা।

রাতের খাওয়া শেষ হলে সিক্তা এসে দরজার পাশে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়াল যে, সংহিতার মনে হল ও কিছু বলতে চায়। সে জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার?"

"দেশ থেকে খবর এসেছে। কী করব বুঝতে পারছি না দিদি।" সিক্তা মুখ নামাল।

"কী খবর?"

"কাল রাত্রে সে মারা গিয়েছে।" ঠোঁট কামড়াল সিক্তা।

"কে?"

"যার সঙ্গে আমি ঘর ছেড়েছিলাম।"

আবার একটা কাহিনি শুনতে হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় থাকত সে?"

"ঝাড়গ্রামে।"

"তা হলে তো তোমারও সেখানেই থাকার কথা।"

"থাকতে পারিনি। এক বছরের মধ্যে ভুল ভেঙে গিয়েছিল। ঝাড়গ্রামে ট্যাক্সি চালাত সে। আমাদের বিয়ে হয়নি কিন্তু পাঁচজনের জন্যে সিঁদুর পরতে হত। দু'বছরের মাথায় সিঁদুর মুছে ফেলেছিলাম। তখন শ্বশুরবাড়িতে ফিরে

যাওয়ার উপায় ছিল না। কল্পনাদি আমাদের পাড়ায় থাকতেন। স্কুলে পড়ান। তাঁকে সব বলেছিলাম। তিনি আমাকে এখানে ওঁর বাবা-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। কল্পনাদির বাবা অসুস্থ হলে ওঁরা মেয়ের কাছে চলে যান। ততদিনে আমার সঙ্গে সেন্টারের জানাশোনা হয়ে গিয়েছিল। ওরা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছিল।" ধীরে ধীরে কাহিনি শোনাল।

"শ্বশুরবাড়ি ছাড়লে কেন?"

"ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার বুদ্ধি একেবারে বাচ্চা ছেলের মতো। খেতে কাজ করত কিন্তু ভাইরা একটা পয়সাও দিত না। যে-ভাইয়ের বউ বাপের বাড়িতে যেত সেই ভাই রাত্রে আমাকে তার ঘরে ডাকত। আমি আর পারছিলাম না। তখন এর সঙ্গে আলাপ। আমাকে কোনও স্বপ্ন দেখায়নি। শুধু বলেছিল, ভাতে-কাপড়ে রাখবে। অসম্মান করবে না। সাহস করে বেরিয়ে এসেছিলাম।"

"ভুল ভাঙল কেন?"

"ভাতে-কাপড়ে রেখেছিল। গায়ে হাত দেয়নি কখনও। কিন্তু ওর পরিচিতরা এলে আমাকে ঘর থেকে চলে যেতে বলত। ওরা নাকি মিটিং করত তখন। ওইরকম সময়ে পাশের বাড়ির মাসি আমাকে কল্পনাদির বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কীসের মিটিং জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিত না সে। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই দশ-বারো দিনের জন্যে উধাও হয়ে যেত সে। ওর এক বন্ধুর মুখে শুনলাম গবমেন্টের বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন হচ্ছে তাতে যোগ দিয়েছে সে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু ও জবাব দেয়নি।"

"মাওবাদী?"

"না না। মাওবাদীরা তো জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। ও সেই দলে ছিল না। তারপর একদিন পুলিশ এসে আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। ওরা ওকে আমার স্বামী ধরে নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছিল। জেলে পাঠাবে বলেছিল। ভয় দেখিয়েছিল খুব। বলেছিল সে বাড়িতে ফিরলেই যদি খবর না দিই তা হলে ভয়ংকর শাস্তি দেবে। পাশের বাড়ির মাসির কাছ থেকে খবর পেয়ে কল্পনাদি থানায় গিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনে। তারপর আর ওর সঙ্গে থাকার সাহস পাইনি।" সিক্তা বলল।

"তোমাকে খবরটা কে দিয়ে গেল?"

"মাসিকে ঠিকানা আর আপনার ওই ফোনের নম্বর দিয়েছিলাম। মাসি

ফোন করে বলল, কাল রাত্রে পুলিশের গুলিতে ও মারা গিয়েছে।" চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল সিক্তার।

"যার জন্যে এখন কাঁদছ তাকে ছেড়ে এলে কেন?"

"সে আমার কাছে সব লুকিয়েছিল কেন? আমার দায়িত্ব নিয়েও সে ভবিষ্যতের কথা ভাবেনি কেন? যদি আমার পেটে বাচ্চা এসে যেত তা হলে কী করতাম? যার আন্দোলনে এত শখ তার কি উচিত হয়েছে একটা মেয়েকে পথে বসানো?" চোখ মুছল সিক্তা, "কাঁদছি কারণ মানুষটা আমার ওপর কোনও অত্যাচার কখনও করেনি। যখন উধাও হয়ে যেত তখন বাজারের টাকা দিয়ে যেত। একবার এত দেরি করে ফিরেছিল যে, শুধু ভাত ফুটিয়ে খেয়ে বেঁচে ছিলাম। ফিরে এসে খুব ক্ষমা চেয়েছিল। সেই লোকটা বেঘোরে মরে গেল শুনে একটুও ভাল লাগছে না দিদি।"

একটু ভাবল সংহিতা। মেয়েটার জন্যে অন্যরকম ভাললাগা তৈরি হল। ওর স্বামী মরে গেলে বোধহয় দেখতে যেতে চাইত না। সে তাকাল, "তোমার স্বামীর কথা মনে পড়ে?"

"নাঃ।" দ্রুত মাথা নাড়ল সিক্তা।

"তুমি কি তাকে দেখতে যেতে চাও?"

"আমি কী করব বুঝতে পারছি না।"

"ভেবে দেখো। যদি যেতে হয় কাল সকালে চলে যেয়ো। অসম্ভব না হলে রাত্রে ফিরে এসো। দূরত্ব তো খুব বেশি নয়। কোথায় আছে জানো?"

"না। মাসি বলে দিতে পারে। কিন্তু আমি গেলে আপনার অসুবিধে হবে।"

"সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও।"

সিক্তা চলে গেল। কাল কী হবে এই মুহূর্তে সংহিতা ভাবতে চাইল না। সে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

জয়ব্রত ফোন করেছিল কেন? এতগুলো বছর পরে আজ কী কারণে ফোন করতে পারে? সারাদিন যে-অস্বস্তিকে চাপা দিয়ে রেখেছিল সে, এখন সেটা প্রকট হল। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল। জয়ব্রত সম্পর্কে কোনও আগ্রহ তার এতকাল ছিল না, এখনও হচ্ছে না। ফোনটা পাওয়ায় শুধু বিরক্ত হয়েছে। বিছানা থেকে নেমে এসে কৌটো খুলে ঘুমের ওষুধ বের করে মুখে দিয়ে জল ঢালল সে। একসময় কিছুকাল খেতে হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিলেন

ডিনারের আগে খেয়ে নেবেন, তা হলে তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যাবে। আজ বাধ্য হয়ে ডিনারের পর খেতে হল, দেরিতে হলেও ঘুম তো আসবেই।

"আমাকে চিনতে পারছিস না তুই, কিন্তু আমি তোকে চিনে ফেলেছি। হা হা হা।"

চমকে সে তাকাল ডানপাশে। মাথা নিচু, শরীর ঝুঁকে পড়া সত্ত্বেও হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে সে। এই গলার স্বর তেমন স্পষ্ট না হলেও ওই হাসিটাকে সে ভালভাবে মনে করতে পারল। এ তো জয়ব্রত। জয়ব্রত কোত্থেকে এল?

কিন্তু সে কোনও কথা না বলে ওই একই ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। তা হলে কি সেই ট্রেনে জয়ব্রতও ছিল? মনে করতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু ওই দুলুনি এবং তারপর ভয়ংকর আর্তনাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে ওপাশে পৌঁছোচ্ছে না স্মরণশক্তি। সে চিনবে না, কিছুতেই বুঝতে দেবে না চিনতে পেরেছে। এই লোকটা, যদি লোক বলা যায়, যে জয়ব্রত তার নিশ্চয়তা কোথায়? স্মৃতিতে তো কিছুই ধরা দিচ্ছে না। আচ্ছা জয়ব্রত নামটাও তার মনে পড়ার কথা নয়। কেন মনে এল!

এখন পায়ের তলার পথ কাদা কাদা হয়ে গিয়েছে। কাদায় পা বসে যাচ্ছে। ফলে প্রত্যেকের হাঁটার গতি কমে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। হঠাৎ মিছিলটা দাঁড়িয়ে গেল। তার পরেই ঝড় উঠল। প্রবল বাতাসে সবাই ছিটকে যেতে লাগল। পথ থেকে যেন কেউ তাকে তুলে নিয়ে গেল পাশের উঁচু ঢিপির ওপরে। সে দেখল পথ জনশূন্য। মিছিলের সবাই পথের দু'পাশে কুঁকড়ে রয়েছে। আর তখনই একটা ভয়ংকর আগুনের গোলা নেমে এল ওপর থেকে। লকলক করছে ঘিয়ে রঙের আগুন। সেই আগুন নীচে নেমে যাওয়ার সময় দু'পাশের কয়েকজনকে টেনে গিলে ফেলল। আর তার পরেই নেমে এল লাভার স্রোত। তীব্র ধোঁয়া বের হচ্ছে সেই স্রোত থেকে। উলটোদিকের পারে দাঁড়ানো কয়েকজনের ওপর সেই স্রোত ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্রোত যখন শেষ হল তখন দেখা গেল সেই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে সেই কাদামাটির পথে নেমে এল বাকিরা। আবার শুরু হল চলা। তার পাশে এখনও সেই হতচ্ছাড়াটা। চাপা গলায় বলল, "আমাদের যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কে জানে! তুই কিছু বুঝতে পারছিস?"

ফোঁস করে উঠল সে, "খবরদার, আমাকে তুই বলবেন না।"

"সে কী! আমার মুখ থেকে আপনি তুমি না এলে কী করব? তোকে দেখে আমার খুব স্নেহবোধ হয়েছে। হা হা হা।"

সে কিছু বলল না। এর সঙ্গ ত্যাগ করে একটু এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই সে গতি বাড়াতে পারল না। যেন তার কোনও ইচ্ছে নেই, অন্যের নির্দেশমতো তাকে হাঁটতে হবে।

এই সময় আকাশবাণী হল, "অত্যাচারীদের আমি পছন্দ করি না। তাদের জন্যে আছে প্রচণ্ড শাস্তি। তবে কেউ অত্যাচার করার পরে অনুশোচনা করলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে সে আমার ক্ষমা পেতে পারে। যারা জীবদ্দশায় ধ্বংসাত্মক কাজ করেছে তাদের আমি ক্ষমা করব না। তোমাদের মধ্যে যারা অনাথদের ওপর অত্যাচার করে এসেছ তাদের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলতে হবে। যারা অপচয় করেছে তাদের আমি পছন্দ করি না। যারা মন্দ কথা এবং নিন্দা করতে অভ্যস্ত ছিলে তাদের শাস্তি পেতে হবে। যারা নিরীহ নারীকে অপবাদ দিয়েছ তাদের জন্যে ভয়ংকর শাস্তি প্রস্তুত আছে। যারা অহংকারী, উদ্ধত, অশ্লীলতা ও অসৎ কাজে অভ্যস্ত ছিলে, ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী ছিলে তাদের কশাঘাতের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে যা কর্ম করেছ তার ফল পরলোকে এসে পাবে। এখন তোমরা নিজেরা ভেবে দেখো কে কী করেছ।"

আকাশবাণী শেষ হলেই অদ্ভুত নীলচে আলোয় চারধার আলোকিত হয়ে গেল। কেউ কোনও কথা বলছিল না। তখনই সে বুঝতে পারল তাদের কারও শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই। যে-প্রশ্ন মনে উঠছে তার তরঙ্গ যাকে স্পর্শ করছে সে-ই বুঝতে পারছে কথাগুলো। কোনও স্পষ্ট শব্দ নয়, একটা গুনগুনানি যেন চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর মিছিলটা দাঁড়িয়ে গেল। পথ রোধ করে রয়েছে একটা বিশাল জন্তু। তার তিনটে চওড়া পা, বিরাট শরীর, মাথার মাঝখানে একটা গোল চোখ যা থেকে আগুন ঝরছে আর হাতির শুঁড়ের মতো প্রত্যঙ্গ দু'পাশে দুলছে। আচমকা চিৎকার করে উঠল প্রাণীটা। দু'পাশের লম্বা শুকনো গাছের মাথা ছাড়িয়ে গিয়েছে তার শরীর। দু'বার চিৎকার করার পরে সেটি এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ে মিছিলটা ছত্রাকার হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে বড় চওড়া পা ফেলে মিছিলের ওপর দিয়ে পিছনে চলে গেল প্রাণীটা। ঠিক

সময়ে তার হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়েছিল সেই হা হা হা করা সঙ্গী, নইলে কাদামাটিতে মিশে যেত সে-ও। মিছিলের আয়তন এখন দুই তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছে। আর তখনই আকাশবাণী হল, "যারা চরম পাপ করে এসেছে তারা নরকে যাওয়ারও যোগ্য নয়। যারা পাপ কম করেছে তাদের স্থান হবে নরকে। যারা পাপী তাদের জন্যে স্বর্গের দরজা কখনও উন্মুক্ত হবে না। যারা সৎকর্ম করে এসেছে তারা স্বর্গলোকে প্রবেশ করতে পারবে। তাদের অন্দরে যদি কোনও বিষাদ থাকে তা হলে আমি তা দূর করে দেব। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কে স্বর্গলোকে আর কে নরকে যাবে।"

"তুই কোথায় যাবি?" প্রশ্নটা ভেসে এল পাশ থেকে।

যেহেতু তাকে ও রক্ষা করেছিল তাই ইতস্তত করেই সে পালটা প্রশ্ন করল, "আপনি কোথায় যাবেন?"

"স্বর্গ ছাড়া আমার তো কোথাও যাওয়ার কথা নয়।"

"কেন?"

"আমি তো কোনও পাপ কখনও করিনি।"

"পৃথিবীতে থাকার সময় কী করেছেন তা আপনি মনে করতে পারছেন?"

জবাব এল না কিছুক্ষণ। সে তখন বলল, "আমাদের কারও স্মরণে নেই পৃথিবীতে কী করে এসেছি। তাই না?"

"না। একটু একটু, অস্পষ্ট মনে পড়ছে।"

"কী?"

পাশ থেকে গাঢ় স্বর ভেসে এল, "আমি ভালবেসেছিলাম।"

ঘুম ভেঙে গেল সংহিতার। শরীরে তীব্র অস্বস্তি হচ্ছে। সেই সঙ্গে শীত করছিল খুব। উঠে বসল সে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বুঝতে পারল তার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে। কোনওরকমে বিছানা থেকে নেমে ফ্যানের সুইচ অফ করল সে। তারপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এরকম স্বপ্ন কেন দেখছে সে? সে তো এখনও জীবিত তা হলে মরণের পরে ওই যে যাত্রা তার স্বপ্ন কেন বারে বারে দেখতে হচ্ছে! অবচেতনে সে কি মৃত্যুর কথা ভাবছে? আচ্ছা, আজ রাত্রে যদি সে মরে যায়, না, আজ নয়, কাল সিক্তা তার মৃত প্রেমিককে দেখার জন্যে যদি চলে যায় তা হলে

এই বন্ধ ফ্ল্যাটে একা থাকার সময়ে যদি আচমকা তার মৃত্যু হয়, তা হলে কী হবে? সিক্তা ফিরে এসে বেল বাজাবে। তারপর লোক জড়ো করে দরজা না খোলানো পর্যন্ত তাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে হবে।

তারপর এই ফ্ল্যাট, ছবি, ব্যাঙ্কের টাকা, লকারের গহনা, এসব নেওয়ার জন্যে কারা হাত বাড়াবে? যে বা যারাই বাড়াক তাদের সঙ্গে বহু কাল যোগাযোগ নেই তার অথবা তাদের অনেককেই কোনওদিন দেখেনি সে। এদেরই বলা হয় পাঁচ ভূত।

জল খেল সংহিতা। ওই পাঁচ ভূতকে তার সম্পত্তি লুটেপুটে খেতে দেবে না সে। এগুলো অর্জনের সময় কেউ একটা টাকা দিয়ে সাহায্য করেনি তাকে। বিছানায় বসল সংহিতা। পরপর দু'রাত যে-স্বপ্ন সে দেখল তা তাকে সতর্ক করছে নিশ্চয়ই। এই যে আমি খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, রাগ করছি, ছবি আঁকছি, সেগুলো বিক্রির টাকা ঠিকঠাক পাচ্ছি কিনা হিসাব রাখছি, আয়কর দিচ্ছি, কখন আচমকা বুকের যন্ত্রটা বন্ধ হয়ে যাবে তা জানি না। আর সেটা বন্ধ হলে আমার সব কিছু অর্থহীন হয়ে যাবে। সংহিতা মাথা নাড়ল। তার পাশে স্বামী নেই, কোনও সন্তান নেই। তার কোনও যোগ্য উত্তরাধিকারী নেই। তা হলে সে এসব কার জন্যে রেখে যাবে?

এখন এখানে মধ্যরাত হলেও ববের শহরে রোদ্দুর নিভে যায়নি। স্যাটান আইল্যান্ডে ফোন করল সংহিতা। যেন পাশের ঘরের কাউকে ফোন করছে এমন জোরে রিং হতে লাগল। তারপরই ববের গলা শুনতে পেল, "হাই!"

"বব্, আমি সংহিতা।"

"ও মাই সুইট লেডি। এত রাত্রে জেগে আছ! ছবি আঁকছিলে?"

"নাঃ। স্বপ্ন দেখলাম। জার্নি আফটার ডেথ!"

"বাঃ! তোমার ছবির বিষয় তুমি স্বপ্নেই পেয়ে যাচ্ছ।"

"ওকে বব্। আমার ভাল লাগছে না। এখন ইন্ডিয়ার যে-কোনও ভদ্র মানুষ ঘুমিয়ে আছে। তাই তোমাকে কল করলাম।" সংহিতা আঙুল চুলে বোলাল।

"এনি প্রবলেম?"

"বব্, তুমি বিশ্বাস করো মৃত্যুর পরে মানুষ তার কর্মফল অনুযায়ী স্বর্গ বা নরকে যেতে পারে?" সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

"আমি তো কখনও গিয়ে দেখিনি, কেউ গিয়ে ফিরে এসে আমাকে বলেনি,

তবে এভাবে যদি ভাবো, আমরা কোন অজানা জায়গা থেকে পৃথিবীতে এসেছিলাম? কেউ কম কেউ বেশি বছর এখানে কাটিয়ে আমরা আবার সেই অজানা জায়গায় নিশ্চয় যাব। এক্ষেত্রে পৃথিবীটায় আমরা পরবাসী। এই পরবাসে আমরা কে কী করছি তার নিশ্চয়ই মূল্যায়ন হবে। যেভাবে সরকারি-বেসরকারি কাজের অডিট হয়। ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই তার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।" বব্ হাসলেন, "এরকম ব্যাপার মনে করলে অনেক কিছু স্বাভাবিক, সহজ হয়ে যায় মাই ডিয়ার লেডি।"

"ভাল কাজ মানে? আমার চেয়ে যারা কষ্টে আছে তাদের সাহায্য করা?"

"এটা অনেক কিছুর মধ্যে একটা। একটি ধর্মগ্রন্থে পড়েছিলাম, যে সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্যে এবং কারও প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালনের সন্তুষ্টিলাভের জন্যে। যে গোপনে অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে, যে সাহায্যের কথা প্রচার করে না সে প্রতিপালকের আশীর্বাদে ধন্য হবেই।" বব্ বললেন, "তবে সেই সঙ্গে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, তুমি যেমন কৃপণ হবে না তেমনি একেবারে মুক্তহস্ত হওয়ার দরকার নেই। প্রথমটার জন্যে লোকে তোমার নিন্দা করবে আর দ্বিতীয়টা তোমাকে নিঃস্ব করবে। মাই ডিয়ার লেডি, তুমি এখন ঘুমিয়ে পড়ো। পারলে একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে নাও। রাখছি। গুড নাইট।"

মোবাইল অফ করে মাথা নাড়ল সংহিতা, "বব্, ট্যাবলেট তো আজ খেয়েছিলাম। কিন্তু ঘুমোলেই ওই ভয়ংকর স্বপ্ন আমাকে দেখতে হচ্ছে।"

আর ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করতে করতে এল ভোররাতে।

ঘুম ভাঙল যখন তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা। ভাঙতেই মনে পড়ল, সিক্তার তো চলে যাওয়ার কথা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল সিক্তা তৈরি হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

"এ কী! আমাকে ডাকোনি কেন?"

"আপনি ঘুমোচ্ছিলেন।"

"তাই বলে ডাকবে না?"

"মনে হল রাত্রে ঘুম হয়নি আপনার, টেলিফোনে কথা বলছিলেন।"

"তুমি জেগেছিলে কেন? আমি তো তোমার ঘুম ভাঙানোর মতো শব্দ করে কথা বলিনি।"

"কাল রাত্রে ঘুমোতে পারিনি দিদি।"

"কেন?"

"হাজার হোক মানুষটা আমার উপকার করতে চেয়েছিল। সে পুলিশের গুলিতে বেঘোরে মারা যাবে ভাবতেই পারছি না।" চোখ মুছল সিক্তা।

"ঠিক আছে, অনেক বেলা হয়ে গেছে। এখনই বেরিয়ে যাও।"

"দিদি, আমি চলে গেলে আপনার খুব কষ্ট হবে।"

"আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না সিক্তা।"

"তা হলে চা করে দিই।"

খবরের কাগজ আর চা টেবিলে পাওয়ার পর সংহিতা সিক্তাকে চারশো টাকা দিল, "এটা রাখো। যাতায়াতের বাস ভাড়া ছাড়া খেতেও তো লাগবে।"

"আমার মাইনে থেকে কেটে নেবেন।"

"কী করব সেটা আমি ঠিক করব। যদি দেখো ফিরতে পারছ না তা হলে দয়া করে ফোন করে দিয়ো।" কাগজ খুলল সংহিতা।

সিক্তা বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল। হঠাৎ সংহিতার মনে হল এখন এই ফ্ল্যাটে সে একা। তার যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে কেউ টের পাবে না। সে দ্রুত চা খেয়ে খবরের কাগজ ভাঁজ করে রেখে উঠে দাঁড়াতেই মোবাইল বেজে উঠল। সেই নম্বর, যা থেকে জয়ব্রত ফোন করেছিল। ধরার কোনও দরকার নেই, প্রথমে ভাবল সংহিতা। কিন্তু শব্দটা ক্রমশ তার নার্ভে আঘাত করতে লাগল। তারপর থেমে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার বেজে উঠল। নিজেকে সামলাল সংহিতা। মোবাইল অন করে জিজ্ঞাসা করল, "কী চাইছ?"

"তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। দশ মিনিটের বেশি সময় নেব না।"

"অসম্ভব। একথা বলতে তোমার সাহস হল কী করে?"

"বাধ্য হয়ে, বিশ্বাস করো। আমি খুব সুস্থ নই।" জয়ব্রত বলল।

"জয়ব্রত, এসব কথা বলে তুমি আমার সিমপ্যাথি পাবে বলে যদি আশা করো তা হলে আর-একবার নিজেকে মূর্খ প্রমাণ করবে। রাখছি।"

"এক মিনিট। ঠিক আছে, আমাকে সময় দিয়ো না, একবার টিকলির সঙ্গে দেখা করো।"

থম লাগল বুকে। কোনওরকমে বলল সংহিতা, "ভেবে দেখব।" তারপর লাইন কেটে দিয়ে সুইচ অফ করে দিল।

টিকলি। তিরিশ বছর আগে টিকলির বয়স ছিল চার। ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে। ওই বয়সে নিজের মতো নাচত যখন খুশি। জয়ব্রত তখন আর্ট কলেজে পড়াচ্ছে, আঁকা শেখাচ্ছে। ওর অভ্যেস ছিল একটু জোরে কথা বলা। আর মাঝে মাঝেই হা হা হা করে হাসা। আঠারো বছর বয়সেই ছাত্রী হিসেবে যেটুকু কাছে আসা যায় তাতে জয়ব্রত সম্পর্কে একটা টান অনুভব করত সে। তার অনেক পরে শুনল জয়ব্রতর স্ত্রী তার প্রেমিকের হাত ধরে স্বামী এবং মেয়েকে ছেড়ে প্রবাসে চলে গিয়েছে। তখন খুব খারাপ লেগেছিল। সে সময় সে আর্ট কলেজের ছাত্রী নয়। বাবার পছন্দ মানতে হয়েছিল মায়ের অনুরোধে। বাগবাজারের দত্তবাড়ির আভিজাত্য নাকি ওই পরিবারের গর্ব।

ফোন বাজছে। ল্যান্ড ফোন। রিসিভার তুলেই কেয়ারটেকারের গলা শুনতে পেল, "ম্যাডাম, আপনার মেডসার্ভেন্ট একটু আগে বলে গেল ভাল খাবার যারা হোম-ডেলিভারি করে তার টেলিফোন নম্বর আপনাকে দিতে। বলব ম্যাডাম?"

ঠোঁট কামড়াল সংহিতা। তবু সিক্তার এই পাকামোটা মন্দ লাগল না সংহিতার। নিস্পৃহ গলায় বলল, "বলুন।"

নম্বর ও সংস্থার নাম জানালে সংহিতা লিখে নিল। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল। প্রথমে তার মনে হল, একদিন তথাকথিত লাঞ্চ বা ডিনার না খেলে কোনও মানুষের ক্ষতি হয় না। একটা ডিমের ওমলেট এবং টোস্ট খেলেই চলে যায়। অনেকদিন পরে রান্নাঘরে ঢুকল সংহিতা। সিক্তা আসার পরে সে এই ঘরে ঢোকেনি। ঢুকতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। গ্যাস পরিষ্কার করেনি মেয়েটা ভাল করে। পাশের দেওয়ালে ধোঁয়া লেগে লেগে কালচে হয়ে গেছে। ফ্রিজ খুলল সংহিতা। নাক সিঁটকে গেল, কতদিন ফ্রিজ পরিষ্কার করেনি সিক্তা? মেয়েটার কথাবার্তা, ব্যবহার এত ভাল, রান্নাও মন্দ করে না কিন্তু এত অপরিষ্কার কেন? তারপরেই খেয়াল হল। যার জন্ম এবং বড় হওয়া গ্রামের গরিব সংসারে তার তো শিক্ষার অভাবে কিছু খামতি থেকেই যেতে পারে। ও এলে ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে রাগারাগি না করে।

আঁকার ঘরে এল সংহিতা। নতুন ক্যানভাসে স্কেচ শুরু করল। কাল রাত্রে যেমন দেখেছিল মিছিলটাকে তেমনই আঁকার চেষ্টা করল। করতে

করতে একটা সময় থমকাল। বব্ বলেছিলেন, ভাল কাজ করলে তার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এতদিন শুনেছিল, ফলের জন্যে চিন্তা কোরো না, কাজ করে যাও। এই কাজটা নিশ্চয়ই ভাল কাজ করা। প্রতিদানের আশা ত্যাগ করে নিজেকে একেবারে নিঃস্ব না করে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। বাঃ। এসব কথা তো পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থে লেখা হয়েছে। আর গ্রন্থ যখন আজ লেখা হয়নি, দীর্ঘকাল ধরে গ্রন্থগুলো আছে কিন্তু সেইসব উপদেশ অনুসরণ করার ইচ্ছে হয়নি কখনও। এতদিন কথাগুলো কানে ঢুকেছে কিন্তু মনে পৌঁছোয়নি।

সংহিতা আবার আঁকা শুরু করল। স্কেচ যখন কিছুটা এগিয়ে গেছে তখন ঘড়ির আওয়াজ কানে এল। নাঃ, রান্নাঘরে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না তার। কেয়ারটেকারের দেওয়া নম্বরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করল, "ঘরোয়া? হ্যাঁ, যদিও অনেক বেলা হয়ে গেছে তবু আপনাদের যদি অসুবিধে না থাকে তা হলে এখন লাঞ্চ পেতে পারি?"

"অসুবিধে নেই। কোত্থেকে বলছেন?"

জায়গাটা জেনে নেওয়ার পরে লোকটি বলল, "এখন আমরা ভাত, শুক্ত, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, সবজি আর মাছ অথবা মাংস এবং চাটনি দিতে পারব।"

"আমার এসব না হলেও চলবে। রুটি আর চিকেন স্যুপ দেওয়া সম্ভব হবে?"

"ওটা রাত্রে দিতে পারব।"

অগত্যা বাঙালি খাবারেই রাজি হল সংহিতা। ঠিকানা বলে দিয়ে ব্যালকনিতে চলে এল। এখানে দাঁড়ালে কলকাতার অনেকটাই দেখা যায়। সন্ধের পরে চেয়ার নিয়ে বসলে দিব্যি সময় কেটে যায়। আবার ফোন বাজছে শুনতে পেল সংহিতা। এবার মোবাইল। জয়ব্রত যদি আবার ফোন করে তা হলে ওটার সুইচ অফ করে দিতে হবে।

ঘরে এসে মোবাইলে নম্বরটা দেখল সংহিতা। অচেনা নম্বর। সে বোতাম টিপে জিজ্ঞাসা করল, "কে বলছেন?"

"হাই সুইটি!" শব্দ দুটোয় অনেক উচ্ছ্বাস মাখামাখি।

"মিলা? হোয়াট এ সারপ্রাইজ!" চোখ বড় হল সংহিতার, "তুমি কোথায়?"

"তোমার বাড়ির সদর দরজায়।"

"সে কী!"

"গার্ড বলছে তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে ঢুকতে দেবে না। আমি বললাম, তার আগে আমি কথা বলে দেখি, চিনতে পারে কিনা!" হাসল মিলা।

"তুমি রাখো, আমি ওকে বলে দিচ্ছি।"

মোবাইল নয়, লান্ডলাইন থেকে গার্ডকে নির্দেশ দিল সংহিতা মিলাকে উপরে আসার ব্যাপার সাহায্য করতে। মিলা এই ফ্ল্যাটে একবারই এসেছিল কয়েক বছর আগে।

একটু পরেই বেল বাজল। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই মিলা সমস্ত মুখে হাসি ছড়িয়ে দুটো হাত দু'দিকে বাড়াল। বছর দশেকের ছোট মিলাকে দেখলে মনেই হবে না পঞ্চাশের কাছে চলে এসেছে। পরনে হারেম প্যান্ট আর স্লিভলেস শার্ট, কাঁধে স্ট্র্যাপে ঝোলা চামড়ার ঢাউস ব্যাগ। ভাল করে দেখার আগেই ঘরে ঢুকে মিলা তার গলা জড়িয়ে ধরে সশব্দে ঠোঁটে চুমু খেল।

কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সংহিতা বলল, "এই, কী হচ্ছে?"

"কী হচ্ছে মানে? আর কেউ আছে নাকি ফ্ল্যাটে? কারও সঙ্গে আছ না বিয়ে করেছ? তা হলে দেখতে হবে ভাগ্যবানটি কে?" মিলা চোখ ছোট করল।

"দুটোর কোনওটাই না।"

"বাঃ। তুমি কী ভাল।" আবার চুমু খেল মিলা, এবার গালে। বাঙালি মেয়েদের চেয়ে অনেক লম্বা মেয়েটা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "বেডরুম কোথায়?"

সংহিতা তাকে বেডরুমে নিয়ে গেলে সে ব্যাগটা চেয়ারের ওপর ছুড়ে ফেলে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল খাটে, "উঃ কী টায়ার্ড লাগছিল, মরে যাচ্ছিলাম!"

"কেন? কী হয়েছিল। দেশে কবে ফিরেছ?" সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

চোখ বন্ধ করল মিলা, জবাব দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ওকে ওইভাবে থাকতে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল সংহিতা। বারোটা বেজে গেছে। ধরে নেওয়াই যেতে পারে মিলা লাঞ্চ করে আসেনি। হোম ডেলিভারির খাবার কি দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট? শোনা যায় ওরা একটু বেশি দিয়ে থাকে। নাকি, ফোন করে বলবে আর-একটা ডিশ দিতে।

"বাস্টার্ড!" নিচু গলায় বলল মিলা। সংহিতা তাকাল, মিলার চোখ বন্ধ।

"কার কথা বলছ?"

"লোকটার কালেকশনে দালি, পিকাসোর ছবি আছে। প্রত্যেক বছর প্রচুর ছবি কেনে। ওর কালেকশন যেখানে রেখেছে তা যে-কোনও গ্যালারির থেকে অনেক বেশি বিজ্ঞানসম্মত। লোকটার নাম ইয়ুসোফ। মরুভূমির ভেতরে যে-বাড়ি বানিয়েছে, তা দেখলে তাজ্জব হতে হয়।" কথা বলতে বলতে শ্বাস ফেলল মিলা শব্দ করে।

"মরুভূমি?"

"দুবাইয়ের কাছে। শেখ ইয়ুসোফ।" আচমকা উঠে বসল মিলা, "বাস্টার্ড! মাদার ফাকার!"

সংহিতা অবাক হল, "এই, গালাগাল দিচ্ছ কেন?"

"কেন দেব না? পরশু রাত্রে একটা পার্টিতে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। যে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তার কাছে খবর পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সত্যি ওঁর সংগ্রহে দালি এবং পিকাসো আছে কিনা। তখন শালার কী বিনয়! বলল, ওদের কাজ আছে কিন্তু ম্যাডাম আপনার কোনও কাজ আমার কাছে নেই। এটা কি ভাল কথা? আমি গলে গেলাম। বললাম আমি ওকে সিডি দেখাতে পারি, যে-ছবিটা পছন্দ করবে সেটা পাঠিয়ে দেব। ঠিক হল পরের দিন সকাল দশটায় ও আমাকে নিয়ে যাবে ওর আর্ট কালেকশন সেন্টারে। আমি যখন পিকাসো বা দালি দেখব তখন ও আমার সিডি দেখে নেবে।" মিলা বলল।

"সত্যি, দালির অরিজিন্যাল দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি।" মাথা নাড়ল মিলা, "ফ্যান্টাস্টিক গ্যালারি। মরুভূমির মধ্যে একটা বিশাল এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ি। ছবিগুলো যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে যে-ব্যবস্থা নিয়েছে তা বোধহয় ল্যুভরেও নেওয়া হয় না। তারপর লোকটা আমাকে যে-ঘরে নিয়ে গেল সেখানে পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত ফিল্মের সিডি রয়েছে। বিশাল বড় স্ক্রিন। লক্ষ করলাম ওর কর্মচারীরা সব বাইরের ঘরগুলোয় কাজ করছে, ভেতরের ঘরে কারও ঢোকার অধিকার নেই। গ্যালারির দরজায় অটোমেটিক তালা। কোড্ জানা না থাকলে কারও পক্ষে খোলা সম্ভব নয়। লোকটা গ্যালারি থেকে বের হলেই কোড চেঞ্জ করে দেয়। আমার সিডি ও নিজেই চালাল। ছবির যা সাইজ তার চেয়ে চারগুণ

বড় হয়ে এল স্ক্রিনে। গোটা পনেরো ছবি ছিল সিডিতে। চুপচাপ একের পর এক দেখে যাচ্ছিল সে। তেরো নম্বর ছবি পরদায় ভেসে আসতেই সে মিনিট ছয়েক চুপচাপ দেখতে লাগল।"

"কী ছিল ওই ছবিতে?"

"ফার্স্ট ইন্টারকোর্স অফ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান। ইভ এবং আদমের প্রথম সঙ্গম। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করেছিলেন তখন সেক্স সম্পর্কে কোনও ধারণা ওদের ছিল না। পরস্পরের সান্নিধ্য যখন ওদের উত্তাপ দিচ্ছে তখন ওরা পশুদের সঙ্গম করতে দেখল। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পুরুষ প্রাণী পিছন থেকে কাজটা করেছে। এবং আদম ইভের সঙ্গে সেই পথই অনুসরণ করেছিল। আমার ছবিতে আদমের শরীর ছিল ইভের শরীরের অনেকটা আড়ালে। ইভের মুখ ভয়ংকর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠেছিল। সে আদমের কাছ থেকে পরিত্রাণের জন্যে ছটফট করছিল।" মিলা বলল।

"তারপর?"

"লোকটা ওই ছবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। জিজ্ঞাসা করল কত দাম দিতে হবে। প্যারিসের একটা এগজিবিশনে ওর দাম উঠেছিল তিরিশ হাজার ডলার। যে কিনতে চেয়েছিল সে ইনস্টলমেন্টে দেবে শুনে আমি রাজি হইনি। আমি ওই দামটাই বললাম। শুনে লোকটা হো হো করে হাসতে লাগল। বলল, আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেব। ব্যাগ থেকে চেকবই বের করে জিজ্ঞাসা করল, কী নেবে? চেক না ক্যাশ?"

"কিন্তু ছবি তো এখন আমার সঙ্গে নেই। ওটা ভিয়েনাতে আমার স্টুডিয়োতে আছে।" বললাম।

"কোনও সমস্যা নেই। তুমি তারিখ বললে আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।"

আমি একটু ভাবলাম, এরকম লোকের চেক কখনওই বাউন্স করবে না। করলে ছবি দেব না। তা ছাড়া পঞ্চাশ হাজার ইউএস ডলার নিয়ে প্লেনে উঠলে আমাকে কাস্টম ধরবে। শেষপর্যন্ত বললাম, আপনি আমাকে টেন পার্সেন্ট ক্যাশে অ্যাডভান্স দিন। ছবি নেওয়ার সময় বাকিটা দেবেন।"

"যা তোমার ইচ্ছে।" বলে লোকটা আমাকে পঞ্চাশটা একশো ডলারের চকচকে নোট দিয়ে বলল, "কিছু মনে কোরো না, কাকে দেখে তুমি ওই ইভকে এঁকেছ। মডেল কে?"

হেসে বলেছিলাম, "আমি কোনও মডেল ব্যবহার করিনি। মাঝে মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখে নিয়ে এঁকেছি।"

সে বলল, "মাই গড। তুমি আমাকে একটু দেখাও।"

আমি বললাম, "কী বলতে চাইছেন?"

সে বলল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার কথা। প্রমাণ চাই।"

"মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে বলছি?" রেগে গেলাম আমি।

"হয়তো! কী জানি!"

"তা হলে আপনাকে ছবি কিনতে হবে না।"

"ছবির কেনাবেচার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। সে কাছে এসে দাঁড়াল, আমি ছবিটার দিকে যখনই তাকাব তখনই মনে করতে চাই মডেল কীরকম ছিল। প্লিজ।"

লোকটা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি বাধা দিতে চাইলাম। কিন্তু ওর শরীর থেকে একটা গন্ধ বের হয়ে আসছিল, হয়তো কোনও আতরের যা আমার নাকে যাওয়ামাত্র মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। এইখানে তোমাকে বলছি, আচমকা আমার ব্যাপারটা খারাপ লাগছিল না। আমার সব পোশাক খুলে নিয়ে সে অদ্ভুত চোখে শরীরটাকে দেখল। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে কোলে তুলে নিয়ে ডিভানে উপুড় করে শুইয়ে দিল। ও যে আমার ছবির আদমের মতো আক্রমণ করবে বুঝতে পারিনি। কিন্তু ওর দীর্ঘ শক্তিশালী শরীর আমাকে নড়তে দিচ্ছিল না। আমার রেক্টাম ছিঁড়ে যাচ্ছিল যন্ত্রণায়। আমি কাঁদলাম। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলাম।"

"সে কী!" সংহিতা হাঁ হয়ে গেল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম সে একটু দূরে ভদ্রভাবে বসে হাসছে, "এখন কেমন লাগছে? নিশ্চয়ই আর ব্যথা নেই। আমি খুব ভাল ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছি।"

উঠে পোশাক পরলাম। ব্যথা আছে কিন্তু তখনকার মতো তীব্র নয়।

গম্ভীর গলায় বললাম, "আমি যেতে চাই।"

"নিশ্চয়ই। ওই দরজা খুলে বাইরে যাও। আমার ড্রাইভার তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে। হ্যাভ এ নাইস জার্নি। সে হাসল। মনে হচ্ছিল আমার শরীর থেকে সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে। ওর কর্মচারীর দেখানো পথে টলতে টলতে কোনওরকমে গাড়িতে উঠে বসলাম। হোটেলের ঘরে

ফিরে অনেকক্ষণ কাঁদলাম। তারপর সন্ধেবেলায় প্লেন ধরতে যাওয়ার সময় আবিষ্কার করলাম লোকটা আমার পোশাকের পকেটে ওই একশো ডলারের নোটগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে। একবার মনে হয়েছিল ছুড়ে ফেলে দিই ওগুলো। তারপর মত বদলালাম। অ্যাডভান্স যখন দিয়েছে তখন ইউসুফ ছবি নেবেই। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে লাভ কী? রাত দশটায় দিল্লিতে পৌঁছে ভোর অবধি ঘুমিয়ে আজ কলকাতায় এলাম।" মিলা মাথা নাড়ল।

সংহিতা চেয়ার টেনে মিলার সামনে বসল, "তুমি পুলিশের কাছে গেলে না কেন?"

মুখ বেঁকিয়ে হাসল মিলা, "আমি তখনও পাগল হয়ে যাইনি বলে।"

"মানে?"

"আমি পুলিশের কাছে গিয়ে যদি কমপ্লেন করতাম তা হলে দুটো ঘটনা ঘটত। একটা, আমি ট্যুরিস্ট হয়ে দুবাইতে গিয়ে ব্যাবসা করার চেষ্টা করেছি। ছবি বিক্রি করা তো ব্যাবসা করা। এই অপরাধের জন্যে আমার ভিসা বাতিল করে ওরা আমাকে জেলে ঢোকাতে পারত। দু'নম্বরটা হত আরও খারাপ। আমার অভিযোগের খবরটা ওরা সঙ্গে সঙ্গে ইউসুফকে জানিয়ে দিত। তা হলে আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যেত না।" মিলা বলল।

"সে কী?"

"হ্যাঁ। হোটেল থেকে এয়ারপোর্টে আমি কখনওই পৌঁছোতে পারতাম না। পুলিশও চেষ্টা করত না কয়েকশো কোটি ডলারের মালিককে বিরক্ত করতে। আমি তখন মাথা ঠান্ডা রেখে প্লেনে উঠে পড়েছিলাম, এটা একটা দারুণ কাজ করেছি।"

"এখন শরীর কীরকম?"

"খুব টায়ার্ড। কলকাতায় এসে বাড়িতে উঠিনি। সোজা হোটেলে গিয়েছি।"

"যন্ত্রণা আছে এখনও?"

মাথা নেড়ে না বলল, "কী ওষুধ দিয়েছিল জানি না, খুব ভাল কাজ হয়েছে। ওই ওষুধটা লোকটা কাছে রাখে কেন? নিশ্চয়ই আমার আগে অন্য মেয়েদের সঙ্গে একই কাণ্ড করে ব্যবহার করেছে। উঃ!"

"হোটেলে উঠলে কেন?"

"ফ্ল্যাট তো নোংরা হয়ে আছে। গিয়ে আমাকেই সব পরিষ্কার করতে

হত। আর পারছিলাম না। দু'দিন হোটেলে থেকে একটু তাজা হয়ে তারপর যাব।"

"এখন তোমার কোথায় কোথায় ফ্ল্যাট আছে?"

"এমন ভাবে বলছ যেন পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কলকাতা আর ভিয়েনাতেই ফ্ল্যাট, লন্ডনে একটা ছোট্ট অ্যাটাচ্‌ড বাথওয়ালা ঘর। ব্যস।"

"এখন কার সঙ্গে আছ?"

"কেন্ট নামের একটা ছেলে। সে-ও পেন্টার কিন্তু নপুংসক।"

"তার মানে?"

"যৌন প্রতিবন্ধী।"

"তার সঙ্গে আছ?"

"খুব নিরাপদে আছি। তবে ওকে বলে এসেছি নিজের জায়গা খুঁজে নিতে। বেচারা যে ছবি আঁকে তার কোনও খদ্দের নেই। খুব খারাপ অবস্থা। কিন্তু অনেকদিন তো ওকে বইলাম। এখন ও ঘাড় থেকে নেমে যাক।" মিলা বলল।

"এক কাজ করো। দু'দিন হোটেলে থাকতে হবে না। এখানেই থাকো। তুমি আমার ড্রাইভারের সঙ্গে গাড়ি নিয়ে গিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে এসো।"

"এখানে।" সঙ্গে সঙ্গে মিলার চেহারা বদলে গেল। দু'হাতে সংহিতার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "দারুণ হবে। থ্যাঙ্ক ইউ। কিন্তু তোমার বাড়িতে কাজের লোক নেই?"

"আছে। দেশে গিয়েছে।"

"তা হলে এক কাজ করি। ড্রাইভারকে বলে দাও, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে চেক-আউট করে ফিরে আসছি।" মিলা উঠে দাঁড়াল।

মিলা চলে যাওয়ার পর হোম-ডেলিভারির খাবার এসে গেল। ওদের পাত্র নিয়ে নিজের থালা বাটি সসপ্যানে ঢেলে নিয়ে ফেরত দিল দাম সমেত সংহিতা। তারপরে স্নান করতে ঢুকল। আয়নায় নিজের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল সে। যে ছেলেটা খাবার দিতে এসেছিল সে কেন তার মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল এখন বুঝতে পারল। তার ঠোঁটের ওপরে মিলার লিপস্টিকের ছাপ এখন অস্পষ্ট দেখালেও আছে। দ্রুত তোয়ালে দিয়ে ওটা মুছে ফেলল। একটু জোরেই ঘষেছিল তাই ঈষৎ জ্বলুনি অনুভব করল।

অদ্ভুত মেয়ে। এই চুমু খাওয়াটা ওর অনেকদিনের রোগ। এখন দেখা হলে

অনেকেই গদগদ হয়ে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঘষে কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুমু খায় না। প্রথম আলাপ হওয়ার পরে মিলা যখন এই কাণ্ড করত তখন প্রচণ্ড আপত্তি করত সে, শরীর ঘিনঘিনিয়ে উঠত। সে অনুমান করত একমাত্র লেসবিয়ানরাই পরস্পরের ঠোঁটে চুমু খায়। কিন্তু ওই চুমু খাওয়া ছাড়া মিলার আচরণে এমন কোনও ছাপ ছিল না যাতে ওকে লেসবিয়ান মনে হতে পারে। তার আপত্তির কথা শুনে মিলা হো হো করে হেসেছিল, "তোমাকে আমার ভাল লাগে। আমি আমার মাকেও ঠোঁটে চুমু খেতাম। শেষের দিকে আপত্তি করলে জোর করে খেতাম। কোনও ছেলেকে ভাল লাগলে তার ঠোঁটেও চুমু খাই। আমার মনে হয় এটাই ভাল-লাগা জানানোর ঠিক উপায়। তা ছাড়া তাতে তো আমিও আনন্দ পাই।"

সংহিতা লক্ষ করেছে মিলা অনেকদিন পরে দেখা হলে এই কাণ্ডটা দু'-তিনবার করে। কিন্তু তারপর নিয়মিত দেখা হওয়ার সময়ে ভুলেও চুমু খায় না। হেসে ফেলল সে, বিচিত্র চরিত্র!

ড্রাইভার ফিরে এসে নীচের ফোন থেকে জানাল, "ওই মেমসাহেব আসেননি।"

"মানে?"

"হোটেলে গিয়ে বললেন, আমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোব। তুমি ফিরে যাও।"

"ঠিক আছে।"

এভাবে সিদ্ধান্ত পালটানো মিলার দ্বারাই সম্ভব। খেতে বসল সংহিতা। বহু দিন পরে শুক্ত খেয়ে খুব ভাল লাগল। এদের রান্নাও বেশ ভাল। সিক্তা খারাপ করে না কিন্তু এর ধারে কাছে না। খাওয়া শেষ করে খবরের কাগজ নিয়ে বসতেই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। পাতা জুড়ে একটা নামী বড় সোনার কোম্পানির বিজ্ঞাপন। গহনার ছবি। এখন সোনার ভরি তো বাইশ হাজার টাকা। সাধারণ মানুষ কেনে বলেই তো এরা এত খরচ করে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। গয়নার ব্যাপারে তার কোনও কালেই আকর্ষণ ছিল না। বিয়ের পর অভিজাত দত্তবাড়িতে গিয়ে দেখেছে বউগুলো সর্বাঙ্গে সোনার গয়না চাপিয়ে বসে আছে। এমনকী শাশুড়িমা, যাঁর বয়স ষাটের ওপরে তিনিও গয়না না পরে ঘুমোতে পারতেন না। বিয়ের ক'দিন বাদে তাকে আলাদা ডেকে বলেছিলেন, "তোমার শ্বশুরমশাই তো রূপ দেখে গলে গেলেন। গরিবঘর হলেও বললেন

পঙ্কে পঙ্কজ ফুটেছে। তাকে নিয়ে আসবই। বিয়ের আগে বাপের দেওয়া একচিলতে সোনা যখন পরতে তখন দেখার কেউ ছিল না। বিয়ের সময় তো তোমাকে কিছুই দিতে বাকি রাখিনি। এখন থেকে সেগুলো অঙ্গে চড়াবে।"

মাথা নিচু করে সংহিতা জানিয়েছিল, "আমার খুব অস্বস্তি হয়।"

"অ্যাঁ? গয়না পরলে মেয়েছেলের যে অস্বস্তি হয় বাবার জন্মে শুনিনি। হোক অস্বস্তি। সবার বউ যা পরে তা ন'খোকার বউকেও পরতে হবে, এই বলে দিলাম।"

অতএব আদেশ মান্য করতে হয়েছিল। স্বামী লোকটি কিন্তু খুব নিরীহ ছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, ওর কোনও বন্ধু নেই। স্কুলের সহপাঠীদের বাড়িতে নিয়ে আসা নিষেধ ছিল। এই বাড়িতে চামেলি নামের এক যুবতীকে ছাদ থেকে কাপড় তুলতে দেখত সে। মেজবউ বলেছিল, "চামেলি এখন ছোটকর্তাকে মানুষ করছে।"

"মানুষ করছে মানে?" অবাক হয়েছিল সংহিতা।

মেজবউ ঠোঁট বেঁকিয়েছিলেন, "তোমার কর্তাকে জিজ্ঞাসা কোরো।"

রাত্রে স্বামীকে প্রশ্নটা করতেই সে দেখল লোকটা যেন অস্বস্তিতে পড়ল, "কে বলেছে তোমাকে?"

"মেজদিদি।"

"অ। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।"

"আমি বুঝতে পারছি না। বাড়িতে মা-বাবা থাকতে কাজের মেয়ে ছোটভাইকে কেন মানুষ করবে? দেখে মনে হল গরিবঘরের মেয়ে, পড়াশুনো করেনি।"

"ঠিকই। কিন্তু শরীর তো অনেকের চেয়ে ঢের ভাল। শুয়ে পড়ো। এসব ভেবো না।"

"আশ্চর্য! এর মধ্যে শরীর আসছে কেন?"

"বেশ, শোনো। এটা এই বাড়ির রেওয়াজ। বারো বছর বয়স হলেই তাকে আলাদা ঘর দেওয়া হয়। একজন যুবতী মেয়ে তার সব কাজ করে দেয়। তাকে অনেক কিছু শেখায়।"

"সে কী!" হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সংহিতা। ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকেও কি ওরকম একজন মানুষ করেছিল?"

"শুধু আমি কেন? আমার দাদাদের সবাইকে ওই শিক্ষা নিতে হয়েছে।"

"ছিঃ।" শব্দটা ছিটকে বেরোল সংহিতার মুখ থেকে।

সেটা শোনার পরে উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়েছিল লোকটা। অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারেনি সংহিতা। বাড়িটাকে নর্দমা বলে মনে হচ্ছিল।

বিয়ের পরে মাত্র দু'বার সে বাপের বাড়িতে গিয়েছিল সাত মাসে। কোনও বারই তিন রাত্রি থাকেনি। শাশুড়ি বলেছিলেন, "যাচ্ছ যাও, কিন্তু তেরাত্রি কাটাবে না। কুটুমবাড়িতে ওর বেশি থাকা উচিত নয়।"

সে চোখ বড় করেছিল, "আমার মা-বাবা আমার কুটুম?"

"গোত্রান্তর হয়ে গেলে তাই হয়।" শাশুড়ি বলেছিলেন।

দ্বিতীয়বারে শ্বশুরবাড়িতে ফেরার সময়ে সংহিতা তার আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিল। প্রথমে সেগুলো নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। ভরদুপুরে যখন উত্তর কলকাতা জুড়ে ভাতঘুম নেমেছে তখন ছবি আঁকা শুরু করেছিল সংহিতা। খড়খড়িওয়ালা জানালা খুলে দিলে প্রচুর ছাদ দেখা যায়। সেখানে তারে তারে কাপড় শুকোচ্ছে। একটা ছাদে মধ্যবয়সি কোনও মহিলা, বোধহয় রোদের জন্যেই মাথায় ঘোমটা টেনে রাস্তা দেখছেন। ওই পটভূমিতে মহিলাকে আঁকতে চেষ্টা করছিল সংহিতা। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে সজোরে হাত নাড়তে লাগলেন তিনি। এত দূর থেকেও তাঁর হাসির বন্যা বইছিল। তারপর ছুটলেন নীচের দিকে। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে তিনি কারও অপেক্ষায় ছিলেন। তার দেখা পেতে উচ্ছ্বসিত হলেন। ওই হাত নেড়ে উচ্ছ্বাস দেখানো ভঙ্গিটাকে ধরতে চাইল সংহিতা। স্কেচ শেষ হলে মন ভাল হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে যখন রঙের কাজ করছে তখন ঘরে ঢোকা কাজের মেয়ে দৃশ্যটা দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছিল। সংহিতা এমন তন্ময় হয়ে ছিল যে, ওর আসাটা বুঝতে পারেনি, কিন্তু তার কিছুক্ষণ বাদে হইহই করে ঘরে ঢুকে পড়ল এ-বাড়ির বউরা। সবাই ছবি দেখতে চায়। দেখে মন্তব্য করা আরম্ভ হয়ে গেল। মেজবউ বলল, "এ তো সেজ। ওইভাবে হাসে।" সেজ বলল, "না না, অনেকটা মায়ের মতো দেখতে।" বড়বউ জিজ্ঞাসা করল, "তুমি ছবি আঁকো বলে শুনেছিলাম, ভালই আঁকো। কোথায় শিখেছ তুমি?"

"আর্ট কলেজে।"

"ওম্মা!" চোখ বড় করেছিল সেজবউ।

বাকিরা তাকিয়েছিল তার দিকে। কিন্তু কিন্তু করে সেজবউ বলেছিল,

"শুনেছি সেখানে নাকি ভাড়া করে আনা মেয়েদের জামাকাপড় খুলিয়ে ছেলেমেয়েদের বলা হয় ছবি আঁকতে।"

"অ্যাঁ!" শব্দটা একসঙ্গে বেরিয়েছিল অনেকের গলা থেকে।

সন্ধেবেলায় ডাক পড়ল সংহিতার শাশুড়ির ঘরে। পালঙ্কে বসে পান চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "ওই ছবিটা দেখেছ?"

"হুঁ।"

"কার আঁকা জানো? রবি বর্মার। ওরকম ছবি কখনও আঁকতে পারবে?"

"বলতে পারছি না।"

"সে কী! বলতে যদি না পারো তা হলে ছবি আঁকছ কেন?"

"উনি ওঁর মতো আঁকতেন।"

"আমি অত মতোটতো জানি না। ঠাকুরদেবতার ছবি আঁকো, আমার কোনও আপত্তি নেই। না আঁকতে পারলে এই বাড়িতে বসে অন্য ছবি আঁকা চলবে না, এই তোমাকে বলে দিলাম। যাও, মাথা গরম করিয়ো না।" শাশুড়ি বালিশ টেনে হেলান দিলেন।

সংহিতা একবার আড়চোখে ছবিটাকে দেখল। ওটা তো ঠাকুরদেবতার ছবি নয়! কিন্তু শাশুড়ির মুখ বলছে তিনি আর কথা বলতে ইচ্ছুক নন। সে বেরিয়ে এল।

রাত্রে স্বামী যখন শোওয়ার জন্যে এল তখন কথাটা বলল সে। চুপচাপ শুনল সে। তারপর বলল, "এক কাজ করো। তোমার যদি ছবি আঁকার খুব ইচ্ছে হয় তা হলে দিনের বেলায় এঁকো না। আমি রাত্রে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করলে যতক্ষণ পারবে এঁকো। রাতের ঘুমটা দুপুরে ঘুমিয়ে নিয়ো। কেউ জানতেই পারবে না।"

পথ বলে দিয়ে শুয়ে পড়েছিল লোকটা। কিন্তু অনেকক্ষণ জেগেছিল সংহিতা। তাকে চোরের মতো ছবি আঁকতে হবে কোনওদিন ভাবেনি সে। তার চেয়ে না আঁকা অনেক বেশি সম্মানের।

প্রতিটি রাত স্ত্রীর পাশে শুয়ে থাকলে কেঁচো আচমকা সাপ হয়ে ছোবল মারতে শিখে যায়। এক রাত্রে তাই হল। দাঁতে দাঁত চেপে সেটা সহ্য করেছিল সংহিতা। কিন্তু পরের মাসেই বুঝতে পারল গোলমাল হয়ে গিয়েছে। মেজগিন্নির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে চাওয়াই কাল হল। তিনি উৎফুল্ল

হয়ে প্রচার করলেন, ন'বউয়ের পিরিয়ড বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কীরকম মিশ্র অনুভূতি হয়েছিল তখন। সে মা হতে যাচ্ছে, তার সন্তান পৃথিবীতে আসছে ভেবে অন্যরকম উত্তেজনা হচ্ছিল। আবার সেই রাতে সে যে-কষ্ট পেয়েছিল, তাতে যে আসছে সে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আসছে, তাও তো সত্যি!

ক'দিন পরে শাশুড়ির ঘরে ডাক পড়ল। তিনি বললেন, "কাল সকালে কোনও খাবার দূরের কথা, চা-ও খাবে না। ভোর ভোর স্নান করে নেবে। লাল পাড় সাদা শাড়ি আছে?"

"না।"

"ওই টেবিলের ওপর নতুন শাড়ি রাখা আছে। নিয়ে যাও। ওটাই পরবে।"

"কাল কী হবে?"

"বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন ভট্টাচার্য মশাই কাল সকালে আসবেন। তাঁর সামনে তোমাকে বসতে হবে। ওঁকে আমি আমার বিয়ের পর এ-বাড়িতে দেখেছি। যা বলেন তার অন্যথা কখনও হয় না। যাও।"

মেজবউকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের কথা। সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ছুঁইয়ে মেজবউ বলেছিলেন, "খুব বড় সাধক গো। ঠিকুজি দেখে যখন মুখ খোলেন তখন সরস্বতী এসে ওঁর জিভে বসেন। প্রথমবার যখন আমি চ্যাঙারি ধরলাম," বলে খিকখিক করে হাসলেন মেজবউ, "মানে বুঝলে না? পেটে বাচ্চা এল গো! তখন শাশুড়িমা ওঁকে খবর দিলেন। তিনি ঠিকুজি পরীক্ষা করে বললেন, বাচ্চা যখন পৃথিবীতে আসবে তখন খুব সমস্যা হবে। বাড়িতে না রেখে হাসপাতালে দিয়ো। নইলে বাঁচাতে পারবে না। তাই শুনে শাশুড়ি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী আসবে? ছেলে না মেয়ে? কষ্ট দিয়ে আসছে যে পরে সে সুখে রাখবে। ছেলে আসছে। তাই হল। কী ব্যথা, কী কষ্ট! নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হল আমাকে। সেখানকার ডাক্তার তো এই মারে কি সেই মারে। এতদিন ডাক্তার না দেখিয়ে বাড়িতে ফেলে রেখেছিলেন কেন? ইঞ্জেকশন দিয়ে পেট কেটে বাচ্চা বের করল। খুব ভুগেছিলাম তখন।"

সংহিতা জিজ্ঞাসা করেছিল, "ছেলেই হয়েছিল?"

"হবে না?" চোখ ঘুরিয়েছিলেন মেজবউ, "বললাম না, ওঁর কথা মিথ্যে

হয় না। তারপর আরও দুটো এল। আগে থেকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে পেট কেটে বের করা হল। তবে ডাক্তার বলে দিয়েছে আবার পেট কাটা যাবে না। দরকারই বা কী!"

পরের সকালে স্নান সেরে, লালপাড় সাদা শাড়ি পরে ঠাকুরঘরে যেতে হল সংহিতাকে। সেখানে একজন বেশ বৃদ্ধ মানুষ লাল কাপড় এবং লাল উড়নি গায়ে জড়িয়ে আয়োজনের তদারকি করছিলেন। শাশুড়িও স্নান করে গরদ পরে আসনের ওপর বসে আছেন। তাকে দেখে বললেন, "এসো। এই হল ন'বউমা।"

বৃদ্ধ মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। সংহিতা নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেলে আপত্তি জানালেন বৃদ্ধ, "না মা। এই ঘরে বিগ্রহ আছেন। তাঁর সামনে কোনও মানুষকে প্রণাম করলে তাঁকে অপমান করা হয়। আয়ুষ্মতী হও। বসো।"

বৃদ্ধের কথাগুলো খুব ভাল লাগল সংহিতার। সে একটি আসনে বসল। হাত দুটো কোলের ওপর রাখল। বৃদ্ধ এবার পুজো শুরু করলেন। স্পষ্ট উচ্চারণে ওঁর মতো সংস্কৃত মন্ত্র বলতে এর আগে কাউকে শোনেনি সংহিতা। শাশুড়ি হাতজোড় করে আছেন বন্ধ চোখে। পুজো শেষ হলে ওদের দু'জনকে দিয়ে অঞ্জলি দেওয়ালেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "আর সব কোথায়?"

শাশুড়ি বললেন, "আজ ওদের এখানে আসতে নিষেধ করেছি।"

"অ।" বৃদ্ধ বললেন।

"এবার আপনি বিচার করে বলুন।" সংহিতার ঠিকুজি এগিয়ে দিলেন শাশুড়ি। সংহিতার মনে পড়ল, এই ঠিকুজি বিয়ের আগে এ-বাড়ির চাহিদা মেটাতে দেওয়া হয়েছিল।

শাশুড়ি বললেন, "ন'বউমার বাড়ি থেকে বিয়ের আগে পাঠিয়েছিল। আপনি তখন যোশীমঠে ছিলেন। আমি বরদাবাবুকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছিলাম।"

ততক্ষণে ঠিকুজি দেখতে শুরু করেছেন বৃদ্ধ। বললেন, "বরদা তোমাকে ঠিক কী বলেছিল বলো তো?"

"প্রশংসাই করেছিল।"

"এই ঠিকুজিতে কিছু ত্রুটি আছে।" গম্ভীর মুখে বললেন বৃদ্ধ।

"সে কী!" চমকে উঠলেন শাশুড়ি, "বরদাবাবু তো কিছু বলেননি!"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। ঠিকুজি একপাশে সরিয়ে রেখে সংহিতার কপালের দিকে তাকালেন।

"কত বয়স?"

সংহিতা মুখ খোলার আগেই শাশুড়ি বলে দিলেন।

বৃদ্ধ বললেন, "মানুষের জীবন হল পদ্মপাতায় জল। সবসময় টলমল করে। কারও বেশি কারও কম। তুমি প্রথম দলে। তা যতই ঝড় আসুক নিজের ওপর আস্থা হারিয়ো না। আর কখনওই স্বধর্মচ্যুত হয়ো না। এই জেদ যদি রাখতে পার তা হলে তুমি জয়ী হবে।"

কথাগুলো ওই বয়সে স্পষ্ট বুঝতে পারেনি সংহিতা। তবে মনে হয়েছিল তার খুব বিপদ হবে। কিন্তু ঠিকুজি বা কপাল দেখে একটা মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করলে তা সত্যি হয়ে যাবে?

শাশুড়ি বললেন, "এই বাড়ির বউ কখনওই বিপদে পড়ে না ঠাকুরমশাই। এখন বলুন ওর শরীর থেকে যে আসবে সে ছেলে না মেয়ে?"

হাসলেন বৃদ্ধ, "তুমি কী চাইছ?"

"অবশ্যই ছেলে।"

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ, "না। তোমাদের সংসারে মা লক্ষ্মী আসছেন।"

"অসম্ভব।" তীব্র প্রতিবাদ করলেন শাশুড়ি, "অনেক লক্ষ্মী এসেছে। আমার আর মেয়ে চাই না।"

"বিধাতার ইচ্ছে তুমি খণ্ডাবে কী করে!"

"আপনি নিশ্চিত ওর মেয়ে হবে?"

নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন বৃদ্ধ।

শাশুড়ি সংহিতার দিকে তাকালেন, "যাও। এখন তুমি চা খেতে পারো।"

ঠিক এক মাস পরে এল সংহিতার জীবনের অন্যতম কালো দিন। সকালে শাশুড়ি তাকে বললেন, "এসেছে যখন তখন তাকে হেলাফেলা করে রাখতে পারি না। তৈরি হয়ে নাও। ডাক্তারের কাছে যাব।"

"কেন?"

"আশ্চর্য! এই সময়ে ডাক্তারকে দেখানো এখন রেওয়াজ হয়েছে। আমাদের সময়ে এসব ছিল না। যা হওয়ার বাড়ির আঁতুরঘরেই হত। চলো।"

বাড়ির গাড়িতে চেপে শাশুড়ির সঙ্গে নার্সিংহোমে গিয়েছিল সংহিতা। গিয়ে দেখেছিল ডাক্তার একজন মহিলা। দেখে স্বস্তি পেয়েছিল সে। ভদ্রমহিলা তাকে পরীক্ষা করে নার্সকে বললেন ভেতরে নিয়ে গিয়ে ইঞ্জেকশন দিতে।

তাকে একটা উঁচু বেডে শুইয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই তার ঘুম এসে গেল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন একটা সাদা ঘরে সে একা শুয়ে আছে। শাশুড়ি বা ডাক্তার ধারে কাছে নেই। সে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু পরদা সরিয়ে একজন আয়াগোছের মহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, "না না। শুয়ে থাকুন। অন্তত আরও এক ঘণ্টা।"

"কেন? কী হয়েছে আমার?"

"কিছুই টের পাচ্ছেন না?"

চোখ বন্ধ করে ভাবতেই তলপেটে চিনচিনে অনুভূতি টের পেল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে বলুন তো?"

"আপনি কী জন্যে এসেছিলেন জানেন না?"

সংহিতাকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে আয়া হাসল, "দেখে মনে হচ্ছে বেশি দিন বিয়ে হয়নি। এর মধ্যে অনেকগুলো বাচ্চা হয়ে গেছে?"

দ্রুত মাথা নেড়েছিল সংহিতা, "আমার ওসব এখনও হয়নি।"

চোখ কপালে তুলেছিল আয়া, "সে কী! হায় কপাল!" তারপর ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। কিন্তু ফিরে এসেছিল আরও দু'জন মহিলাকে নিয়ে। তারা এসে কয়েকটা প্রশ্ন করার পর আয়া বলল, "এরকম শাশুড়ি কখনও দেখিনি বাপু। জেনেশুনে বউয়ের সর্বনাশ করে গেল!"

দ্বিতীয়জন মহিলা হেঁয়ালি সরিয়ে রেখে জানাল, "তোমার পেট থেকে শত্রুটাকে বের করে দিয়েছে গো। শত্রুই বলব। ওর জন্যেই তো তোমার এই হেনস্তা!"

আচমকা ঠান্ডা হয়ে গেল শরীর। চোখের কোণে জল জমল।

তৃতীয়জন বলল, "তোমার বর জানে না? বাচ্চা হয়নি এখনও, পেটে যেটা এল প্রথমবার তাকে উপড়ে ফেলা হচ্ছে আর সেটা তো তার অজানা থাকতে পারে না!"

সংহিতা ধীরে ধীরে উঠে বসল। আয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোথায় যাবে? বাথরুমে?"

"না। আমি ঠিক আছি।"

দ্বিতীয়জন বলল, "দু'মাস যখন হয়নি তখন ঠিক হয়ে যাওয়াই তো উচিত।"

সংহিতা উঠে দাঁড়াল। শরীরে একটু ঝিমঝিম ভাব।

আয়া বলল, "সন্ধের পরে তোমার শাশুড়ি এসে নিয়ে যাবে।"

শেষপর্যন্ত কেঁদে ফেলেছিল সংহিতা, "আপনারা আমার একটা উপকার করবেন?"

দ্বিতীয়জন জিজ্ঞাসা করেছিল, "কী করতে হবে?"

"একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন, প্লিজ!"

"কোথায় যাবে?"

"আমার বাবা-মায়ের কাছে।"

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। আয়া বলেছিল, "ঘর থেকে চলে গেলে সব দায় তো আমার ওপর চাপবে। হাজারটা কৈফিয়ত দিতে হবে। শাশুড়ি সন্ধেবেলায় এসে ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছ?"

প্রথমজন বলল, "ও চলে যাওয়ার পর চিৎকার করবি, বাথরুমে গিয়েছিলি ফিরে এসে দেখছিস নেই। তোর কোনও দোষ কেউ দেবে না।"

"কিন্তু ট্যাক্সি ডাকতে গেলে তো সবাই দেখবে। দারোয়ানটা চুকলি কাটবে।" দ্বিতীয়জন বলল, "তুমি যদি সত্যি যেতে চাও তা হলে এক কাজ করো। এই ঘর থেকে বেরিয়ে ডান দিকের সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যাও। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে একটু হাঁটলেই গলির দরজা পাবে। সেই গলি ধরে এগোলেই বড় রাস্তায় পড়বে।"

প্রথমজন বলেছিল, "কিন্তু আর একবার ভেবে দেখো, তুমি এভাবে চলে গেলে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে।"

তৃতীয়জন বলল, "রাখো তো! যা করল তার পরেও সম্পর্ক ভাল আছে নাকি!"

হাঁটতে একটু আড়ষ্ট ভাব প্রথম দিকটায়, একতলায় নামতে নামতে সেটা চলে গেল। রান্নাঘরের দরজা তখন বন্ধ, লোকজন যারা ছিল তারা নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সে যখন গলিতে পা দিচ্ছে তখন আয়ার গলা শুনতে পেল। চিৎকার করে বলছে, "এ কী! পেশেন্ট কোথায়? আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম, এর মধ্যে পেশেন্ট কোথায় গেল!"

দ্রুত হাঁটতে লাগল সংহিতা। বড় রাস্তায় পড়ে কিছুটা যেতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। দরজা খুলে বাপের বাড়ির পাড়ার কথা বলতেই সর্দারজি মাথা নেড়ে ট্যাক্সি চালু করল। পিছনের সিটে মাথা হেলিয়ে বসে রইল সংহিতা। তার হাতে শাঁখা লোহা ছাড়া শরীরে কোনও গয়না নেই। নার্সিংহোমে আসবার সময় শাশুড়ি বলেছিলেন, খুলে রাখতে। তাই নাকি রাখতে হয়।

বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামিয়েই মনে পড়ল তার সঙ্গে একটাও টাকা নেই। সে ট্যাক্সি থেকে নেমে বাড়ির দরজায় বেল বাজাল। একটু বাদে বাবা দরজা খুলতেই গম্ভীর গলায় বলল, "আমি ওই ট্যাক্সিতে এসেছি, তুমি ভাড়াটা দিয়ে দাও তো!"

বাবা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। ততক্ষণে সে সোজা চলে গেছে নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকেই তার মনে হল, সে এত আপসেট হচ্ছে কেন? শাশুড়ি তো তার উপকারই করেছেন। তাকে যন্ত্রণা দিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক করে কনসিভ করিয়েছিল লোকটা। ওই অনিচ্ছার ফসল শরীর থেকে বের করে দিয়ে তাকে হালকা করে দিয়েছে ওরা।

ওই সময় মা এসে দাঁড়াল। আপাদমস্তক তাকে দেখে বলল, "কখন খেয়েছিস?"

"ভুলে গেছি।"

"কাপড় বের করে দিচ্ছি। বাথরুম থেকে ঘুরে আয়।" মা চলে গেল।

কোনও প্রশ্ন নয়, উদ্বেগে ভেঙে পড়া নয়, মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল সংহিতা।

ফোনটা বাজছিল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না, তবু উঠতে হল।

হ্যালো বলতেই মিলার গলা, "শোনো, আমি আজ ফিরছি না।"

"যা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু গলার স্বর এরকম কেন?"

"কীরকম? ধ্যুৎ। আচ্ছা, তুমি আমাকে একবারও বললে না যে, অনীশ সোম এই পৃথিবীতে নেই। তুমি জানতে না?"

"আমি গতকালই জেনেছি। তোমাকে দেখার আনন্দে ওটা ভুলে গেছি।"

"আনন্দ? আচ্ছা, ডু ইউ বিলিভ যে, মৃত্যুর পরে মানুষ আনন্দিত অথবা দুঃখিত হয়? কী? বিশ্বাস করো?"

অস্বস্তিটা শুরু হয়ে গেল। সেটা কাটাতে বলল, "আমি কী করে জানব,

মারা গেলে জানতাম, তবে ফিরে এসে জানাতে পারতাম না।”

“কেন?”

“বাঃ, আমার শরীর পুড়িয়ে ফেলা হত না?”

“কিন্তু আমি লোকটাকে ফিল করছি। কতবার বলেছে, চলো আমার সঙ্গে, সিমলা যাচ্ছি, ব্যাঙ্কক যাচ্ছি। যেতে যে ইচ্ছে করত না তা নয় কিন্তু—! আসলে ওকে শিল্পী এবং বন্ধু হিসেবে খুব পছন্দ করতাম, আমার চেয়ে অনেক বড় বয়সে, সেটা কেয়ার করতাম না কিন্তু ওকে দেখে আমার শরীর রি-অ্যাক্ট করত না। কী করব। বেচারা! বুঝলে আজ হোটেলে ফিরে এসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাত্র এক ঘণ্টা। ঘুম ভাঙলে মনে পড়ল অনীশ সোমের কথা। ফোন করলাম। ওর বাড়ির কেউ বলল অনীশ নেই। কবে মরে গেছে জিজ্ঞাসা করিনি কিন্তু ফোন না করা পর্যন্ত তো ও আমার কাছে জীবিত ছিল। তাই না?” মিলা বলল।

“তুমি ড্রিঙ্ক করেছ?” সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

“এখনও করছি। আসলে সেলিব্রেট করছি।”

“সেলিব্রেট?” চেঁচিয়ে উঠল সংহিতা।

“ইয়েস। আমার শোক, আমার কষ্ট, আমার দুঃখকে সেলিব্রেট করে তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে আবার তাজা হয়ে যেতে চাই। বাই!”

মিলা ফোন রেখে দিল। সংহিতার মনে হল মিলারা এভাবেই ভাল থাকে!

রাত্রে খেতে ইচ্ছে করছিল না। দুপুরে যা দিয়ে গিয়েছিল তার অর্ধেকই ফ্রিজে পড়ে আছে। ওভেনে গরম করে নেওয়া যায়। কিন্তু সিক্তার নিয়ে আসা দুধে চিনি মিশিয়ে এক গ্লাস খেয়ে মনে হল এতেই হয়ে যাবে। অনেকদিন পরে ঠান্ডা দুধ খেয়ে মন্দ লাগল না।

অন্য দিনের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি শুতে যাচ্ছিল সংহিতা। টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই বয়স্কা গলা কানে এল, “মেমসাহেব বলছেন? আমাকে আপনি চিনবেন না। ওই যে রিক্তা বলে, যে-মেয়েটা আপনার কাছে কাজ করে সে আমাকে মাসি বলে ডাকে।”

“আপনার কথা ওর কাছে শুনেছি।”

“হ্যাঁ, হয়েছে কী, তাকে পুলিশ থানায় আটকে রেখেছে।”

“সে কী? কেন?” চমকে উঠল সংহিতা।

"লোকটার সঙ্গে এতদিন ছিল, মায়া পড়ে গিয়েছিল বলে দেখতে এসেছিল সে। যেহেতু ওর সঙ্গে এতদিন ছিল তাই পুলিশ ভাবছে রিক্তার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে। কিন্তু রিক্তাকে যে লোকটা কিছুই বলেনি, আঁধারে রেখেছিল, তা পুলিশ বিশ্বাস করতে চাইছে না। আমিও বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। সবাই বলছে পেট থেকে কিছু বের করতে পারলেও জেলে পুরবে, না পারলে আদালতে তুলে আরও জেরা করার অনুমতি নেবে। আহা রে! আমি ফোন করে খবরটা না জানালে ওর এত বড় বিপদ হত না।"

"কোথায় রেখেছে তাকে?"

"এই তো ঝাড়গ্রাম থানায়।" মাসি বলল, "তুমি ওকে রক্ষা করতে পারো না মেমসাহেব?"

"দেখছি।" লাইন কেটে দিল সংহিতা।

মেয়েটার কপালে এসব ছিল? আর ঘুম এল না। এখন রাত ন'টা। কলকাতায় কোনও রাতই নয়। ঝাড়গ্রামে? কী করা যায়? উকিলের সঙ্গে কথা বলবে? ওকে ছাড়ানোর জন্যে উকিলকে বলবে আদালতে যেতে? তার মনে হল সিক্তা মেয়েটা সত্যিই ভাল, কোনওদিন তাকে অসুবিধায় ফেলেনি। কী করা যায়?

হিমাদ্রি সেনগুপ্তের কথা মনে এল। প্রবীণ শিল্পী। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীরাও ওঁকে খুব সম্মান করেন। ফোন করতেই হিমাদ্রি সেনগুপ্ত রিসিভার তুললেন, "কে?"

"আমি সংহিতা।"

"ও! কী খবর! তোমার কাছে কার্ড যাবে অনীশের স্মরণসভার।"

"না দাদা, আমি অন্য ব্যাপারে ফোন করছি।"

"বলো।"

"আমার কাছে যে-মেয়েটি কাজ করে সে খুব ভাল। যার সঙ্গে সে ঝাড়গ্রামে থাকত তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে চলে এসেছিল। সেই লোকটি পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে শুনে দেখতে গিয়েছিল। পুলিশ তাকে ধরে রেখেছে, ভাবছে ও লোকটার সব খবর জানত। অথচ ও নিতান্তই ইনোসেন্ট। কী করা যায়?"

"ঝাড়গ্রাম খুবই সেন্সসিটিভ এলাকা! তুমি এক কাজ করো, ওহো,

তোমার শেষ এগজিবিশনে আমি রমেশ চাকলাদারকে দেখেছিলাম। সে এখন আইজি। তুমি ওঁকে ব্যাপারটা খুলে বলো।"

"কোন ভদ্রলোক বলুন তো?"

"লম্বা, গোঁফ আছে, ষাটের কাছেই বয়স হবে। খুঁজে দেখো কার্ড পাও কিনা। না হলে কাল সকালে আমি ওকে ফোন করব। রাখছি।"

প্রতিটি এগজিবিশনে এসে অনেকেই তাকে কার্ড দিয়ে থাকেন। ক্রেতারা তো বটেই, তা ছাড়াও অনেকে পরিচয় রাখতে দিয়ে থাকেন।

যে-ড্রয়ারে কার্ডগুলো রাখা হয় সেটা খুলে দেখতে লাগল সংহিতা। শেষপর্যন্ত সে রমেশ চাকলাদারের কার্ড দেখতে পেল। ঘড়িতে এখন ন'টা কুড়ি। এই সময় প্রায় অপরিচিত কোনও মহিলা ফোন করলে ভদ্রলোক কীভাবে নেবেন! তবু, সিক্তার কথা ভেবে ফোন না করে পারল না সংহিতা।

ফোন বাজছে। তারপরই ভারী গলা, "স্পিকিং।"

"আমি কি মিস্টার চাকলাদারের সঙ্গে কথা বলছি?"

"হ্যাঁ। আমি রমেশ চাকলাদার।"

"নমস্কার। এই সময়ে বাধ্য হয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি। আমি ছবি আঁকি। আমার এগজিবিশনে আপনি এসেছিলেন। আমি সংহিতা রায়।"

"হোয়াট এ সারপ্রাইজ। বলুন, কী করতে পারি?"

সংহিতা যতটা সংক্ষেপে সম্ভব সিক্তার ব্যাপারটা ভদ্রলোককে জানাল। সব শুনে মিস্টার চাকলাদার বললেন, "আমি খোঁজ নিচ্ছি। কিন্তু আপনি কি দায়িত্ব নিয়ে বলছেন মেয়েটি সম্পূর্ণ নির্দোষ?"

"হ্যাঁ। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।"

"আপনি কতক্ষণ জেগে আছেন?"

"আছি।"

"আপনাকে আধঘণ্টার মধ্যে আমি ফোন করছি।"

পুলিশের ওপরতলায় অফিসাররা এখন অনেক বদলে গিয়েছেন বলে শুনেছিল সে। এখন তাঁরা অনেক বেশি সামাজিক মানুষ হয়েছেন। কিন্তু মিস্টার চাকলাদার যে এমন সুন্দর ব্যবহার করবেন তা আশা করেনি সে।

পঁচিশ মিনিট পরে ভদ্রলোকের ফোন এল, "পুলিশ শুধু সন্দেহের বশে মেয়েটিকে আটক করেছে। অ্যারেস্ট করেনি। ও যে বহু দিন কলকাতায়

ছিল এইটে ওর পক্ষে যাচ্ছে। যা হোক, ওকে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম থেকে আসতে যতক্ষণ লাগে। আপনি ঝাড়গ্রামের এসপি-কে একটা চিঠি লিখে রাখুন। তাতে বলুন মেয়েটি নির্দোষ। যদি কখনও তদন্তের প্রয়োজনে মেয়েটিকে দরকার হয় আপনি ওকে পৌঁছে দেবেন। যে-পুলিশ অফিসার ওকে নিয়ে আপনার বাড়িতে যাচ্ছে তার হাতেই চিঠিটা দিয়ে দেবেন। সমস্ত ব্যাপারটা একটা রুটিন চেক-আপ। আচ্ছা, নমস্কার।"

রমেশ চাকলাদার ফোন রেখে দিলেন।

কৃতজ্ঞ মনে চিঠিটা লিখল সংহিতা। খামে বন্ধ করে ওপরে এসপি-র ঠিকানা লিখে ভাবল সিক্তা নিশ্চয়ই তাকে বিপদে ফেলবে না। সে যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তা হলে এই কাজটা করাতে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু সত্যি না হলে? নাঃ। বিশ্বাস হারাবে না সে।

রাত আড়াইটের সময় গেট থেকে গার্ড ফোন করে জানাল পুলিশের গাড়ি এসেছে। তাদের আসতে বলে তৈরি হল সে। একটু পরেই বেল বাজল। একজন ইউনিফর্ম পরা অফিসার বললেন, "ওকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম।"

"অনেক ধন্যবাদ। আপনি এই চিঠিটা এসপি-কে দিলে খুশি হব।"

খাম নিয়ে ভদ্রলোক চলে যেতে দরজা বন্ধ করল সংহিতা। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে উপুড় হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল সিক্তা। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সংহিতা বলল, "ফ্রিজে খাবার আছে। খিদে থাকলে খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

ঘুমের ওষুধ খেতে হল আজ। সিক্তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তার কারণেই সংহিতা এত রাত পর্যন্ত জেগে আছে এবং আর যেন ঘুমের ব্যাঘাত না হয় তাই নিঃসাড়ে রয়েছে। মেয়েটাকে ফিরিয়ে আনতে পেরে বেশ ভাল লাগছিল সংহিতার। এই উদ্যোগ না নিলে এবং মিস্টার চাকলাদার সাহায্য না করলে কত বছর ওকে জেলের ভেতরে থাকতে হত কে জানে! খবরের কাগজে এমন ঘটনা কয়েকবার পড়েছে সে। পাশ ফিরে শুল সংহিতা। সমস্ত শরীর জুড়ে এখন ঘুমঘুম ভাব।

আকাশে নীল আলো। সে একা দাঁড়িয়ে এক জঙ্গলের সামনে। গভীর জঙ্গল কালচে হয়ে রয়েছে। হঠাৎ ফিসফিসানি কানে এল, "এই জঙ্গল হল নরকে যাওয়ার দরজা।" সে মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল। কেউ নেই। সেই

মিছিল উধাও। আবার ফিসফিসানি শুনতে পেল সে, "এই দরজা দিয়ে নেমে গেলে প্রথমে একটা পুণ্য চরাচর দেখতে পাবে। নরকের ঊর্ধ্বভাগ ওখান থেকেই শুরু। প্রথমেই অপেক্ষা করার জায়গা। অথবা মৃত শিশু বা বালকদের অবস্থানক্ষেত্র। তার নীচে সেইসব ব্যক্তি যারা পৃথিবীতে অবস্থানকালে সংযম হারিয়েছিল। তারা হয় কামুক কিংবা লোভী অথবা ক্রোধে অন্ধ হয়েছিল। এর পরের স্তরে সেইসব আত্মার জায়গা হয় যারা ধর্মে অবিশ্বাসী ছিল। তারা অত্যাচার এবং ধ্বংসে মাতাল হয়ে থাকত। এর পরে দীর্ঘক্ষেত্র ধরে জলপ্রপাত, যা দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে অনন্তকাল। সেটা পার হলেই নরকের নিম্নদেশে পৌঁছে যাবে। ওই নিম্নদেশে কাদের জায়গা হয়?

এটি দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি জটিল অন্যটি অপেক্ষাকৃত সরল। প্রথমটিতে নারীপাচারকারী অথবা ভোগী পুরুষের দালাল, ধর্ষণকারী, চাটুকার, ধর্মকে যে অসৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগায়, খারাপ আত্মাদের সঙ্গে যারা যোগাযোগ থাকার কথা বলে, চোর বদমাশদের অনন্তকাল শাস্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে। দ্বিতীয় ধাপে যাবতীয় জঘন্য অপরাধীদের পাঠানো হয় চূড়ান্ত শাস্তির জন্যে। মনে রেখো এই জঙ্গলের দরজা দিয়ে নরকে পা দেওয়ামাত্র তুমি শয়তানের অধীন হয়ে যাবে। কারণ পৃথিবীর ওই পাপীদের একমাত্র শয়তানই শাসন করতে পারে। আর এও জেনে রেখো শয়তানের একমাত্র প্রভু হলেন পরমাবতার।"

কথাগুলে শেষ হওয়ামাত্র সে অবাক হয়ে দেখল তাকে হাঁটতে হচ্ছে। এখন মিছিলটা ছোট হয়ে গেছে। মাথা ঝুঁকিয়ে ধীরে ধীরে চলছিল সে।

ছবি আঁকছিল সংহিতা। এখন ঘড়িতে এগারোটা। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সিক্তা যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে। চা দিয়েছে ঠিক সময়ে, ব্রেকফাস্টও। একটু আগে বাজারের টাকা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওকে কোনও প্রশ্ন করতে চায়নি সংহিতা। বোঝাই যাচ্ছে গত দিনে হাজারটা প্রশ্ন করেছে পুলিশ, নাজেহাল হয়েছে বেচারি।

ছবিটা যখন অনেকটাই এগিয়েছে তখন খেয়াল হল সংহিতার। রোজ রাত্রে ঘুমের মধ্যে সে ওইসব দৃশ্য দেখছে কেন? সে মারা যায়নি, দিব্যি বেঁচে ছবি আঁকছে তা হলে মৃত্যুর পরে যে-যাত্রা, তার শরিক হচ্ছে কেন? কোনও মনস্তাত্ত্বিকের কাছে গেলে তিনি কি এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন?

কার কাছে যাওয়া যায়? এই মুহূর্তে কোনও মনস্তাত্ত্বিকের নাম মনে পড়ল না। হঠাৎ হাসি পেল তার। সেদিন বাবা তাকে মনস্তাত্ত্বিকের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তিন তিনটে মাস সে বাইরে বেরোনো দূরের কথা ঘরের বাইরে পা দেয়নি। একটা বিছানা, অ্যাটাচ্‌ড বাথ, কিছু পাঠযোগ্য বই আর দু'বেলা খাবার পেলে পৃথিবীর কোথাও যাওয়ার দরকার হয় না। সমস্ত কিছু শোনার পর মা বলেছিলেন, "এই ব্যাপারটাকে তুমি দু'রকম চোখে দেখতে পারো। অনেকেরই প্রথম সন্তান অকালেই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। সন্তান ধারণের ক্ষমতা থাকলেও ধরে রাখার ক্ষমতা তাদের থাকে না। ডাক্তাররা অনেক চিকিৎসা করে, তাকে নিয়মের মধ্যে রেখে শেষপর্যন্ত মা করতে পারেন। ধরে নাও, তোমার ক্ষেত্রে প্রথমবার তাই হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপারটায় তুমি যখন এত অপমানিত বোধ করছ তখন স্থির করে নাও কখনওই মা হবে না। ওই বাড়িতে যেমন ছিলে তেমন থাকবে কিন্তু তোমার স্বামীকে কখনওই প্রশ্রয় দেবে না। এখন ভেবে দেখো—।"

"ভাবার আর কিছু নেই।" সংহিতা জবাব দিয়েছিল।

"উত্তরটা কিন্তু স্পষ্ট হল না।" মা বললেন।

"আমি ওদের সহ্য করতে পারছি না। কাউকেও না।"

"তোমার স্বামী কি ব্যাপারটা জানত?"

"যে-লোক আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিজের লালসা মিটিয়ে চোরের মতো থেকে গিয়েছিল সে যে হাবা কালা বোবা তা ভাবতে পারছি না।" সংহিতা ফোঁস করে উঠেছিল।

মা আর কথা বাড়াননি। বাবা দু'বেলা আসতেন ঘরে। বলতেন, "তুই যে এত নির্বোধ তা আমি কখনও জানতাম না।"

"মানে?"

"এই ঘরে বই নিয়ে পড়ে আছিস! কেন? তোর তো কাজ করা উচিত। ছবি আঁক। এই তো সময় ছবি আঁকার!" বাবা বলেছিলেন।

"এই তো সময় কেন?"

"যন্ত্রণা না থাকলে সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি আনন্দ এনে দেয়। তুই অপমানিত হয়েছিস, সেই অপমানের প্রতিশোধ হবে ছবি আঁকা।"

"আমার ইচ্ছে করে না।"

"ওই জন্যে তোকে নির্বোধ বললাম। যে-মানুষের মনে জেদ নেই তার কিছুই নেই।" বাবা উঠে গিয়েছিলেন।

তখনই মনে পড়েছিল সেই বৃদ্ধের কথা, "যতই ঝড় আসুক নিজের ওপর আস্থা হারিয়ো না। এই জেদ যদি রাখতে পারো তা হলে তুমি জয়ী হবে।"

ঘর থেকে বের হল সংহিতা। বিয়ের আগে বাবা তার ছবি আঁকার জন্যে একটা ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিন কী আঁকব আঁকব করে চলে গেল। কয়েকদিন হিজিবিজি অনেক কিছু।

এক সকালে বাবা এসে বললেন, "তোকে বলা হয়নি। তুই যেদিন নার্সিংহোম থেকে চলে এলি সেদিন আমি থানায় গিয়ে সব কথা জানিয়ে ডায়েরি করেছিলাম। থানা থেকে নার্সিংহোমে তদন্ত করতে গিয়েছিল। তুই অ্যাডাল্ট হওয়া সত্ত্বেও তোর দেওয়া কনসেন্ট লেটার নেই, আগে কোনও ইস্যুও ছিল না, ডাক্তার স্বীকার করেছে তোর শাশুড়ির পীড়াপীড়িতে ওটা করা হয়েছে। এই অবস্থায় পুলিশ তোর শাশুড়ি এবং ডাক্তারকে অ্যারেস্ট করে মামলা শুরু করতে পারত। কিন্তু তোর শাশুড়ি টেলিফোনে অনেক রিকোয়েস্ট করলেন, প্র্যাক্টিক্যালি ক্ষমাই চাইলেন। এখন বল, তুই কি ডিভোর্স চাস?"

"অবশ্যই।"

"ক্ষতিপূরণ চাইবি?"

"এই ক্ষতি কীভাবে পূর্ণ করবে ওরা? টাকা দিয়ে করা যায়?"

"ঠিক বলেছিস। তা হলে আমি উকিলের সঙ্গে কথা বলি?" বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

"বলো।"

উকিল বলেছিলেন, "ডিভোর্সের সঠিক কারণ আদালতকে বললে ওদের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল কেস শুরু হয়ে যাবে। আপনারা যখন তা চাইছেন না তখন মিউচুয়াল ডিভোর্সে যান। অপনেন্ট পার্টি এক কথায় রাজি হয়ে যাবে।"

তাই হল। কিন্তু তার কয়েকদিন বাদে বাবা বললেন, "ছেলেটি ফোন করেছিল।"

"কোন ছেলে?" সংহিতা তাকাল।

"যার সঙ্গে তোর বিয়ে হয়েছিল।"

"সে কী? হঠাৎ?"

"বলল, আমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে এসে কথা বলতে চায়।"

"নিশ্চয়ই মায়ের আদেশে ফোন করেছিল।"

"মনে হল না। বলল, আমার নিজের মনে হচ্ছে কথা বলা দরকার।"

"তুমি কী বললে?"

"বললাম, ডিভোর্সের মামলা যখন ফাইল হয়েছে তখন আর কথা বলে কী হবে!"

মা ঘরে ঢুকছিলেন, বললেন, "কী বলতে চায় শোনা উচিত ছিল!"

বাবা বললেন, "কী আর বলবে! মায়ের বিরুদ্ধে তো যেতে পারবে না।"

সংহিতা বিরক্ত হল, "তোমরা কী বলো তো! যদি সে মায়ের বিরুদ্ধেও যায় আমি কি তাকে মেনে নিতে পারব?"

"সেটা কথা না বলে কী করে বুঝবি। ওর মা যে এমন কাণ্ড করছে তা হয়তো সে জানতই না।" মা বললেন।

"হ্যাঁ। কচি খোকা!" সংহিতা নিচু গলায় বলল, "সেই রাত্রে সে যখন আমাকে রেপ করেছিল তখন মনে ছিল না! সেটা না করলে এসব ঘটনা ঘটতই না!"

শেষপর্যন্ত ডিভোর্স হয়ে গেল। আদালতে শাশুড়ি আসেননি কিন্তু ওদের উকিলের সঙ্গে শাশুড়ির ছেলে এসেছিল। রায় বেরুবার আগেও দু'বার আদালতে যেতে হয়েছিল সংহিতাকে, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনি। রায় বের হওয়ার পরে ছেলেটা সটান চলে এল তার সামনে, "আমি কিছুই জানতাম না। এদেশে এখনও কন্যাসন্তানকে মেরে ফেলার কথা ভাবা হয় এবং মেয়েরাই সেটা করে তা ভাবতে পারিনি। একটা কথাই শুধু বলছি, এর প্রতিবাদে আমি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। চলি।"

বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল সংহিতা। মানুষটাকে এতটা কাল মেরুদণ্ডহীন বলে মনে হত তার, সে কী করে এত বদলে গেল?

তখন থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করল সংহিতা। একদিন ছবিটা এঁকে ফেলল। মাতৃগর্ভে শিশু আর দৈত্যের বদলে একটি ভয়ংকর চেহারার স্ত্রীলোকের পা সেই শিশুকে লাথি মারছে।

যেদিন ছবিটা আঁকা শেষ হল সেদিনকার কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছিল। উলটোডাঙার কাছে রেললাইনে এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে।

সম্ভবত ট্রেনে ধাক্কা খেয়ে মারা গিয়েছে যুবকটি। এরকম খবর প্রায়ই কাগজে বের হয়। নাম না জানা সেই যুবকটির মুখ দেখতে খুব ইচ্ছে হত সংহিতার।

ঠিক বেলা বারোটা নাগাদ মিলা চলে এল। বোধহয় গতকাল গেটের সিকিউরিটি ওকে চিনে গিয়েছিল বলে সোজা লিফ্‌টে চড়ে তার দরজার বেল টিপতে পেরেছে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ওদের বলে দিতে হবে যখনই কেউ আসবে তাকে ফোন করে জেনে নিতে হবে। মিলার ক্ষেত্রে নয়, অনেক সময় কেউ কেউ প্রয়োজনে দেখা করতে আসে, দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে তার নাও হতে পারে।

মিলা এখন ঝকঝকে। হোটেল থেকে স্নান করে নীল শাড়ি পরে এসেছে। সিকিউরিটির একজন ওর দুটো সুটকেস নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। মিলা দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "চলে এলাম। তিনদিন থাকব।" না, আজ মিলা চুমু খেল না বলে স্বস্তি হল। নিশ্চয়ই সিক্তা ওদের দেখছে।

"চলো, তোমার ঘর দেখিয়ে দিই।" বলেই সংহিতা গলা তুলল, "সিক্তা, ওই সুটকেস দুটো গেস্টরুমে নিয়ে আসতে পারবে?"

সিক্তা বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। নিচু হয়ে একটা ভারী সুটকেস তুলল।

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "ও, তুমি! কী নাম?"

আড়চোখে সংহিতাকে দেখে নিয়ে সিক্তা বলল, "সিক্তা।"

"বাঃ। এই নাম তো কখনও শুনিনি। হাইট কত?"

সিক্তা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। সংহিতা হেসে ফেলল, "এই প্রশ্নটাও ও জীবনে কখনও শোনেনি! কী করবে? ফ্যাশন প্যারেডে নামাবে নাকি!"

"না না। অ্যাভারেজ বাঙালি মেয়ের থেকে ও অনেক লম্বা, তাই না?"

গেস্টরুমে স্থিতু হওয়ার পরে সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "কাল ওইভাবে মদ গিললে কেন?"

"জানি না। কতদিন পরে হুইস্কি খেলাম নিজেই জানি না। ওদেশে কেউ জোর করলে একটু ওয়াইন খেয়েছি কখনও সখনও। হুইস্কি আমাকে কখনওই টানে না। কাল অনীশদার মৃত্যুর খবর পেয়ে কীরকম নড়ে গেলাম। ওঁর বাড়িতে ফোন করলাম। অনীশদার স্ত্রী খুব খারাপ ব্যবহার করল। প্রায় স্ল্যাং-এর কাছাকাছি শব্দ বলল, তুমি ভাবতে পারো!" মিলা বলল।

"সে কী! কেন?"

"অনীশ সোমের তো প্রচুর মেয়েভক্ত ছিল। লোকটা যে মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করত তা সবাই জানি। এইসব মেয়েরাই বোধহয় মৃত্যুর খবর পেয়ে ফোনের পর ফোন করে গেছে। তাতেই ইরিটেটেড হয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। মন খারাপের সঙ্গে অপমানবোধ মিশে গেলে যে-অনুভূতি হয় সেটা থেকে মুক্তি পেতে হুইস্কির অর্ডার দিয়েছিলাম। যাই বলো, কাল মনে হচ্ছিল শোকটাকে বেশ সেলিব্রেট করছি।" মিলা শব্দ করে হাসল, "ছেলেবেলায় শুনতাম হিন্দুদের আত্মা নাকি শ্রাদ্ধের পর স্বর্গ বা নরকে চলে যায়। শ্রাদ্ধের তো দেরি আছে, তা হলে অনীশদার আত্মা নিশ্চয়ই এখানে আছে। ঘুরপাক খেতে খেতে এইসব কথা শুনছে!"

আচমকা শিরশির করে উঠল সমস্ত শরীর। মিলা জিজ্ঞাসা করল, "এ কী! তোমার গায়ে কাঁটা ফুটছে কেন? কথাগুলো শুনে ভয় পেলে নাকি। দুর! ওসব স্রেফ কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। খ্রিস্টানদের তো মারা যাওয়ার পরেই, আই মিন জার্নি আফটার ডেথ শুরু হয়ে যায়। তাই ধরলে অনীশ সোম এখন বহু দূরে চলে গেছেন।"

"কোথায় যেতে পারেন তিনি? স্বর্গ না নরকে?" মৃদুস্বরে বলল সংহিতা।

"তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো তা হলে আমার অনেস্ট উত্তর হবে, নরক।"

"বাঃ! কেন?"

"স্বর্গে, যা শুনেছি, কোনও বৈচিত্র্য নেই। সৎ, ভাল এবং সরল মানুষগুলো সেখানে ভগবানের নাম জপ করছে। কিন্তু নরকে যারা যায় তাদের কত বিচিত্র ধরনের চেহারা, কেউ খুনি, কেউ মাতাল, কেউ ধর্ষক, কেউ চোরাকারবারি, কেউ আত্মহত্যা করে গেছে। আমার তো ধারণা পৃথিবীর সব মৃত রাজনৈতিক নেতাদের সেখানে গেলে দেখা যাবে। ছবির সাবজেক্ট হিসেবে এরা কী দারুণ লোভনীয় ভেবে দেখো!" মিলা বলল।

সংহিতা উঠল, "কিন্তু সেখানে গেলে তোমাকেও তো নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।"

"আরে, যতক্ষণ মরছি না ততক্ষণ এরকম ভাবলে মন্দ কী!" মিলা বলল।

"তুমি তো স্নান সেরে এসেছ। খাবার দিতে বলি।"

"খাবার? নাঃ। আজ অনেকটা ব্রেকফাস্ট করেছি।"

"একটু খাও।"

"কী আছে?"

সংহিতা সিক্তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল, "শুক্ত, কলাইডাল, চিংড়িপোস্ত, আড়মাছের কালিয়া।"

"শুক্ত? পোস্ত? শাবাস! কতদিন খাইনি। ঠিক আছে, চলো, আসছি।"

দুপুরের খাওয়ার পর মিলার বৃত্তান্ত শুনল সংহিতা। আপাতত তার ছয় মাসের ডেরা হল ভিয়েনা শহরে। দুটো ঘরের ফ্ল্যাটে সে থাকে। একটাতে আঁকে অন্যটায় বাকি কাজকর্ম। বছরে চারটে এগজিবিশন করে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। সোলো। ছবি থাকলে গ্যালারি চাইলে অন্যদের সঙ্গেও দেয়। ইউরোপে এখন তার পনেরো জন স্টেডি কাস্টমার আছে। এরা ছবি কেনে স্রেফ ব্যাবসা করবে বলে। ভিয়েনার শিল্পবিষয়ক কাগজে তার ছবির কথা প্রায়ই লেখা হয়। ওই পনেরো জন ছাড়াও এগজিবিশনে এসে পছন্দ হলে ছবি কিনে নিয়ে'যায় অনেকেই। ফলে তার টাকাপয়সার অভাব হচ্ছে না। সে স্থির করেছে পঞ্চাশ পর্যন্ত এই জীবনযাপন করবে। তারপর সুইজারল্যান্ডের কোনও ভ্যালিতে ছোট্ট বাড়ি কিনে বাকি জীবনটা থাকবে।

সংহিতা বুঝল মেয়েটা জীবন নিয়ে জুয়া খেলেছে। এই সাহস ক'টা মেয়ের থাকে! সাহসী হয়েও অনেকে তলিয়ে যায়। মিলা যায়নি এটা ওর কপাল। সে জিজ্ঞাসা করল, "আর বিয়ে করোনি?"

"আর মানে? তুমি সৌম্যর পরে কাউকে বিয়ে করেছি কিনা জানতে চাইছ? তিন তিনবার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। তিন জনেই ওদেশের ছেলে। এখন বিরক্ত হয়ে গেছি। ছেলেদের বাইরেটা এক এক রকম। একটু পুরনো হলেই প্রত্যেকের ভেতরটা এক রকম হয়ে যায়। জেলাস, পজেসিভ। আমার রোজগারের টাকাকে নিজের বলে ভাবতে খুব পছন্দ করে। প্রত্যেকের ধান্দা তাড়াতাড়ি আমাকে মা বানাবার। একবার যদি সন্তানের মা করে দিতে পারে তা হলে তাদের ভিত বেশ শক্ত হয়। ছয়বার অ্যাবর্ট করতে হয়েছে ওদের জ্বালায়।" মিলা বলল।

"এরকম কেন হবে? কাউকে ভালবেসে বিয়ে করলে তার সন্তানের মা হতে তো স্বাভাবিক ভাবেই ইচ্ছে করবে। তাই না?"

"করবে। যদি বুঝি লোকটার সেই সন্তানের দায়িত্ব নেওয়ার মতো যোগ্যতা আছে। সবটা আমার ঘাড়ে ফেলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালে আমি মেনে নেব কেন? বিশ্বাস করো, চারবারের পরে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বিয়ে, সন্তান আমার জন্যে নয়। সেই জন্যে একটা নপুংসককে জায়গা দিলাম আমার ফ্ল্যাটে। ও সঙ্গে থাকায় কোনও ছেলে আর বিরক্ত করতে আসছে না। কিন্তু এটাকেও তাড়াতে হবে।"

"সেদিন তো বললে।"

"বিরক্তিকর। শালার যৌনক্ষমতা নেই আবার বৃহন্নলাও নয়। ঠিক আছে। কিন্তু ও যে হোমোসেক্সুয়াল এবং পার্টনারের সঙ্গে মেয়ের ভূমিকা নেয় এটা জানতাম না। জানার পর গা ঘিনঘিন করতে লাগল। দুর! এই, তোমার ঘুম পাচ্ছে না?"

"না তো!"

"অনেকদিন পর পেট ভরতি পোস্ত খেয়ে আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"ঘুমোও। আমি পরদা টেনে দিচ্ছি।"

পরদা টেনে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সংহিতা। মিলাকে তার মোটেই খারাপ লাগছিল না। যা সত্যি তা খোলাখুলি বলছে, কোনও প্রিটেনশন নেই। কলকাতার অনেক শিল্পীই মিলাকে অপছন্দ করে। একটা বাঙালি মেয়ে, একটু-আধটু ছবি আঁকার ক্ষমতা নিয়ে ইউরোপে বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে বলে ওকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে অনেকের। যারা মধ্যবয়সি তাদের কেউ কেউ ওর সঙ্গে ভাব করতে চায় দুটো কারণে। এক, শরীর নিয়ে মিলার কোনও ছুঁৎমার্গতা নেই বলে যে-কথাটা চালু আছে তার সুযোগ নেওয়া; দুই, ওর সুপারিশে ইউরোপে এগজিবিশন করা। প্রথমটা সম্পর্কে স্বাভাবিক কারণেই কিছু জানা নেই সংহিতার, কিন্তু দ্বিতীয়টায় কেউ সফল হয়নি।

টেলিফোন বাজল। সিক্তা রিসিভার তুলে কথা বলে নিচু স্বরে বলল, "গেট থেকে সিকিউরিটি ফোন করছে।"

এই সময় কেউ আসে না। তা ছাড়া অ্যাপয়ন্টমেন্ট না করে আসারও কথা নয়। অবশ্য এই সরল সত্যটা কোনও কোনও কাগজের সাংবাদিক বুঝতে পারে না। সে রিসিভার তুলে জানান দিল।

"ম্যাডাম, একজন পুলিশ অফিসার এসেছেন, দেখা করতে চান।"

পুলিশ অফিসার কেন আসবে? দেখা করব না বলতে পারল না সে।

মিনিট চারেকের মধ্যে বেল বাজলে সে নিজেই দরজা খুলল।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, "সংহিতা রায়—!"

"হ্যাঁ। বলুন।"

"একটু ভেতরে যেতে পারি?" ভদ্রলোক তাঁর আইডেন্টিটি কার্ড দেখালেন।

তারপর বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, "এই সময় আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। যদি সময় কম নেন তা হলে খুশি হব। বসুন।"

সোফায় বসে অফিসার বললেন, "কাল রাত্রে রিক্তা নামের যে-মেয়েটিকে আমরা আপনার এখানে পৌঁছে দিয়েছি তার ব্যাপারেই কিছু জানার আছে।"

"বেশ, বলুন।"

"ও কি এখন এ-বাড়িতেই আছে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি যে চিঠি দিয়েছেন, দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন সেটা সঠিক ভাবলেও আমাদের রেকর্ডের জন্যে কিছু তথ্য জানা দরকার। ওকে যদি এখানে আসতে বলেন তা হলে কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।" অফিসার বললেন।

সংহিতা সিক্তাকে ডেকে ওই ঘরে নিয়ে এল।

তাকে আপাদমস্তক দেখে অফিসার বললেন, "তুমি স্টেটমেন্ট দিয়েছ, যে মারা গেছে তার সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সে কী করছে, কোথায় যাচ্ছে তা তোমাকে কখনও বলেনি। টাকার অভাবে খেতে পেতে না ভালভাবে। তাই ওকে ছেড়ে এসেছ।"

মাথা নাড়ল সিক্তা, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু লোকটা তোমার স্বামী ছিল না। বিবাহিত সম্পর্ক হয়নি।"

সিক্তা চুপ করে থাকল। সংহিতা বলল, "বিবাহিত না হয়েও একসঙ্গে থাকাটা কি অপরাধ? আপনারা যদি সেটাকে অপরাধ মনে করেন তা হলে কি সে কারণে ওকে আটকেছিলেন?"

"না। যতক্ষণ কেউ কমপ্লেন না করছে এ নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামায় না।"

"তা হলে?"

"ওইখানেই সমস্যা হয়েছে। বুঝতেই পারছেন লোকটি উগ্রপন্থীদের সঙ্গে জড়িত ছিল। মাসের পর মাস তাদের চর হিসেবে কাজ করে গেছে।

ওর ব্যাকগ্রাউন্ড খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে যে-গ্রামে বাস করত সেই গ্রামে এরও শ্বশুরবাড়ি। লোকটার সঙ্গে ও গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল। আমরা জেনেছি তখন লোকটার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তা হলে তুমি কেন শ্বশুরবাড়ির নিরাপদ আশ্রয় থেকে ওর সঙ্গে পালালে?" অফিসার তাকালেন।

সংহিতাই জবাব দিল, "অফিসার, ভালবাসা প্রবল হলে যুক্তির বাঁধ টেকে না।"

"কিন্তু অভাবে পড়তেই ভালবাসা উবে গেল?" অফিসার মাথা নাড়লেন, "ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন, ইনক্লুডিং ওর স্বামীর কাছ থেকে কোনও প্রশংসাবাক্য আমরা আশা করিনি। বউ বাড়ি ছেড়ে গেলে তার নিন্দে লোকে গলা ফুলিয়ে করে। কিন্তু ওর ভাশুর বলছে, মাঝে মাঝেই ওই লোকটার কাছে জঙ্গলমহলের কেউ কেউ মাঝরাতে আসত। ওর ভাশুর বলেছে তখন মাঠে যাওয়ার নাম করে রিক্তা বেরিয়ে যেত। ভোররাত্রে ও যে প্রাকৃতিক কারণে বের হত না তা তারা পরে বুঝতে পেরেছে। তাই ও যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল তখন ওরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। আর খোঁজখবর করেনি। ম্যাডাম, এই অভিযোগ সত্যি হলে লোকটা গ্রামে থাকতেই উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এই মেয়েটি তাদের কোনও না কোনও ভাবে সাহায্য করেছে। ভালবাসাটাসা নয়, স্রেফ এক দলের সদস্য বলেই ও লোকটির সঙ্গে ঝাড়গ্রামে এসে থেকেছে।"

সংহিতা বলল, "ওর ভাশুরের কথার প্রমাণ পেয়েছেন?"

"না। এখনও পাইনি।"

"যদি প্রমাণিত হয় ভাশুর সত্যি বলছে তা হলে ওকে অ্যারেস্ট করবেন।"

অফিসার বললেন, "ভাশুর লোকটা ওকে বিপদে ফেলার জন্যেও বলতে পারে।"

"গ্রামের আশেপাশের বাড়ির লোক, ঝাড়গ্রামে যেখানে থাকত সেখানকার লোকজন ওর আচরণে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কিনা তদন্ত করলে জানতে পারবেন।" সংহিতা এবার বিরক্ত হল।

অফিসার সিক্তার দিকে তাকালেন, "তোমার ভাশুর যা বলেছে তা তুমি কি অস্বীকার করছ?"

সিক্তা বলল, "হ্যাঁ। উনি যা চেয়েছিলেন তা পাননি বলে মিথ্যে বদনাম দিয়েছেন।"

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, "থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। একটা অনুরোধ, আমাদের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে আপনার কাছেই রেখে দেবেন।"

"সেটা শেষ করতে কতদিন লাগবে?"

"এখনই ঠিক বলা যাচ্ছে না—।"

"আশ্চর্য কথা! কাল যদি ও কোনও অন্যায় করে তা হলেও ওকে রাখতে হবে? ধরুন, ও চুরি করল, দামি জিনিস ভাঙল, বাজারে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পাঁচ ঘণ্টা কোথাও আড্ডা মেরে এল, আমি ওকে ছাড়িয়ে দিতে পারব না?" বেশ জোরেই জিজ্ঞাসা করল সংহিতা।

"নিশ্চয়ই পারবেন। কিন্তু সেটা করার আগে লোকাল থানায় যদি ইনফর্ম করেন তা হলে আমাদের সুবিধে হয়। আচ্ছা, নমস্কার।" অফিসার বেরিয়ে গেলেন।

সিক্তা দরজা বন্ধ করল।

মেজাজ গরম হয়ে গেল সংহিতার। খামোকা ঝামেলায় জড়াচ্ছে সে! ও যদি অন্যায় না করে থাকে তা হলে পুলিশ নিশ্চয়ই অনন্তকাল জেলে পুরে রাখত না। ওর অতীত সম্পর্কে যেটুকু জেনেছে তা ওর কাছ থেকেই শোনা। পুলিশ ধরেছে শুনে সাত তাড়াতাড়ি ছাড়ানোর জন্যে অত ব্যস্ত হওয়ার কোনও দরকার ছিল না।

"সিক্তা!" একটু জোরেই ডাকল সংহিতা।

তৎক্ষণাৎ সামনে চলে এল মেয়েটা, জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

"তুমি আমাকে যা বলেছ তাতে সত্যি কতখানি ছিল?"

"একটাও মিথ্যে বলিনি আমি।"

"তোমার বাবা-মা তো দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিল। তা হলে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে চাইলে না কেন? সেখানে নিশ্চয়ই থাকাপরাখাওয়ার সমস্যা ছিল না!"

"হ্যাঁ দিদি, ছিল না।"

"তা হলে বাড়ি ছাড়লে কেন?" সরাসরি তাকাল সংহিতা।

মুখ নামাল সিক্তা। বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে চাপ দিতে লাগল।

"মানলাম তোমার স্বামী অপদার্থ তাই বলে একটা উটকো লোকের প্রেমে পড়তে হবে?"

"ওই গ্রামেই বাড়ি।"

"সেখানেই থাকত না ঝাড়গ্রাম থেকে যাতায়াত করত?"

"শনিবার আসত সোমবার চলে যেত।"

"কী করত সেখানে?"

"ট্যাক্সি চালাত।"

"তোমার সঙ্গে ওর কে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল?"

সিক্তা ভাবার চেষ্টা করল। সংহিতা বলল, "সত্যি কথাটা বলো। বাড়িতে শান্তি পেতে না, স্বামী অপদার্থ তাই কেউ যখন তোমাকে উগ্রপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল তখন মনে হয়েছিল কিছু করতে পেরে বেঁচে গেছ, তাই না?"

"না। আমার শাশুড়ির শরীর খুব খারাপ হয়েছিল। টেম্পো করে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সবাই কাজে ব্যস্ত বলে আমাকে রেখেছিল তার দেখাশোনার জন্যে। দশ দিন ছিলাম। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আগে মুখ চিনতাম, ওখানে আমাকে দেখে কথা বলেছিল। ওর বন্ধুকে দেখতে হাসপাতালে আসত। আমি শাশুড়ির বিছানার পাশে মেঝেতে রাত্রে শুতাম। ও সবাইকে বলে আমার শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। শাশুড়ি সুস্থ হলে ও ট্যাক্সিতে আমাদের গ্রামে পৌঁছে দিয়েছিল কিন্তু ভাড়া নেয়নি।"

"তা হলে মাঝরাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাদের গ্রামের বাইরে এগিয়ে দিতে?"

"কাউকে না।"

"তোমার বাইরে বের হওয়াটা কি মিথ্যে কথা?"

"না। মাঠে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতাম!" বলেই মুখ নিচু করে ঠোঁট কামড়াল সিক্তা।

"ঝাড়গ্রামে তোমরা তো স্বামী-স্ত্রীর মতো ছিলে। বাচ্চাটাচ্চা হয়নি!"

"না। আমি বলেছিলাম বিয়ে না করলে বাচ্চা চাই না।"

"তোমার কথা শুনত?"

"হ্যাঁ।" সিক্তা নির্বিকার মুখে বলল, "বাচ্চা না হওয়ার ব্যবস্থা নিত।"

"এরকম কতদিন চলেছিল?"

"অনেকদিন। তারপর যেই সে বাইরে রাত কাটাতে আরম্ভ করল অমনি তার মধ্যে পরিবর্তন এল। বাড়িতে ফিরে আসত শুধু ঘুমোবার জন্যে।"

"তুমি কিছু বলোনি?"

"অনেক বলেছি, কেঁদেছি। তখন মিথ্যে বলতে আরম্ভ করল। বলত প্যাসেঞ্জার নিয়ে রৌরকেল্লা যাচ্ছি, বর্ধমান যাচ্ছি। যার গাড়ি চালাত সে এসে ওর খোঁজ করাতে মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেল।"

"ওর কাছে যারা আসত তাদের তুমি চিনতে?"

"প্রথম প্রথম দু'-চারজন ড্রাইভার বন্ধু আসত। পরে হঠাৎ হঠাৎ যারা আসত তাদের চিনতাম না। আমি সামনে থাকলে কথা বলত না ওরা।"

"তোমার সন্দেহ হয়নি?"

মাথা নেড়েছিল সিক্তা, না। বলল, "কীরকম উদাসীন হয়ে গিয়েছিলাম। তখন মনে হত বাড়ি ছেড়ে চলে এসে ঠিক করিনি।"

"তুমি ওর মৃতদেহ দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে মারা গেল?"

"জঙ্গলে, সিআরপি'র গুলিতে। বুকে গুলি লেগেছিল।"

"ওর সঙ্গে ক'জন ছিল?"

"জানি না। ও একাই মারা গিয়েছিল।"

"সিআরপি কেন ওকে গুলি করে মারল তা জানো?"

"থানায় শুনেছি। বিশ্বাস করুন, গ্রামের কেউ কেউ মাওবাদীর দলে নাম লিখিয়েছে, তারা আর গ্রামে থাকে না। পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে অনেক অত্যাচার করেছে খবর পাওয়ার জন্যে, কিন্তু ওর নামে কেউ বলেনি যে, মাওবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।"

"তুমি কি ওকে বলে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছ?"

"হ্যাঁ, বলেছি। কোথায় যাব বলিনি। কিন্তু আমি যে ওর সঙ্গে থাকব না জানার পর ওর একটুও কষ্ট হয়নি, বরং মনে হচ্ছিল ও যেন বেঁচে গেল। আমি যে ওর বোঝা সেটা ওর মুখ দেখে বুঝতে একটুও অসুবিধে হয়নি।"

"ওর মৃতদেহ দেখে তোমার কী অনুভূতি হল?"

ঠোঁট কামড়াল সিক্তা, "খুব কষ্ট হচ্ছিল।"

"কষ্ট? কেন? সে তো তোমাকে অবহেলা করেছিল!"

"ঠিকই। কিন্তু—!" মাথা আবার নিচু করল সিক্তা।

"সিক্তা। আমি ধরে নিচ্ছি তুমি যা বললে তার সবটাই সত্যি। তোমার জন্যে আমি দায়িত্ব নিয়ে পুলিশকে চিঠি লিখেছি। আশা করি সেজন্যে পরে আমাকে আফশোস করতে হবে না।"

সংহিতার কথা শেষ হওয়ামাত্র ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়াল মিলা। এখন তার পরনে গেঞ্জি আর শর্টস। পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর অনেকটা ওপর পর্যন্ত সিল্কের মতো চকচকে ভাব ছড়ানো রয়েছে।

"খুব গম্ভীর আলোচনা চলছে বলে মনে হচ্ছে?" মিলা জিজ্ঞাসা করল।

"এসো। এত তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে গেল!" সংহিতা বলল।

"আমার তো এটাই সমস্যা। এক ঘণ্টার বেশি টানা ঘুমোতে পারি না। রাত্রে বারবার উঠে বসি। আবার ঘুম না আসা পর্যন্ত কী যে অস্বস্তি! রাতের পর রাত এই চলছে। ছেড়ে দাও এসব কথা।"

সংহিতা বলল, "সিক্তা, দু'কাপ চা চাই যে!"

সিক্তা উঠে গেল।

"সমস্যাটা কী?"

"ও যাকে ভালবেসে ঘর ছেড়েছিল সে যে একজন মাওবাদী তা জানত না। লোকটা অবহেলা করায় কলকাতায় চলে এসেছিল কাজ করতে। সেই লোকটাকে পরশু পুলিশ গুলি করে মেরে ফেলেছে। তারপর ওকে নিয়ে পড়েছিল। ওর সঙ্গে মাওবাদীদের যোগাযোগ আছে কিনা তা তদন্ত করছিল। আমি চেষ্টা করে জামিন হয়ে ছাড়িয়ে এনেছি।"

"ইন্টারেস্টিং। বাঙালি মেয়ের জীবনে সাধারণত এরকম ঘটনা ঘটে না। কিন্তু একটা কথা শুনে খুব ভাল লাগল।" মিলা বলল।

"কোন কথাটা?"

"তোমার এই মেয়েটা অবহেলা মেনে নিয়ে পাপোশের মতো পড়ে থাকেনি। গুড।" চা শেষ করে মিলা জিজ্ঞাসা করল, "নতুন কাজ শুরু করেছ?"

"হ্যাঁ। ঠিক জুত করতে পারছি না।"

"চলো, দেখি।"

"দেখবে?" ইতস্তত করল সংহিতা, "একেবারে কাঁচা অবস্থায় আছে।"

"তা থাক। তোমার শুরুটা দেখেও তো শেখা যায়।"

"বাজে বোকো না। তুমি গোটা ইউরোপ জয় করেছ ছবি এঁকে, আমার কাছে নতুন করে কী শিখবে!" সংহিতা কথাগুলো বলা সত্ত্বেও মিলাকে নিয়ে আঁকার ঘরে গেল।

যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ নিজের আঁকা ছবি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখাতে আপত্তি ছিল সংহিতার। এমনও হয়েছে যা ভেবে শুরু করেছিল আঁকতে আঁকতে তা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আবার যা আঁকতে চেয়েছিল শেষ হওয়ার পর দেখা গেল বিষয় পালটে গেছে। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন তাকে দেখার চেষ্টা করতে নেই বলে বিশ্বাস করত সংহিতা। কিন্তু এখন মিলাকে রূঢ় কথা বলতে পারল না।

স্কেচটার সামনে দাঁড়িয়ে থমকে গেল মিলা। মিনিটখানেক চুপচাপ দেখে জিজ্ঞাসা করল, "এরা কারা? প্রাগৈতিহাসিক?"

সংহিতা হাসল, কিছু বলল না।

"এরা কি আফ্রিকান? ইংরেজরা ক্রীতদাস করে নিয়ে যাচ্ছে? না, তা নয়। শোনো, আমার কেমন আনক্যানি অনুভূতি হচ্ছে।"

"তাই?"

"মনে হচ্ছে এরা এই পৃথিবীর মানুষ না।"

"বাঃ, এইটুকু মনে হলেই আমি ঠিক পথে হাঁটছি।"

"সত্যি বলো তো, কী আঁকতে চাইছ?"

"যেটা চাইছি সেটা শেষপর্যন্ত আঁকতে পারব কিনা জানি না। তাই এখনই বলা ঠিক হবে না।"

"কিন্তু এতকাল তুমি যা আঁকতে এই ছবি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে।"

"জানি না। স্বপ্নে কিছু দেখেছিলাম। মুশকিল হল স্বপ্নকে মডেল করা যায় না। জেগে ওঠার পর অনেকটাই ভুলে যেতে হয়। অতএব একটা ফাঁক থেকে যাবেই।"

"ভাল না খারাপ স্বপ্ন?"

"মুশকিল, বলতে পারব না। ধরো স্বপ্নে তুমি ঈশ্বরকে দেখলে। তুমি ভাবলে তিনি ঈশ্বর। কিন্তু জেগে ওঠার পর মনে হল ঈশ্বর নয়, শয়তানকে দেখেছ। এখন তুমি যদি আঁকতে যাও পারবে স্বপ্নটাকে ধরতে?" সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল মিলা, "আমি পারব না, একজন পারতেন।"

"কার কথা বলছ?"

"অনীশদা। ওঁর যেটা নিজস্ব স্টাইল ছিল। যে-কোনও মানুষের শরীরকে ভেঙেচুরে আবার অন্য মাত্রায় এনে দেওয়া, তাতে উনি যদি আঁকতেন তা হলে কারও কাছে ঈশ্বর মনে হত, কেউ বা শয়তান বলে ভেবে নিত। আহা লোকটা পটাস করে মরে গেল!"

সন্ধের মুখে মিলা জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কাছে হুইস্কি আছে?"

"আমার তো ওসব খাওয়ার অভ্যেস নেই।" হাসল সংহিতা।

"চলো, বাইরে যাই। কো'নও ক্লাবে—।"

"কেন?"

"খুব ইচ্ছে করছে দু"পাত্র খেতে।"

"তুমি যাও। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।"

বার্মিজ পোশাক পরে মিলা বেরিয়ে গেল।

বই পড়ছিল সংহিতা, ফোনটা এল। মোবাইলে। অন্যমনস্ক ভাবে নম্বর না দেখেই ওটাকে অন করে হ্যালো বলল সে।

"জয়ব্রত বলছি।"

"উঃ, আবার—!" কথাটা শেষ করতে চাইল না সংহিতা।

"আমি জানি তোমাকে আমি বিরক্ত করছি। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমি কী করব বুঝতে পারছি না। সংহিতা, প্লিজ একবার দেখা করার সুযোগ দাও।"

"জয়ব্রত, তুমি যে আমার কাছে মৃত তা তোমার জানা আছে।"

"জানি। আমি আমার জন্যে দেখা করতে চাইছি না। আমি যদি একা হতাম তা হলে চিন্তা করতাম না। আমি টিকলিকে মেরে ফেলতে পারি না।"

"টিকলি কোথায়?"

"আমার কাছেই আছে। কিন্তু—।"

কথা শেষ করতে না দিয়ে মোবাইল অফ করে দিল সংহিতা। তার ভয় হচ্ছিল জয়ব্রত সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা বলে তাকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। টিকলি সম্পর্কে তার দুর্বলতার কথা ওর অজানা নয়। কিন্তু এতগুলো

বছর পরে কেন টিকলিকে ব্যবহার করছে জয়ব্রত? সে ব্যবহারই বলবে এটাকে। জয়ব্রতর ধারণা মেয়েটার কথা বললে সে দুর্বল হবেই। আশ্চর্য! যাকে সে পাঁচ কি ছয় বছর পর্যন্ত দেখেছিল সে এখন তিরিশে পৌঁছে গিয়েছে। এই এতদিনের ব্যবধানেও তার মনে কোনও দুর্বলতা বেঁচে থাকতে পারে এটা জয়ব্রত ভাবল কী করে?

টিকলির যদি ওই বয়স এখন হয় তা হলে জয়ব্রতর কাছে থাকবে কেন? এর মধ্যে বিয়ে-থা করে স্বামীর সংসারে থাকার কথা। পাঁচ-ছয় বছরের টিকলি যথেষ্ট সুন্দরী ছিল। ওই সৌন্দর্য দেখে সে বলত, বড় হলে তুই কত ছেলের চোখ অন্ধ করে দিবি কে জানে! সেই মেয়ে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকবে?

পরক্ষণেই একটা শিরশিরে অনুভূতি হল। টিকলির যদি বিয়ে হয়ে থাকে তা হলে সে-ই বিয়ে কি ভেঙে গিয়েছে? বেচারা কি আবার তার বাবার কাছে ফিরে এসেছে? কিন্তু টিকলি নিশ্চয়ই পড়াশুনো করেছে। আজকাল অনেক ছেলেমেয়ের বিয়ে নানান কারণে বেশি দিন টিকছে না। কিন্তু তাই বলে কেউ ভেঙে পড়েছে না বা বাবা-মায়ের গলগ্রহ হয়ে বাস করে না। তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নতুন করে জীবনের মোকাবিলা করে। টিকলি যে পড়াশুনো না করে মূর্খ হয়ে বসে ছিল সেটা ভাবতে পারছিল না সংহিতা। তাই জয়ব্রতর বক্তব্য একদম বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না তার।

"আমি টিকলিকে মেরে ফেলতে পারছি না।" কথাগুলো বলার সময় জয়ব্রতর গলা কেঁপে উঠছিল। অত ভাল অভিনয় কি ওর পক্ষে করা সম্ভব? টিকলিকে মেরে ফেলার কথা উঠছে কেন? কী করেছে সে? একটা তিরিশ বছরের মেয়েকে তার বাবা হঠাৎ মেরে ফেলার কথা ভাবছে কেন? পারছে না বলে হতাশ হয়ে পড়েছে? মাথা নাড়ল সংহিতা। যে-মেয়েকে সে শৈশব অবস্থায় দেখেছে, ঘনিষ্ঠ হয়েছে, এতগুলো বছর না-দেখার পর তাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও দায় তার নেই।

ল্যান্ডফোন বাজল। সিক্তা কথা বলে এসে দরজায় দাঁড়াল, "ড্রাইভার ফোন করছে।"

"কী বলছে?"

"ওই দিদি নাকি আজ রাত্রে ফিরবে না বলে ওকে ছেড়ে দিয়েছে, ও কী করবে?"

"গাড়ি গ্যারাজ করে দিতে বলো।"

সিক্তা চলে গেল ফোনের কাছে।

মিলা বোধহয় আর কোনওদিন থিতু হতে পারবে না। এই মেয়ে কীভাবে ছবি আঁকে তা ঈশ্বরই জানেন। দশ মিনিট পরে ও কী করবে তা নিজেই জানে না। গেল দু'পাত্র হুইস্কি খেতে। কলকাতা যতই আধুনিক শহর হোক, এখনও যুবতী কোনও মহিলা যদি হুইস্কির সন্ধানে কোনও বারে ঢোকে তা হলে সবাই অবাক চোখে তাকাবে। কিছু বছর আগে কোনও মেয়ে হোটেলে একা থাকতে চাইলে অ্যালাউ করা হত না। এখন কোনও বারে একলা মেয়েকে কি মদ বিক্রি করা হয়? সংহিতার জানা নেই। যদি হয় তা হলে তার চারপাশের টেবিলের মানুষগুলোর আলোচ্য বিষয় হয়ে যাবে সে। অবশ্য বার ছাড়া পরিচিত কারও বাড়িতে যেতে পারে মিলা। বোধহয় সেরকমই গেছে নইলে রাত্রে ফিরে আসত। এই শহরে সেরকম কত মানুষ ওর জানা আছে? তিনি বিবাহিত বা সংসারী হলে হয়তো হুইস্কি খাওয়াতে পারেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী কি চাইবেন মিলা তাঁদের বাড়িতেও রাত্রিবাস করুক!

"বলে দিয়েছি।" সিক্তা এসে জানিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, সংহিতা দাঁড়াতে বলল।

"যাকে দেখতে গিয়েছিলে তার সৎকার হয়ে গেছে?"

"বোধহয় না। আমি ফিরে আসার পরে হয়েছে কিনা জানি না।"

"সে কী! তুমি ওকে দেখোনি?"

"হ্যাঁ। দেখিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল, চিনি কিনা। বলেছি, চিনি।"

"ঠান্ডাঘরে রেখেছিল?"

"না। আরও অনেকর শরীর পড়ে ছিল সেই ঘরে।"

"সে কী? পচে দুর্গন্ধ বের হবে তো!"

"নাকে আঁচল চেপে ঢুকতে হয়েছিল।"

"ওর মুখাগ্নি করবে কে?"

"জানি না।"

"গ্রাম থেকে আত্মীয়স্বজনরা আসেনি?"

"দেখতে পাইনি।"

অদ্ভুত অস্বস্তিতে আক্রান্ত হল সংহিতা। লোকটা দেশবিরোধী কাজ করেছে বলে পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরও কি শরীরটা দেশের

শত্রু হয়ে থাকবে? তার দেহ কতদিন পরে চিতায় তোলা হবে? সে সিক্তার দিকে তাকাল, "তুমি আমাকে যা বলেছ তা সত্যি তো?"

"আমি মিথ্যে বলিনি।"

"লোকটা তোমাকে বিয়ে করেনি কেন? তুমি বলোনি?"

"বলেছিলাম।"

"সে কী জবাব দিয়েছিল?"

"বলেছিল আমার বিয়ে না ভেঙে দিয়ে আবার বিয়ে করলে পুলিশ ধরে জেলে ঢোকাবে।" সিক্তা নিচু গলায় বলল।

"সেটা করার চেষ্টা করেছিলে?"

"না। কীভাবে করতে হবে জানতাম না। ও আমাকে সাহায্য করেনি।"

"তা হলে তোমাদের ছেলেমেয়ে হলে কী করতে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সিক্তা। তারপর বলল, "যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করেছিল।"

"ও। এখন যদি পুলিশ সৎকার করতে ডাকে তুমি যাবে?"

"না।" ঝটপট উত্তর দিল সিক্তা, "কেন যাব? আমাকে তো সে তার অধিকার দিয়ে যায়নি। তার বাড়ির লোক ওসব করুক।"

"তা হলে দেখার জন্যে ছুটে গেলে কেন?"

"একসঙ্গে ছিলাম, মনে মায়া ছিল, তাই।"

"ঠিক আছে। আমাকে খেতে দাও।" সংহিতা কথা শেষ করেছিল।

ঘুম আসবে না ভেবে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিল সংহিতা। বিছানায় শোওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীরে আমেজ এল। এল ঘুম।

আকাশে এখন হালকা সোনালি আলো। আশপাশে মাত্র সাত-আট জন। বাকিরা কোথায় গেল? সে পাশে তাকাল। হা হা হা করে হাসছিল যে সে নেই। তার জায়গায় বিকৃত চেহারার এক নারী খুব যন্ত্রণা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

এখন দু'পাশের নিষ্পত্র গাছের মতো চেহারার অন্ধকার গায়ে-মাখা প্রতিবন্ধকতা নেই। কেউ হাঁটছে না। অথচ ঠিকঠাক দাঁড়িয়েও নেই। সে তাকাল। কোথাও কিছু নড়ছে না। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে এক ধরনের কষ্ট আসতে আসতেও আসছে না। আচমকা মনে হল মাথার ওপরে কিছু হচ্ছে। সে দৃষ্টি ওপরের দিকে করতেই দেখল একাধিক দিব্যপুরুষ আকাশপথে

সিংহাসনে বসে কোনও গন্তব্য স্থানে চলে যাচ্ছেন। তাঁদের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি দেখে সে ভয়ে চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা আর্তনাদ যেন শরীরে আঘাত করল। চোখ না খুলেও সে বুঝতে পারল তার সঙ্গীরাই ভয়ার্ত হয়েছে।

এই সময় আকাশবাণী হল, "তোমার যারা এই স্তর পর্যন্ত আসতে পেরেছ তাদের শেষ বিচারের সময় আসন্ন। এতক্ষণে তোমরা সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছ যেখান থেকে পথ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি পথ তোমাকে স্বর্গে অন্য পথ নরকে নিয়ে যাবে। এই দুটো পথের ঠিক মাঝখানে আকাশছোঁয়া প্রাচীর আছে। সেই প্রাচীরের ওপর কয়েকজন সর্বদা স্থিতি করেন। তাঁরা মুখের লক্ষণানুসারে কে কোথায় যাবেন স্থির করেন। যারা আমাকে অপমান করেছ এবং অন্যদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছ তাদের জন্যে স্বর্গের দ্বার কখনওই উন্মুক্ত হবে না। শুধু তাই নয়, যে পর্যন্ত ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে একটি উট যাতায়াত না করতে পারে সে পর্যন্ত তারা স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি পাবে না। কিন্তু যারা আমার ওপর বিশ্বাস হারায়নি, সারাজীবন সৎকর্ম করেছে, তাদের আমি কখনওই যন্ত্রণা দিই না, তারা স্বর্গলোকে চিরকাল বাস করবে। তাদের অন্তরের সমস্ত বিষাদ আমি দূর করব। যারা বলে ঈশ্বরই আমার পথপ্রদর্শক, তাদের আমি স্বর্গের উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করব। সেখানে রয়েছে অফুরন্ত স্বর্গীয় সুখ-সম্ভোগ।

"কিন্তু যারা সত্যত্যাগী, যারা পৃথিবীতে বাস করার সময় যাবতীয় অন্যায় কর্মে লিপ্ত ছিল তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর দুর্ভোগ। তাদের জন্যে শেষ বিচারের দিনে শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে। সেটা ধ্বনিত হওয়ামাত্র আকাশে টুকরো বহু ফাটল দেখা দেবে, পাহাড় ধ্বংস হয়ে মরুর মরীচিকা হয়ে যাবে, সেই পাপীদের জন্যে নরক প্রতীক্ষায় থাকবে। সেই নরকে পাপীরা অনন্তকাল অবস্থান করবে। কোনও শীতল পানীয় তাদের জন্যে থাকবে না। তৃষ্ণার্ত হলে ফুটন্ত পুঁজ ছাড়া কিছু পাবে না।

"দ্বিতীয়বার শিঙাধ্বনি হওয়ামাত্র পৃথিবী কেঁপে উঠবে। সেই মহাগর্জনে পাপীদের সমস্ত সত্তা ভয়ংকর কেঁপে উঠবে। সেই সময় তারা সমস্ত কিছু বিস্মৃত হয়ে যাবে। যারা কোনও অন্যায় করেনি তাদের মন প্রফুল্ল হবে, মুখে হাসি ফুটবে। কিন্তু পাপীদের মুখ হবে ধূলিধূসর এবং অন্ধকারে ঢাকা।

"সেই বিচারের দিন যাকে তার পার্থিব জীবনের কর্মতালিকা ডান

হাতে দেওয়া হবে তাকে স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যাকে কর্মতালিকা ডান হাতের বদলে পিঠের পিছন দিকে বাঁ হাতে দেওয়া হবে সে নরকে প্রবেশ করবে বিলাপ করতে করতে। ওরা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে, ওদের জন্যে কাঁটাগাছ ছাড়া কোনও খাবার থাকবে না। ওদের জন্যে তৈরি আছে আগুনের পোশাক, মাথায় পড়বে প্রচণ্ড ফুটন্ত জল, ওদের চামড়া, শরীর তার স্পর্শে গলে যাবে। এইভাবে তারা দহনযন্ত্রণা কী তা বুঝতে পারবে।

"অতএব তোমরা প্রস্তুত হও শেষ বিচারের মুখোমুখি হতে।"

আকাশবাণী শেষ হতেই চরাচর স্তব্ধ হয়ে গেল। যারা শুনছিল তারা যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ল। সে বুঝল তার শরীর যেন টলছে। ঠিক তখনই অনুভব করল, কেউ কাঁদছে। কে কাঁদছে? সে তাকাতেই ওই বিকৃত চেহারার নারীকে কাঁদতে শুনল সে। ভাল করে দেখে বুঝতে পারল ওর শরীর স্বাভাবিক নয়। সে কথা বলার চেষ্টা করল, "এই, তুমি কাঁদছ কেন?"

"আ-আমি কোথায় যাব?"

"শুনতে পাওনি? পৃথিবীতে যে যেমন কাজ করেছে তেমনই বিচারের ফল পাবে।"

"আমি, আমি তো কিছুই করিনি। কিছুই করতে পারতাম না যে!"

"সে কী! কিছুই পারতে না? নাম কী তোমার?"

"টিকলি!" কান্না চাপল স্ত্রীলোকটি।

যেন গভীর জলের নীচ থেকে একটু বাতাসের জন্যে পাগলের মতো ওপরে ওঠার চেষ্টার পর যখন সেটা পাওয়া যায় তখনকার অবস্থা হল সংহিতার। সমস্ত শরীরে ঘাম ছড়িয়েছে। বুক ওঠা-নামা করছে। বিছানায় উঠে বসতে না বসতেই সিক্তা ছুটে এল, "কী হয়েছে দিদি? কী হয়েছে?"

কয়েক মুহূর্ত মেয়েটাকে ঝাপসা দেখল সে। তারপর ধাতস্থ হল। সে তার শোওয়ার ঘরের বিছানায় বসে আছে। সিক্তা তার কপালে জমা ঘাম আঁচলে মুছিয়ে দিয়ে বলল, "স্বপ্ন দেখছিলে?"

"ঠিক আছে। যাও, শুয়ে পড়ো।"

"উঃ, তুমি যেভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলে, মনে হচ্ছিল কেউ তোমার গলা টিপে ধরেছে। খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলে নিশ্চয়ই। এই ঘরে একজন ঠাকুরদেবতার ছবি রাখো।"

"সে তো আছেই।" বিছানা থেকে নামল সংহিতা।

"ওমা, কোথায়?"

"ওই তো।" দেওয়ালে টাঙানো তার নিজেরই আঁকা রবীন্দ্রনাথের বিশাল ছবিটা আঙুল তুলে দেখাল সে।

"উনি কি ভগবান?"

"আমার কাছে তার চেয়েও বেশি। যাও শুয়ে পড়ো।"

বাথরুম থেকে ফিরে এসে ঘড়ি দেখল সংহিতা। রাত সাড়ে চারটে। হাসল সে। যাঁরা মর্নিংওয়াক করেন তাঁরা হয়তো বলবেন, "ভোর সাড়ে চারটে।"

সিক্তা চলে গেছে তার ঘরে। বিছানার দিকে তাকাল সংহিতা। এখন শুয়ে পড়লে হয়তো ঘুম এসে যাবে। আর ঘুমালেই কি ওই স্বপ্ন দেখতে হবে? তার শেষ বিচারের দিন বেঁচে থাকতে থাকতেই দেখতে হবে? কিন্তু টিকলি? না, তার ভুল হচ্ছে না। সে স্পষ্ট শুনেছে স্ত্রীলোকটি নিজের ওই নামই বলেছে। টিকলি। কিন্তু টিকলি ওইরকম বিকৃত চেহারার স্ত্রীলোক হবে কী করে? টিকলি নামের আর কাউকে তো সে চেনে না। সেই টিকলি তো চার-পাঁচ বছরে ছিল পুতুলের মতো দেখতে, ভবিষ্যতে আরও সুন্দরী হবে বলে নিশ্চিত মনে হত। ওই স্ত্রীলোকটি কী করে সেই টিকলি হবে? হ্যাঁ, টিকলির বয়স এখন ওই রকমই হবে। না, সেই টিকলি কেন এত অল্প বয়সে শেষ বিচারের জন্যে যাবে? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সে কেন ওখানে পৌঁছেছিল। তার কি শেষ বিচারের দিন আসার বয়স হয়েছে? এই মধ্য পঞ্চাশে তার শরীরে একটিও বলিরেখা পড়েনি, কোমরে চর্বি জমেনি, দ্বিতীয় চিবুক প্রকট হয়নি। এখন তো মানুষ স্বচ্ছন্দে আশির কোঠায় পৌঁছেও সক্রিয় থাকেন।

মুখ ধুয়ে ব্রাশ করতেই শরীর থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল কিন্তু বাইরে আবছায়া অন্ধকার। আজ কী মনে হল দরজা খুলে সিঁড়ি ভেঙে সোজা ছাদে চলে এল সে। বড় ছাদ। চারদিকে নিশ্চুপ বাড়িগুলোর কোনওটাতেই আলো জ্বলছে না। চমৎকার ঠান্ডা হাওয়া বইছে। শরীর জুড়িয়ে গেল সংহিতার। ধীরে ধীরে মনের ভার কমে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, টিকলি এখন কীরকম দেখতে হয়েছে জানলে কেমন হয়। স্বপ্নে দেখা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কি ওর মিল হওয়া সম্ভব? না, হতে পারে না। কিন্তু টিকলি ওখানে গেল কী করে? প্রথম যখন সে দলটিকে দেখেছিল, সামনে ঝুঁকে মাথা নিচু করে হাঁটছিল সবাই সেই দলের কেউ তো বিকৃত চেহারার ছিল না। যে নিজেকে টিকলি বলে

দাবি করেছে সে কী করে অতটা দূরে হেঁটে গেল সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

মাথা নাড়ল সংহিতা। জয়ব্রত টেলিফোনে টিকলির কথা বলেছিল। সেই কথাগুলো মন হয়তো গাঢ়ভাবে নিয়েছিল। নিয়ে তার অবচেতনে রেখে দিয়েছিল। সেটাই স্বপ্নে তুলে ধরেছে। স্বপ্ন তো জীবনে দেখা অভিজ্ঞতাকেই নিজের মতো বানিয়ে এবং সেই বানানোটা অজান্তেই ঘটে যায়, ঘুমের মধ্যে দেখা।

কিন্তু আকাশবাণী বলে যা মনে হয়েছিল, যে-কথাগুলো শুনেছিল, সেগুলো খুব পরিচিত বলে মনে হচ্ছে এখন। সংহিতা আকাশের দিকে তাকাল। পুব আকাশ দ্রুত পরিষ্কার হয়ে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে তার মনে হল, কোথাও বাণীগুলো সে পড়েছিল। কোথায়? চোখ বন্ধ করল সে। তারপর দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল। তার ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো। দরজা ঠেলতেই সিক্তাকে দেখতে পেল। দরজার পাশে একটা মোড়ায় বসে আছে। কোনও কথা না বলে সে ভেতরের ঘরে বইয়ের আলমারিগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রচুর বই। সব রকমের। তারপর দুটি বই, একটি বাইবেল অন্যটি গীতার পাতা খুলে লাইন দেখতে লাগল। শেষপর্যন্ত ওই দুটি রেখে দিয়ে তৃতীয় বইটিকে বের করে কয়েকটা পাতা ওলটাতেই বুঝতে পারল, আকাশবাণীর বাক্যগুলো ওই বইতেই রয়েছে। চশমাটা নাকে চাপিয়ে বইটি নিয়ে আবার ছাদে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে মোবাইলের দিকে তাকাল সংহিতা। তারপর সেটিকে নিয়ে আবার সিঁড়ি ভেঙে ছাদে উঠে এল।

পুব আকাশে এখন আলোর রেখা উঁকি মারছে। পৃথিবীর সমস্ত অন্ধকারকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার প্রস্তুতি চলছে। সূর্যের প্রান্তরেখা উকি মারল এবার। বহু দিন এই দৃশ্য দেখা হয়নি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বইটির পাতা খুলল সে। "যারা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকারী, যারা তাদের উপাসনায় বিনম্র, দানশীলতায় উদার, সৎকর্মে উৎসাহী, অভাবগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকে, তারাই হবে স্বর্গের অধিবাসী।" এই গ্রন্থ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে সঠিক পথে চালিত করেছে, সুশৃঙ্খল করেছে।

সূর্য যখন আকাশে প্রকাশিত হল তখন বুকে বইখানি সশ্রদ্ধায় চেপে ধরল সংহিতা। তারপরেই মনে হল, উদার, বিনম্র, সহানুভূতিসম্পন্ন হতে কেন পারবে না সে। কবে সে প্রতারিত হয়েছিল, কবে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার

করা হয়েছিল সেই ক্ষত মনে রেখে জীবনযাপন করার মধ্যেও তো একটা অহংকার কাজ করে। আর সেইসব অন্যায় যে করেছিল তাতে অংশ নেয়নি চার-পাঁচ বছরের একটি শিশু। অংশ নেওয়ার বয়সই তার ছিল না। তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কেন সে হবে না! সূর্যের দিকে তাকাল সে। এখনও কী শান্ত, কত স্নিগ্ধ। যেটুকু দ্বিধা ছিল তা মন থেকে সরিয়ে দিল সংহিতা।

সে এই মুহূর্তে ভুলে গেল এখন ঘড়িতে ক'টা বাজে। সে ভুলে গেল এখনও ঘরে ঘরে ছায়া ছায়া ঘুম। সেই ঘুম ভাঙিয়ে কথা বলার সময় এটা নয়। মোবাইলের বোতাম টিপে সে কানে চাপল। একটু পরেই শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে। বেশ জোরে জোরে। কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না। কেউ সুইচ টিপে বলছে না, হ্যালো! বেজে বেজে থেমে গেল যন্ত্রটা। দ্বিতীয়বার বোতাম টিপল সে। আবার রিং হতে লাগল। যদি ঘুমিয়ে থাকে ওরা তা হলে এই আওয়াজে তো ঘুম ভেঙে যাওয়া উচিত। আবার থেমে গেল শব্দ।

ধীরে ধীরে নেমে এল সংহিতা। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই সিক্তা জিজ্ঞাসা করল, "এখন চা খাবে তো?" সংহিতা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তারপর চেয়ারে বসে মোবাইলের দিকে তাকিয়েই উঠে পড়ল। বইটাকে সযত্নে আলমারিতে রেখে দিল সে। আগে যখন সে পড়েছিল তখন তেমনভাবে বোঝার চেষ্টা করেনি। আজ অন্যরকম দিন।

চায়ের পর আঁকার ঘরে চলে এল সংহিতা। অসমাপ্ত ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। যারা হাঁটছে তাদের কারও কোনও পরিচিতি নেই। মাথা নিচু করে থাকায় কারও মুখ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। দু'পাশের পরিবেশটা তো ঠিক ভৌতিক ছিল না, ওটা হালকা করতে হবে। কিন্তু ওই মিছিলে কোনও প্রতিবন্ধী মহিলাকে সে আঁকেনি। যে-স্ত্রীলোকটি নিজের নাম টিকলি বলেছিল তার পক্ষে যখন এদের সঙ্গে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয় তখন কী করে শেষ বিচারের দিনের কাছে পৌঁছে গেল? তা হলে কি ওই মিছিলেই টিকলি ছিল, সে দেখতে পায়নি! ওই অবস্থায় যে হাঁটতে পারবে না সে কি গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে!

মিছিলের যে-জায়গাটায় রং পড়েনি, সেই জায়গাটা মুছে ফেলে একটি বিকৃত নারীশরীর আঁকার চেষ্টা করল সংহিতা। প্রায় ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পরে সে আপাতত হাল ছেড়ে দিল। যা চাইছে তা কিছুতেই হচ্ছে না। অন্য

ফিগারগুলোর পাশে বড্ড সাজানো মনে হচ্ছে। সে স্বপ্নে দেখা টিকলিকে মনে করার চেষ্টা করল। শুধু ঝাপসা অবয়বে যার শরীর বিকৃত বলেই বোঝা যায়, তার বেশি কিছু মনে করতে পারল না।

আঁকার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সিক্তা সামনে এল, "ব্রেকফাস্ট দিই?"

ঘড়ি দেখল সংহিতা। ন'টা বেজে গেছে। খাবার টেবিলে বসে সে জিজ্ঞাসা করল, "আজ কী খাওয়াবে?"

"কর্নফ্লেক্স কলা দিয়ে, শশা, পেয়ারা আর জ্যাম মাখানো টোস্ট।"

"বাঃ। নিয়ে এসো।"

বেশ সাজিয়ে আনল সিক্তা। খেতে শুরু করে সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বয়স্ক মানুষ, হাঁটতে পারে না, রাস্তায় বসা অবস্থায় ঘষটে ঘষটে চলে এমন কাউকে তুমি দেখেছ?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়ল সিক্তা, "হ্যাঁ। আমাদের গ্রামেই একজন ছিল।"

"কীভাবে হাঁটত?"

"হাঁটু, দুই হাতে আর পাছায় রবার বেঁধে রাখত। হাতের ওপর ভর করে শরীরটাকে কোনওরকমে টেনে চলত। বাজারের সামনে পৌঁছে বসে ভিক্ষা চাইত। পিঠে কুঁজের মতো উঁচু কিছু ছিল।"

"মুখটা কীরকম?"

"খুব ছোট।"

সংহিতা আর কথা বাড়াল না। যা শুনল তাতে একটা ছবি তৈরি হচ্ছে বটে কিন্তু সেটা তার মনে ধরছে না।

দুটো টেলিফোন এল সাড়ে দশটা নাগাদ, পরপর।

প্রথমটা মিলার। বলল, "খুব রেগে গেছ নিশ্চয়ই?"

হাসল সংহিতা, "কী কারণে?"

"এই যে ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে রাতটা ডুব মারলাম

"বা রে! তুমি তো নাবালিকা নও, নিশ্চয়ই নিজের খারাপ হয় এমন কোনও কাজ করবে না। তা ছাড়া ড্রাইভারকে তো বলেই দিয়েছিলে রাত্রে ফিরবে না।"

"বাঃ! চমৎকার। এই জন্যে তোমাকে এত পছন্দ করি। আমি আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছোচ্ছি। একসঙ্গে লাঞ্চ করব। গেটে বলে রেখো।"

মিলা ফোন রাখতে না রাখতেই দ্বিতীয় ফোনটা এল। নম্বরটা দেখে একটু শান্ত হল সংহিতা। বোতাম চালু করে জানান দিল, "হ্যালো!"

"একটা ফোন করতে গিয়ে বুঝলাম তুমি ফোন করেছিলে। রাত্রে এটা সাইলেন্ট করে রেখেছিলাম বলে রিং শুনতে পাইনি। দুঃখিত।"

"ঠিক আছে।"

"তুমি নিশ্চয়ই কিছু বলতে চেয়েছিলে!"

"হ্যাঁ। তুমি টিকলির ব্যাপারে কথা বলেছিলে। জানি না আমাকে সেন্টিমেন্টালি এক্সপ্লয়েট করার জন্যে ওর নাম বলেছ কিনা! সেই চেষ্টা করলে বলব, ভুল করেছ। আমি যাকে চার-পাঁচ বছর বয়সে দেখেছিলাম তার সম্পর্কে কোনও উৎসাহ এতদিন পরে আমার থাকতে পারে না। ওর বয়স এখন নিশ্চয়ই তিরিশের আশেপাশে। এখন এই বয়সে সে আমার সম্পূর্ণ অচেনা। এটা তোমাকে জানাতে চেয়েছি।" সংহিতা বলল।

"ঠিকই। ওর বয়স এখন ওই রকমই। কিন্তু আমি ওকে ব্যবহার করে তোমাকে নরম করতে চাইনি। সত্যি বলতে কী, ওরও তোমাকে মনে রাখার কথা নয়। কিন্তু ওকে নিয়ে আমি যে-সমস্যায় পড়েছি তাতে কোনও পথ দেখতে পাচ্ছি না। তুমি একসময় ওকে খুব আদর করতে। ভাবলাম তুমি যদি কোনও পরামর্শ দিতে পারো—।"

"ও এখন তোমার কাছেই আছে?"

"হ্যাঁ। আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।"

"এই বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে গেছে?"

"না। বিয়ে হয়েছিল। সাত বছর হয়ে গেল।"

"তা হলে তোমার কাছে আছে কেন? শ্বশুরবাড়ি কোথায়?"

"হাওড়ায়।"

"সেখানে থাকছে না কেন?"

"ওর স্বামী এবং শাশুড়ি এখন জেলে আছে।"

"সে কী! কেন?"

"আমি তো সত্যি কথা নাও বলতে পারি। যে-বাড়িতে তুমি শেষবার এসেছিলে এখনও সেখানেই আছি। যদি নিজের চোখে সব দেখে যাও তা হলে বুঝতে পারবে আমি কেন তোমার সাহায্য চাইছি। রাখছি।" শেষ দিকে গলা ধরে এল জয়ব্রতর। বুকে হিমস্পর্শ লাগলেও সেটা ঝেড়ে ফেলতে

চাইল সংহিতা। এটা নিছক অভিনয়। একসময় যে-ভুল সে করেছিল সেটা আর করতে চায় না সে।

স্নান করতে ঢুকেও কথাগুলো পাক খাচ্ছিল মনে। এর আগে জয়ব্রত বলেছিল টিকলিকে সে মেরে ফেলতে পারছে না। মেরে ফেলার কথা উঠছে কেন? একজন মানুষ প্রেমিকার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে পারে, বিশ্বাস নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারে কিন্তু মেয়েকে মেরে ফেলার কথা ভাবতে পারে না। অভিনয়ের সংলাপ হিসেবেও নয়। যদি পারে তা হলে তার চেয়ে ঘৃণ্য জীব পৃথিবীতে নেই।

শাওয়ারের নীচে দাঁড়াতেই জল পড়ল শরীরে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপ কমে এল। শান্ত হয়ে গেল শরীর। না, তাকে বিনম্র, উদার এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। সেই বয়সে তার হারানোর ভয়ডর ছিল, শাশুড়ির অত্যাচারে বাড়ি থেকে বেরিয়েও তার যা হারায়নি, জয়ব্রতর বিশ্বাসঘাতকতা তাকে প্রায় নিঃস্ব করে দিচ্ছিল। শুধু পাগলের মতো একের পর এক ছবি এঁকে শেষপর্যন্ত স্থির হতে পেরেছিল সে। এখন এই বয়সে তো হারাবার কিছু নেই। কাপট্য বুঝতে পারলে নিঃশব্দে সরে আসতে পারে।

মিলা এল বারোটা নাগাদ। চুল উসকোখুসকো, চোখের তলায় কালি। মুখে ক্লান্তির ছাপ। সোফায় বসে সিক্তাকে বলল, "এক কাপ র' কফি, নো চিনি দুধ।"

সংহিতা বলল, "চেহারাটা বেশ খোলতাই হয়েছে।"

"আর বোলো না। বেশ অ্যাডভেঞ্চার করা হল।"

"কীরকম?"

"তুমি প্যাটকে চেনো? সুপ্রিয় পত্রনবীশ?"

"না।"

"তোমার অবশ্য চেনার কথা নয়। আর্ট কলেজে আমার এক বছরের জুনিয়র ছিল। কাল পার্ক স্ট্রিটে গিয়ে ভাবলাম কোনও বারে ঢুকে দু'পেগ খেয়ে নিই। একটা বারের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি সব টেবিল ভরতি। পাবলিক কথা বলে যাচ্ছে। ওরকম পরিবেশে বসে মদ খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আবার বাইরে বেরিয়ে আসতেই প্যাটের সঙ্গে দেখা। ওর সঙ্গে আর একজন ছিল। পাশের দোকান থেকে কিছু কিনে প্যাকেট করে নিয়ে

আসছিল। আমাকে দেখেই চেঁচামেচি। শুনলাম ওরা তখন মন্দারমণিতে যাচ্ছে। গাড়িতে প্যাটের বউ বসেছিল। আলাপ করিয়ে দিয়ে প্যাট বলল, চলো না। দুরন্ত যাওয়া হবে। আমরা সি-বিচে রাত কাটিয়ে ভোরে ফিরে আসব। প্যাটের বউ বলল, যে গাড়ি চালাবে সে কিন্তু ড্রিঙ্ক করবে না।"

প্যাট বা তার বন্ধু তখন রাজি হল না স্টিয়ারিং-এ বসতে। শেষপর্যন্ত প্যাটের বউ গাড়ি চালাল। ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার। আমরা তিন জন হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে আসা হু হু বাতাস খেতে খেতে রাত্রের হাইওয়ে ধরে যখন যাচ্ছিলাম তখন কী যে ভাল লাগছিল! মাঝখানে একটা ধাবায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে খাবার তুলে নেওয়া হল। তাই খেতে খেতে যখন সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেলাম তখন রাত দেড়টা। আমি শুনেছিলাম ওখানে নাকি সমুদ্র তেমন ঢেউ তোলে না। কিন্তু কাল রাত্রে বড় বড় ঢেউ উঠছিল, গর্জনও। আধমরা চাঁদ ছিল আকাশে, অস্পষ্ট হলেও দেখা যাচ্ছিল চারধার। কোনও মানুষ নেই। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। বালিতে বসে আমরা পান এবং ভোজন করতে লাগলাম। হঠাৎ প্যাট বলল, এক্সকিউজ মি, আমরা একটু ব্যক্তিগত আনন্দ এনজয় করে আসি। ওর স্ত্রীও স্বচ্ছন্দে চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে, স্বামীর সঙ্গে। আমার খুব মজা লাগল। বাঙালি তো বেশ স্মার্ট হয়ে গেছে! আগে ভাবা যেত, বলো?"

"তারপর?"

"আমার নেশা হয়ে যাচ্ছিল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলাম পা টলছে। প্যাটের বন্ধুকে বললাম, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি, আপনি একাই খান। সে কিছু বলল না। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল আমি শূন্যে ভাসছি। সংবিৎ সামান্য ফিরতে বুঝলাম লোকটা আমাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে হাঁটছে। কোনওরকমে প্রতিবাদ করলাম, এ কী! কী করছেন আপনি? আমাকে বালির ওপর শুইয়ে দিয়ে সে বলল, জলে ডুবে যেতেন। এখন জোয়ারের সময়। ঢেউ উঠে এসেছে ওপরে। আপনার প্যান্ট ভিজে গেছে। হাত বুলিয়ে সেটা বুঝতে পেরে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ। তারপর কোনওরকমে উঠে বসে দেখলাম সমুদ্র ক্রমশ বালির ওপর ছোবল মারছে। হঠাৎ তীব্র বাতাসের মধ্যে ছেলেটির গলা কানে এল, আমি একটা চুমু খেলে আপনি কি কিছু মনে করবেন?"

শোনামাত্র সংহিতার মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল, "সর্বনাশ!"

"না। আমার তখন তা আদৌ মনে হয়নি। উলটে খুশি হয়েছিলাম। কেন জানো? ওরকম নির্জন সমুদ্রসৈকতে মধ্যরাতে কোনও পুরুষ যদি আমাকে অত কাছে পেয়েও নির্লিপ্ত থাকত তা হলে জীবনে আয়নার সামনে দাঁড়াতাম না। মনে হত লোকটা আমাকে নারী বলে মনেই করে না। বলেছিলাম, একটা নয়, দুটো। তারপর আমি ঘুমোব আর আপনি আমাকে পাহারা দেবেন। একবার জল থেকে বাঁচিয়েছেন, এরপর অন্য বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে। সে হেসে বলেছিল, চুমুর বদলে এত কাজ করতে হবে? না করার স্বাধীনতা আপনার আছে। সে তখন আমাকে চুমু খেল। পর পর দু'বার। কিন্তু সেটা খাওয়ার সময় আমাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করল না, জড়িয়ে ধরা দূরের কথা। আমার তখন ইচ্ছে করছিল ও আমাকে জড়িয়ে ধরুক। কিন্তু আজ ফেরার সময় ভাবলাম, এই মানুষটা আলাদা।"

"কী নাম ওঁর?" সংহিতা জিজ্ঞাসা করল।

"প্যাট ওকে রায় বলে ডাকছিল। তালেগোলে আমি ওকে নাম জিজ্ঞাসা করিনি।"

"টেলিফোন নম্বর।"

"নাঃ।"

"সে কী! একটা লোকের সঙ্গে সারারাত কাটালে, তাকে চুমু খেতে অ্যালাউ করলে অথচ তার নামটা জানলে না?"

"ইট ওয়াজ নট ইম্পর্টেন্ট, অন্তত সেই সময়ে নয়। বিশ্বাস করো, এই জীবনে কত ছেলে আমাকে চুমু খেয়েছে চট করে বলতে পারব না, কালকের ব্যাপারটা আমি কোনওদিনই ভুলতে পারব না। ফ্যান্টাস্টিক।" মিলা চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল।

"ঠিক আছে। ওর হদিশ নিশ্চয়ই তোমার ওই প্যাটের কাছেই পেয়ে যাবে।"

"প্যাট? ও এখন কোথায় চাকরি করে, কোন ফ্ল্যাটে থাকে তার কিছুই জানি না।"

"তুমি একটা আস্ত পাগল!"

"তাই মনে হচ্ছে। বাট আই অ্যাম হ্যাপি টুডে।"

"সেটা তোমার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।"

সিক্তা এক কাপ কফি নিয়ে এল। মিলা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি?"

"এই সময় আমি কফি বা চা খাই না।" সংহিতা সিক্তার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, "আচ্ছা মিলা, চুমু খাওয়ার ব্যাপারে তোমার মত বেশ উদার, তাই তো?"

"মোটেই না। যাকে দেখে আমার ভাল লাগে না সে দেখতে যত সুপুরুষ হোক না কেন আমি অ্যালাউ করব না।" মিলা কফিতে চুমুক দিল।

"তা হলে এই যে বললে এই জীবনে কত ছেলে তোমাকে চুমু খেয়েছে, সবাইকে তোমার ভাল লেগেছিল?"

"অফকোর্স।" মিলা বলল, "তুমিই বলো, একজনকে ভাল লাগল বলে আর কাউকে ভাল লাগলে বলতে পারব না?"

"তা বটে। মিলা, তুমি পরলোকে বিশ্বাস করো?"

"নো, নট অ্যাট অল।"

"বাঃ।" মাথা নাড়ল সংহিতা।

"এই একটা জীবনেই আমি সবক'টা লোকে থেকে যেতে চাই।"

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আঁকাআঁকির কী খবর?"

"এক মাস স্রেফ আড্ডা মারব, যা ইচ্ছে তাই করব। বাকি এগারো মাস ভোর থেকে রাত উৎপাদন করা, এগজিবিশনের জন্যে সময় দেওয়া, ওসব এখন ভাবতে চাইছি না। আচ্ছা, তুমি দেখছি এখন এই ফ্ল্যাটে একা আছ, কেন?"

"অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। বেশ আছি।"

"তা তো দেখছি। তোমার যা চেহারা, যা বয়স তাতে তো সঙ্গীর অভাব অনুভব করা উচিত। কেউ প্রেমে পড়েনি নিশ্চয়ই বলবে না।" মিলা হাসল।

"সরাসরি কেউ এসে বলেনি, তবে ইঙ্গিত দিয়েছে কেউ কেউ!"

"তুমি অ্যাকসেপ্ট করোনি?"

"দেখতেই পাচ্ছ।"

"কেন?"

"ইচ্ছেই হয়নি।"

"এখনও জয়ব্রতবাবুর স্মৃতি নিয়ে রয়েছ।"

"দুর। ওসব কথা কবে ভুলে গিয়েছিলাম।"

"গিয়েছিলাম মানে?"

"যখন জয়ব্রতর প্রেমে পড়েছিলাম তখন কুড়ির কোঠায় বয়স ছিল। ওটা এমন বয়স যে, মনে হত প্রেমের জন্যে এক লক্ষ কিলোমিটার হেঁটে যাওয়া যায়! ব্যাপারটাকে অনেকেই বোকামি বলে থাকেন কিন্তু আমি বলি না। ওই যে আবেগ, ওই যে বুকের ভেতর চাপ জড়ানো উন্মাদনা, প্রেম ছাড়া অন্য কিছুতে তৈরি হয় না। ওই সময় মানুষ বড় উদার হয়ে যায়। তাই দুঃখ পেলে, প্রতারিত হলে তার প্রতিক্রিয়া খুব মারাত্মক হয়ে যায় কারও কারও ক্ষেত্রে। সুতরাং আমি মনে করি জীবনে ওই পর্ব না এলে একটা বিশাল দিক অজানা থেকে যায়।" সংহিতা বলল।

"হুঁ। প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রেই বোধহয় এটা হয়ে থাকে।"

"দ্বিতীয়বারের অভিজ্ঞতা হয়নি তাই বলতে পারব না। আমি সরে এসেছি তখন, নিজেকে শেষ না করে কাজে ডুবে গিয়ে দেখলাম মনের ভেতরে আর কোনও হতাশা নেই। আর রক্ত ঝরছে না। যখনই ছবি শেষ করি তখনই মনে হয় ভাগ্যিস প্রতারিত হয়েছিলাম নইলে এই ছবি আঁকতে পারতাম না!"

"কিন্তু তোমার শরীর? তার চাহিদা নেই?"

"এক ভদ্রলোক আমাকে শিখিয়েছেন ওসব থেকে উত্তরিত হতে।"

"তাই বলো। তোমার খুব ভাল বন্ধু?"

"নিশ্চয়ই।"

"অথচ প্রেমিক নন!"

"সুযোগ পাননি।"

"আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"কবে দেবে? আজই দাও না!" উৎসাহিত হল মিলা।

"আজ যে আমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে মিলা!"

"কোথায়?"

"এমন একটা জায়গা যার সম্পর্কে তোমার খুব খারাপ ধারণা আছে, কিন্তু বহু বছর পরে জায়গাটা পালটাল কিনা তা তোমার জানা নেই। সেখানে গিয়ে দেখলে ধারণাটা পালটাতে পারে আবার একই থেকে যাবে। একই থেকে গেলে ভবিষ্যতে আর যাওয়ার দরকার হবে না। আমাকে সেরকম জায়গায় যেতে হবে।"

"খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে হচ্ছে।"

"আমার কাছে তেমন গুরুত্ব ছিল না। ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু একটা বিশেষ কারণে আজ গুরুত্ব দিতেই হচ্ছে।"

"কী কারণ?"

"সেটা এখনই বলতে পারছি না ভাই।"

"আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি?"

"আজ থাক। যদি বুঝি তোমাকে নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ আবার যদি আমার প্রয়োজন হয় তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে নিয়ে যাব।"

"সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ো কিন্তু।"

গাড়ির পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল সংহিতা। জয়ব্রতর বাড়িতে যখন শেষবার গিয়েছিল সে তখন তার গাড়ি ছিল না। আজ ড্রাইভারকে বলে দিয়েছিল কোন পথে যেতে হবে। বহু বছর এই এলাকায় সে আসেনি। কলকাতার প্রায় উপকণ্ঠের সেই চেহারা এখন অনেক বদলে গিয়েছে। অনেক নতুন বাড়ি, দোকান, চওড়া রাস্তা জায়গাটাকে তার কাছে প্রায় অচেনা করে দিয়েছে। একটা মোড়ের কাছে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, "এবার কোন দিকে যাব?"

রাস্তাটার নাম বলে সংহিতা জানাল, "বত্রিশ বাই এক নম্বর বাড়িটা খোঁজো।"

পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে রাস্তা ধরে একটু এগোতেই বাড়িটাকে চিনতে পারল সংহিতা। দোতলা বাড়িটায় যে কত বছর চুন বা রং পড়েনি তা ঈশ্বর জানেন। যে-চেহারায় দেখে গিয়েছিল প্রায় সেই চেহারাতেই রয়েছে। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল সংহিতা। বাড়ির একতলার দরজা-জানলা বন্ধ। দোতলার একটা জানলা খোলা। মাত্র দেড় কাঠা জমিতে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল।

দরজার পাশে বেলের বোতাম টিপল সংহিতা। সে লক্ষ করল ওই বেলটিরও বদল হয়নি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দ্বিতীয়বার বোতাম টিপল সে। এবার একটি মহিলাকণ্ঠ জানতে চাইল, "কে?"

"আমি! জয়ব্রতবাবু আছেন?"

এবার দরজা খুলল এক প্রৌঢ়া। খুব রোগা, খাটো চেহারা। মাথা নেড়ে বলল, "বাবু বাড়িতে নেই, ডাক্তারের কাছে গেছেন!"

"কখন ফিরবেন তা বলে গেছেন?"

"মেয়েকে একা রেখে বাবু বেশিক্ষণ বাইরে থাকেন না। আপনি কে?"

সংহিতা একটু ভাবল, "আমি এই বাড়িতে এককালে আসতাম। জয়ব্রতবাবু আমাকে ফোন করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন এখানে আসার জন্যে।"

"ও!" প্রৌঢ়া ঠিক বুঝতে পারছিল না।

"টিকলি কোথায়?"

"ওপরের ঘরে।"

"ওর সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি!"

"ও কারও সামনে বের হয় না। আপনি যদি দেখতে চান তা হলে কথা বলবেন না, দেখেই চলে আসবেন। আসুন।" সংহিতা ভেতরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করল প্রৌঢ়া।

একতলার বসার ঘরটা একদম আগের মতো আছে। এতগুলো বছরেও চেয়ারগুলো বদলায়নি। সেই ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে সংহিতা বলল, "ওকে বলুন সংহিতামাসি এসেছে। আমার নাম শুনলে বোধহয় আসতে রাজি হবে। আমি এই ঘরে বসছি।"

"না। আসতে পারবে না। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

কিছুটা অবাক, কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে দোতলায় উঠল সংহিতা। বারংবার মনে হচ্ছিল সময় এই বাড়িতে থেমে গেছে। এত বছরে একটুও এগোয়নি। বাড়ির দেওয়ালে রঙের প্রলেপ শেষ কবে পড়েছিল বোঝাই যাচ্ছে না।

একটা দরজার কাছে গিয়ে ঠোঁটে আঙুল চেপে কথা বলতে নিষেধ করল প্রৌঢ়া। তারপর দরজায় শব্দ করে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে একটি সরু নারীকণ্ঠ শুনতে পেল সংহিতা, "মাসি!"

প্রৌঢ়া জবাব দিল, "হ্যাঁ গো।"

"কে বেল বাজাল? বাবা?"

"না না। উটকো লোক।"

"দু'বার বাজিয়েছিল, না?"

"হ্যাঁ। দুধ এনে দিই?"

"না।"

"কেন?"

"আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

সরু কণ্ঠস্বর প্রায় বালিকার মতো। টিকলির এখন যা বয়স তাতে এরকম গলার স্বর খুবই অস্বাভাবিক। সংহিতা কয়েক পা এগিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। ফলে এই বিকেলেই একটা আলো জ্বালাতে হয়েছে। ঘরের প্রান্তের খাটে বসে আছে যে তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। মুখে হাত চাপা দিল বিস্ফারিত চোখে।

দুটো বালিশে হেলান দিয়ে বসা শরীরটার কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত সবুজ নাইটিতে, যা প্রায় আলখাল্লার মতো দেখতে, ঢাকা রয়েছে। মাথায় ওই রঙের বড় রুমাল বাঁধা থাকায় চুল আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। দুটো পা সামনের দিকে ছড়ানো যা নাইটির আড়ালে রয়েছে। চোখ দুটো কালো চশমার আড়ালে।

"অনেকক্ষণ বসে আছ এবার একটু শোও।"

"আমার হিসু পেয়েছে!"

"দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।" বলে প্রৌঢ়া দরজার দিকে তাকাল। সংহিতা দ্রুত সরে এল সেখান থেকে। দ্রুত নীচে নামতে গিয়ে সতর্ক হল যাতে শব্দ না হয়। নীচের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে থাকল সে কিছুক্ষণ। এ কী দেখল সে? সেই টিকলি, যে এ-বাড়িতে এলেই ছোট্ট হাত দুটো দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরত, যাকে দেখলে সে হেসে বলত, বড় হলে তুই কত ছেলেকে যে পাগল করে দিবি কে জানে, সে-ই মেয়ে ওই পোশাকে কালো চশমা পরে ঘরের মধ্যে বসে আছে? কেন? শরীরের কোথাও কোনও নাড়াচাড়া নেই, মনে হচ্ছে একটা বালির বস্তা পড়ে আছে। আকৃতিও বড় হয়ে গেছে প্রচুর।

কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না সংহিতা। চলে যাবে? তখনই মনে হল জয়ব্রত যে টিকলিকে নিয়ে সমস্যার কথা বলেছিল সেটা মিথ্যে নয়। মেয়ের ব্যাপারে মিথ্যে বলেনি বাবা। তারপরেই মেরুদণ্ড কনকন করে উঠল সংহিতার। এক লহমার জন্যে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি, কাঁটা ফুটল। গত রাতে স্বপ্নে যে-বিকৃত চেহারার স্ত্রীলোকটিকে সে দেখেছিল, যার হাঁটার ক্ষমতা ছিল না, সে নিজের নাম বলেছিল, টিকলি। এই টিকলি যে ওপরের ঘরে সমস্ত শরীর, মাথা, চোখ ঢেকে বসে আছে তার এই অবস্থা তো সে কখনওই কল্পনা করেনি। মানুষ যা ভাবে তাই স্বপ্নে ঘুরে আসে, এই কথাটা এক্ষেত্রে আদৌ সত্যি নয়। তা হলে এরকম মিল হল কী করে! হ্যাঁ, সেই টিকলির শরীর বিকৃত ছিল,

পিঠে কুঁজ ছিল, এই টিকলির তা নেই। কিন্তু একেও তো প্রতিবন্ধী বলেই মনে হচ্ছে।

"আপনি কি এখানেই বসবেন?"

মুখ তুলে সংহিতা দেখল প্রৌঢ়া দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, "ওর কী হয়েছে?"

"আপনি শোনেননি?"

"না!"

"বিয়ের শাস্তি পেয়েছে।"

"মানে?"

"স্বামী আর শাশুড়ি মিলে ওর মাথায় শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল। চিৎকার শুনে পাড়ার লোকে ছুটে গিয়ে হাসপাতালে ভরতি করে।"

"সে কী!" চোখ বড় হয়ে গেল সংহিতার।

"মানুষ না, শয়তানেরও অধম। তেনারা পালিয়ে গিয়েছিলেন। পাড়ার লোকজন বাড়িটাকে ভাঙে। শেষে পুলিশ ওদের ধরে। জজসাহেব সারাজীবন জেলে থাকার হুকুম দিয়েছেন। কী হবে তাতে? ও তো কোনওদিন দেখতে পাবে না, হাঁটতেও পারবে না।" প্রৌঢ়া আঁচলে চোখ মুছল।

এই সময় বেল বাজল। প্রৌঢ়া দ্রুত চলে গেল দরজা খুলতে। নিচু গলায় তাকে কিছু বলল প্রৌঢ়া। তারপরেই দরজায় যাকে দেখল তাকে রাস্তায় দেখলে জয়ব্রত বলে চিনতে পারত না। মাথা প্রায় নেড়া। গায়ের রং কালচে। শরীর এত রোগা হয়ে গেছে যে, কাঁধ দুটোকে পাঞ্জাবির হ্যাঙার বলে মনে হচ্ছে। গালের দু'পাশ বসে গেছে।

সংহিতার মনে হল, এই মানুষটিকে সে চেনে না।

জয়ব্রত ম্লান হাসি হাসল। তারপর বলল, "অনেক ধন্যবাদ, শেষপর্যন্ত এলে।" কথাগুলো বলে উলটোদিকের চেয়ারে সে বসল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি প্রায় আগের মতো রয়েছ।"

"আগের মতন কেউ চিরকাল থাকতে পারে না। প্রায় তিন দশক তো এমনি এমনি চলে যায় না। কিন্তু তোমার চেহারা এরকম হল কেন? এই পরিবর্তন তো স্বাভাবিক নয়।" বেশ কেটে কেটে কথাগুলো বলল সংহিতা।

"আমার কথা ছেড়ে দাও।" হাত নাড়ল জয়ব্রত।

"ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে শুনলাম।"

"হ্যাঁ। ওটা রুটিন ব্যাপার। তুমি ওপরে গিয়েছিলে?"

"গিয়েছিলাম। ওই পাশবিক কাজ ওরা কেন করল?"

"টাকার জন্যে। বিয়েতে যৌতুক নেয়নি। চাইলে বিয়ে দিতাম না ওখানে। কিন্তু বিয়ের তিন মাস পরেই টাকা চাওয়া শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে দশ হাজার, বিশ হাজার। মেয়েটা এসে কান্নাকাটি করত বলে দিতাম। কিন্তু আমার সাধ্য যে বেশি নয় তা জেনেও ওরা দু'লক্ষ চাইল। দিতে পারিনি। এই জন্যে অত্যাচার করত খুব। যেদিন মেয়ে প্রতিবাদ করল, থানায় গিয়ে নালিশ করবে বলল সেদিন অ্যাসিড ঢেলে ওকে স্তব্ধ করে দিতে চাইল। প্রতিবেশীরা ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছিল বলে শেষপর্যন্ত প্রাণটা থেকে গিয়েছে। আইন ওদের ঠিক শাস্তি দিয়েছে কিন্তু ওর কথা ভেবে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।" করুণ গলায় বলল জয়ব্রত।

"ওর চিন্তাতেই কি শরীরের এমন অবস্থা হয়েছে?"

"না-না।"

"এখন ও হাঁটতে পারছে না?"

"না। দুটো পা জুড়ে গেছে।"

"ডাক্তার কী বলছে? নিশ্চয়ই এর চিকিৎসা আছে!"

"প্রাণরক্ষা হয়ে যাওয়ার পর আর আমি চিকিৎসা করাতে পারিনি।"

"সে কী?"

"যা ছিল ওকে বাঁচাতেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন সার্জারিতে ওর শরীর আবার আগের আদল ফিরে পাবে। বেশ কয়েকবার সেটা করাতে হবে। আমার পক্ষে তার ব্যয় বহন করা সম্ভব ছিল না।"

"তাই বলে মেয়েটাকে ওইভাবে বাড়িতে ফেলে রাখা হবে?"

"এতদিন তাই তো ছিল, কিন্তু এর পরে কী হবে তাই ভেবে পাচ্ছি না। সংহিতা, আমি তিন দশক তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি। কখনও ফোন পর্যন্ত করিনি। পেন্টার হিসেবে তোমার আজকের যে-খ্যাতি তার প্রতিটি স্তর আমি জানি কিন্তু কখনও তোমার এগজিবিশনে যাইনি। লজ্জায় সংকোচে আমি দূরেই থেকে গিয়েছি। এখন সামনে পিছনে কোথাও যাওয়ার পথ নেই। তোমার সঙ্গে যা করেছি তার পরেও আজ পরামর্শ চাওয়া মোটেই শোভন নয়। তবু শেষপর্যন্ত বাধ্য হলাম ফোন করতে।" দু'হাতে মুখ ঢাকল জয়ব্রত।

"চিকিৎসা যখন বন্ধ তখন রুটিন মতো ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে কেন? আমি স্পষ্ট কথা শুনতে চাই, অবশ্য সেটা বলতে যদি অসুবিধে না হয়।"

"আমি টিকলির জন্যে ডাক্তারের কাছে যাইনি।"

সংহিতার কপালে ভাঁজ পড়ল।

"আমার সময় খুব কম। অসুখটা যখন ধরা পড়েছিল তখন চিকিৎসা করাতে গিয়ে খরচের পরিমাণ যা শুনলাম তা আমার সাধ্যের বাইরে। ওই টাকা থাকলে তো টিকলির চিকিৎসা করাতে পারতাম। তবু ধার করে, স্কুল থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে নিজের চিকিৎসা করাতে পারতাম কিন্তু জানলাম তাতে যে সম্পূর্ণ সুস্থ হব তা কেউ সঠিক বলতে পারল না। তাই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের কাছে গেলাম। ভাল ডাক্তার। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসা অ্যালাপ্যাথিতে করিয়ে তারপর নিজের ওষুধ দেওয়া শুরু করলেন। ওষুধে কাজ হয়নি বলব না, কিন্তু ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা কমে আসছে। প্রত্যেক দশ দিনে একবার তাঁর কাছে যেতে হয়। রুটিন ব্যাপার। এখন একটাই প্রশ্ন, আমি চলে গেলে মেয়েটার কী হবে? আমি যদি ওকে মেরে ফেলতে পারতাম তা হলে নিশ্চিন্ত হতাম। আমি চলে যাওয়ার পর ওই ঘরে না খেয়ে একসময় ও মারা যাবে। সেটা ভাবলেই ছটফট করে উঠি। কিন্তু বাবা হয়ে মেয়েকে মারব কী করে! ওর সমস্ত শরীর যখন অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিল তখন মাসের পর মাস আমি ওর পাশে থেকে যে-সেবা করেছিলাম তা কি একদিন মেরে ফেলব বলে?" হাঁ করে শ্বাস নিল জয়ব্রত।

"হোমিওপ্যাথির ডাক্তার কোথায় থাকেন?"

"কেন?"

"এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।"

পকেট থেকে একটা ছোট্ট প্যাকেট বের করল জয়ব্রত। প্যাকেট থেকে ছোট পুরিয়াগুলো বের করে পকেটে রেখে ওটা এগিয়ে দিল সংহিতার দিকে।

প্যাকেটের গায়ে লেখা ঠিকানা পড়ে উঠে দাঁড়াল সংহিতা, "আমি আজ আসছি।"

জয়ব্রত দাঁড়াল, "টিকলির সঙ্গে কথা বলেছ?"

"না। তার আমাকে মনে রাখার কোনও কারণ নেই। আসছি।"

বাইরে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে ঠিকানাটা দিল সংহিতা। মিনিট পনেরো পরে কয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ডাক্তারের চেম্বার পাওয়া গেল। সংহিতা দেখল অনেক মানুষ ডাক্তারের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। শুনতে পেল, অ্যাপয়ন্টমেন্ট না করে এলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। বোঝাই যাচ্ছিল, ডাক্তারের চাহিদা আছে।

শেষপর্যন্ত সে ব্যাগ থেকে মোবাইল ফোন বের করে প্যাকেটের ওপর লেখা ফোন নম্বরটায় ডায়াল করল। কিছুক্ষণ বেজে যাওয়ার পর সাড়া পাওয়া যেতেই সংহিতা বলল, "নমস্কার। ডাক্তারবাবু বলছেন?"

"বলছি।"

"আমি একজন চিত্রশিল্পী। আমার নাম সংহিতা। আমি কোনও অসুস্থতার কারণে আপনার কাছে আসিনি। কিন্তু তার চেয়ে জরুরি কথা জানতে চাই। যদি দুই কি তিন মিনিট সময় দেন তা হলে কৃতার্থ হব।"

"আপনি কোথায় আছেন এখন?"

"আপনার চেম্বারের সামনে।"

"আপনি সোজা ভেতরে ঢুকে আমার অ্যাসিস্টেন্টকে নামটা বলুন।"

মোবাইল অফ করে একটু অপেক্ষার পরে পেশেন্টদের সামনে দিয়ে এগিয়ে সে দেখল একজন খাতায় কিছু লিখছেন। তাঁকে নাম বলতেই বললেন, "এখানে একটু দাঁড়ান, পেশেন্ট বেরিয়ে গেলে ঢুকবেন।"

সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষায় থাকা মানুষেরা গুঞ্জন শুরু করল কিন্তু লোকটি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। মিনিট সাতেক পরে এক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা ভেতর থেকে বের হতেই লোকটি তাকে ইশারা করল ভেতরে যেতে।

ডাক্তার বেশ প্রবীণ। তাঁকে নমস্কার করল সে, "আমি সংহিতা।"

"সমস্যাটা কী?"

ওষুধের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল সংহিতা, "এই ভদ্রলোক আপনার কাছে চিকিৎসায় আছেন। দীর্ঘদিন পরে আমি তাঁকে দেখলাম। উনি বলেছেন ওঁর জীবন শেষ হয়ে আসছে। ঠিক কী হয়েছে ওঁর? আজ আপনার কাছে এসেছিলেন তিনি।"

ডান দিকে রাখা লম্বা খাতা খুলে প্যাকেটের নম্বরের সঙ্গে খাতায় লেখা নম্বর মিলিয়ে মাথা নাড়লেন ডাক্তার, "আপনি ওঁর কে হন?"

"সেটা না জানলে কি আপনার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়?" সংহিতা হাসল।

"ঠিক আছে। উনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। এখনও করছি। এখন মনে হচ্ছে হেরে যেতে হবে। সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছে।"

ঠোঁট কামড়াল সংহিতা। তারপর মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল চেম্বার থেকে।

বাড়ির দিকে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল ড্রাইভার। চোখ বন্ধ করে বসেছিল সংহিতা। স্পষ্ট হয়ে গেল দৃশ্যটা। প্রচণ্ড খেপে গিয়ে সে আঙুল তুলে বলেছিল জয়ব্রতকে, "তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার সততা নিয়ে তুমি ছেলেখেলা করেছ, তার ফল তোমাকে ভুগতে হবে।" জয়ব্রত উত্তর না দিয়ে মুখ অন্য পাশে ফিরিয়েছিল। তাতে আরও খেপে গিয়েছিল সে, "জবাব দাও। তুমি— তুমি— বিশ্বাসঘাতক, শয়তান। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তোমার ভাল হবে না।"

সংলাপটি মনে পড়ামাত্র কেঁপে উঠল সংহিতা। চোখ খুলে ছুটন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তা দেখল কয়েক মুহূর্ত। হ্যাঁ, এই কথাগুলো বলেছিল সে, কিন্তু কোনও অভিশাপ উচ্চারণ করেনি ওই সর্বনাশ হয়ে যাবে ছাড়া। তা ছাড়া এই যুগে কেউ অভিশাপ দিলে কারও খারাপ হয়? অপমানিত হয়ে রাগের ঝোঁকে যেসব শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে সেগুলো যদি অভিশাপ হয়ে সত্যি ক্ষতি করে তা হলে ভাবতে হবে আমরা এখনও সত্যযুগে আছি। কিন্তু আজ যা দেখে এল তার চেয়ে সর্বনাশ মানুষের কী হতে পারে!

অভিশাপ সত্যি হোক বা না হোক, আজ খুব খারাপ লাগছিল তার। জয়ব্রত তার সঙ্গে যা করেছিল তা নিশ্চয়ই খুব অন্যায় কিন্তু তার জবাবে সে নিজেও তো কম অন্যায় করেনি। রেগে গিয়ে যা বলেছিল তাই তো সত্যি হয়ে গেল। অবশ্য সে কথাগুলো না বললেও হয়তো ওর এই অবস্থা হত, কিন্তু কে জানে, না-ও হতে পারত। একটা অনুশোচনাবোধ তিরতির করে মনের ভেতর ঢুকে পড়ছিল। সেটাকে কাটাতে সোজা হয়ে বসল সংহিতা। সে সেদিন জয়ব্রতকে অভিশাপ দিয়েছিল, টিকলিকে নয়। টিকলি তো কোনও অন্যায় করেনি। তা হলে বেচারা এমন শাস্তি কেন পেল?

"যারা অনুশোচনা করে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করেন। যে ক্ষমা করে দেয় সে

বীরের কাজ করে।" স্বপ্নে শোনা আকাশবাণী চলকে উঠল মনে। ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল সংহিতা। আর তখনই মোবাইলটা শব্দ করল। ওটাকে অন করে হ্যালো বলতেই সে শুনতে পেল, "সংহিতা, আমি মিসেস কপুর বলছি। কেমন আছেন?"

নীরবে হাসল সংহিতা। জবাব না দিয়ে বলল, "কী ব্যাপার, বলুন!"

"হ্যাঁ, গতকাল বিকেলে ডক্টর মালহোত্রা এসেছিলেন এখানে। যে ছবিগুলো লাস্ট এগজিবিশনে বিক্রি হয়নি সেগুলো প্যাক করতে আমার লোক ব্যস্ত ছিল। ডক্টর তাঁর মধ্যে থেকে আপনার ওই—এ বিউটিফুল মর্নিং, ছবিটি খুব পছন্দ করে ফেলেন। আপনার রাখা প্রাইস ওঁকে বলা হয়েছিল। একটু আগে উনি কনফার্ম করলেন, কিনবেন। কিন্তু কেনার সময় আপনার সঙ্গে ছবি তুলতে চান।"

প্রস্তাবটা নাকচ করতে গিয়েও সামলে নিল সংহিতা। যে-লোক আট লাখ টাকা দিয়ে ছবি কিনবে সে যদি শিল্পীর সঙ্গে ফটো তুলতে চায় তা হলে আপত্তি করা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আজকাল ছবির ক্রেতারা অনেক সাবধান হয়ে গেছে। নামী শিল্পীর আঁকা ছবি জাল হচ্ছে। পরে বিক্রি করতে গিয়ে প্রমাণ করা যাচ্ছে না ছবিটা অরিজিন্যাল না কপি! শিল্পীর স্বাক্ষর ছাড়াও ডিক্লেরাশন দিতে হচ্ছে। ছবির পিছনে শিল্পীর পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তুললে সেটাকেও ডকুমেন্ট হিসেবে কেউ রাখতে চাইছে।

"ঠিক আছে মিসেস কপুর। সময়টা বলে দেবেন।"

"আপনি এখন কোথায়? এখানে আসা কি সম্ভব হবে?"

"ভদ্রলোক কি ওখানে আছেন?"

"বলেছেন ফোন পেলেই চলে আসবেন।"

"আপনি ফোন করুন, আমি আসছি।"

গ্যালারিতে যখন পৌঁছোল সংহিতা তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। বেশ বড় গ্যালারি। এই শহরে তো বটেই, বাইরের শহরগুলোতেও মিসেস কপুরের সম্পন্ন কাস্টমারের সংখ্যা অনেক। মিসেস কপুর তাকে খাতির করে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। দারুণ সাজানো এই গ্যালারি এবং অফিসঘর। চা বা ঠান্ডার প্রস্তাব নাকচ করল সংহিতা। মিসেস কপুর বললেন, "আপনি বলেছিলেন এবার নতুন ছবির এগজিবিশন করা যেতে পারে। কবে করতে চান?"

"এখনই না। আরও কিছুদিন—।"

"দেখবেন, অন্য গ্যালারি যেন সুযোগটা না পেয়ে যায়!" হাসলেন মিসেস কপুর।

জবাবে আলতো হাসল সংহিতা। উত্তর দিল না। অভিজ্ঞতা তাকে এইভাবে এড়িয়ে যেতে শিখিয়েছে।

এই সময় বাইরে থেকে গলা ভেসে এল, "আসতে পারি?"

মিসেস কপুর উঠে দাঁড়ালেন, "আসুন, প্লিজ।"

সংহিতা দেখল বেশ প্রবীণ মানুষটি, মাথার আশি ভাগ টাক, ফরসা, ঘরে ঢুকে হাতজোড় করলেন। সংহিতাকে উঠতে হল নমস্কার ফিরিয়ে দিতে।

মিসেস কপুর বললেন, "বসুন, কী দিতে বলব? ঠান্ডা না গরম?"

ডাক্তার মালহোত্রা মাথা নাড়লেন, "অনেক ধন্যবাদ, আমাকে এখনই ছুটতে হবে। একটা সময়সাপেক্ষ অপারেশন করতে হবে।" তারপর সংহিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ছবিটি খুব ভাল লেগেছে। দেখলেই ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি। আগে আমি ছবি কিনেছি কয়েকটা। কিন্তু এখন নাকি কিনলেই হয় না, ছবিটা যে আইনসম্মতভাবে নিচ্ছি তার প্রমাণও রাখতে হয়।"

মিসেস কপুর বললেন, "হ্যাঁ। খুব জালিয়াতি হচ্ছে। ভাল আঁকেন এমন কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা কপি করলে বুঝতেই পারবেন না আপনি।"

সংহিতার আঁকা ছবির পিছনে ওঁরা তিন জন দাঁড়ালে ফটোগ্রাফার ফটো তুললেন। মালহোত্রা বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে ভাল লাগত কিন্তু বুঝতেই পারছেন—!"

"অপারেশনটা কী ধরনের?"

"এই পেশেন্টের গাম-এ ক্যান্সার হয়েছিল। মুখের অনেকটা অপারেট করে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেটা দেড় বছর আগে। কিন্তু তার ফলে মুখের চেহারা বীভৎস হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না। আমি চেষ্টা করব মুখটাকে নর্মাল চেহারায় ফিরিয়ে দিতে। একবারে হবে না, শেষ করতে মাস ন'য়েক লেগে যাবে।"

সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সঙ্গে কার্ড আছে?"

"নো। কেন বলুন তো?"

"আমি যদি একজন পেশেন্টকে আপনার কাছে নিয়ে যেতে চাই!"

"মিসেস কপুর আমার নাড়িনক্ষত্র জানেন। ওঁকে বললেই—!"

"নো ডক্টর।" মিসেস কপুর মাথা নাড়লেন, "আপনার অ্যাপয়ন্টমেন্ট চার মাসের আগে পাওয়া যায় না।"

"সাধারণত তাই। আমি সারাদিনে চারজনের বেশি পেশেন্ট দেখি না। কিন্তু যে-শিল্পীর ছবি আমাকে খুশিতে রাখবে তিনি চাইলে আমি পরের দিনই সময় দেব। আচ্ছা, চলি। ওহো, মিসেস কপুর চেকটা পেয়েছেন নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ। থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর।" মিসেস কপুর বললেন।

আজ যে মিলা হুইস্কির বোতল ব্যাগে ভরে এনেছিল তা বুঝতে পারেনি সংহিতা। সন্ধে পেরিয়ে বাড়ি ফিরেই মাছ ভাজার গন্ধ নাকে পেল। সিক্তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে জানাল, "নতুনদিদি বললেন কিছু একটা ভেজে দিতে, তাই—!"

বসার ঘরে টিভি চলছে। অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড। সোফায় বাবু হয়ে বসে মিলা টিভির দিকে তাকিয়েছিল, ঘরে ঢুকতেই সে হাত নেড়ে বসতে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক ব্যাপার। ওই দেখো, ছোট্ট গর্তটায় থিকথিক করছিল ব্যাঙাচি। জল শুকিয়ে আসছে দেখে মা ব্যাং লাফিয়ে চলে গেল দশ ফুট মাটি ডিঙিয়ে পাশের বড় পুকুরে। জল না থাকলে ব্যাঙাচিগুলো মরে যাবে বলে ব্যাংটা পিছনের দুটো পা দিয়ে ক্রমাগত নালা কেটে চলেছে। দেখো।"

সংহিতা দেখল। ছোট্ট গর্তের জল প্রায় শুকনো। বড় ব্যাংটা একটুও না থেমে মাটির ভেতরে নালা তৈরি করতে করতে শেষপর্যন্ত গর্তে পৌঁছে যেতেই পুকুরের জল হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল গর্তে। ব্যাঙাচিগুলো প্রাণ বেঁচে যাওয়ার আনন্দে লাফাতে লাগল। কেউ কেউ নালার জল বেয়ে চলে গেল পুকুরে।

সংহিতা মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "দারুণ।"

মিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "একটা ব্যাঙের মনেও যে সন্তানদের জন্যে এত স্নেহ রয়েছে না দেখলে ভাবতে পারতাম না। এ ব্যাপারে প্রাণীরা মানুষের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। একটু খাবে?"

মিলার সামনের টেবিলে হুইস্কির বোতল এবং গ্লাস রয়েছে।

সংহিতা মাথা নাড়ল, "নাঃ। দু'-একবার খেয়ে দেখেছি, রাত্রে ঘুম হয় না, মাথা ধরে। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে কোনও লাভ নেই। তুমি খাও।" সংহিতা বসল।

টিভি বন্ধ করে মিলা জিজ্ঞাসা করল, "কী হল? এত সময় লাগল?"

একটু ভাবল সংহিতা। বুকের ভেতর যে-ভারটা জন্মেছিল সেটা একটু একটু করে বেড়ে চলেছে। তার একার পক্ষে তাকে বহন করতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু মিলা তো জীবনকে দেখে তাৎক্ষণিকের চোখে। কোনও কিছুকেই ও গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না। তারপরেই মনে হল, কিন্তু মিলা ছবি আঁকে। ওর ছবি তো ঠিক উলটো কথা বলে। তা হলে!

"তোমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে আমি শুনতে চাই।"

কথা বলল সংহিতা, "বহু বছর আগে, আমার ডিভোর্সের কয়েক মাস পরে আমি একজনের সংস্পর্শে এসেছিলাম, ভালবেসেছিলাম। সে-ও তখন ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে একা, স্ত্রী চলে গেছেন। কিন্তু আমি প্রতারিত হয়েছিলাম। সেসব গল্প এখন অবান্তর। সেসময় নিজেকে সামলাতে পারিনি। তাকে গালমন্দ করেছিলাম, অভিশাপ দিয়েছিলাম, একদিন সর্বনাশ হয়ে যাবে তারও। তারপর প্রায় তিন দশক কোনও সম্পর্ক ছিল না, তার খবর রাখার প্রয়োজনও বোধ করিনি।

"কিন্তু এখন তো আমাকে অনেকেই চেনে। গ্যালারিগুলোতে খোঁজ নিলেই টেলিফোন নম্বর পাওয়া যায়। হঠাৎ ক'দিন আগে থেকে সে আমাকে ফোন করতে শুরু করল। প্রথমবার নম্বর না চেনা বলে ধরেছিলাম। তারপর ওই নম্বর দেখলে আর সুইচ অন করিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাকে নিষেধ করতে গিয়ে শুনলাম যে তার মেয়ে, যাকে চার-পাঁচ বছরে আমি খুব স্নেহ করতাম, তাকে নিয়ে সে খুব বিব্রত হয়ে আছে। এত বিব্রত যে, মেরে ফেলতে পারলে বেঁচে যেত। ব্যাপারটা অসত্য বলে ধরে নিয়েও আমি আজ তার বাড়িতে গিয়েছিলাম।" থামল সংহিতা।

মিলা বলল, "মিথ্যেটা ধরা পড়ে গেল?"

"সেটা হলে খুশি হতাম।" সংহিতা শ্বাস ফেলল।

"তার মানে?"

"গিয়ে দেখলাম ওর মেয়ের সমস্ত শরীর অ্যাসিডে পুড়ে একটা বেঢপ মাংসপিণ্ড হয়ে গিয়েছে। চোখ অন্ধ, মাথায় কোনও চুল নেই, হাঁটতে পারে না।"

"মাই গড! কী করে হল, ওইটুকু মেয়ে—!"

"তখন ওইটুকু ছিল, এখন তিরিশ পেরিয়েছে। বাবার কাছে টাকার পর

টাকা চেয়ে না পেয়ে মেয়েকে পুড়িয়েছে স্বামী-শাশুড়ি। তারা শাস্তি পেয়েছে, কিন্তু—।"

"উঃ। তুমি দেখলে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু নাইটিতে মোড়া ছিল শরীর, চোখে কালো চশমা, মাথায় রুমাল বাঁধা। সহ্য করা মুশকিল।"

"ওদের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। বুঝতে পেরেছি, এখন এইরকম মেয়ে ভদ্রলোকের কাছে বোঝা হয়ে গিয়েছে!"

"না। এতদিন মেয়ের পাশে ছিল সে। ওকে বাঁচাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। প্লাস্টিক সার্জারি করে চেহারা শেপে আনতে যে-খরচ তা ওর সঞ্চয়ে নেই। তার ওপর সে নিজেই ক্যান্সারে আক্রান্ত!"

মিলা গ্লাস তুলছিল চুমুক দেওয়ার জন্যে, হাত কেঁপে উঠল, নামিয়ে রাখল সেটা। চাপা গলায় বলল, "কী বলছ?"

"কথাটা যে মিথ্যে নয় আমি তার প্রমাণ নিয়ে এসেছি।"

ওদের কথা বলার ফাঁকে সিক্তা এক প্লেট মাছভাজা দিয়ে গিয়েছিল। সেদিকে নজর ছিল না মিলার। এক ঢোকে গ্লাসের বাকিটা গলায় চালান দিয়ে ঠোঁট মুছল হাতের উলটোপিঠে। তারপর বলল, "কিন্তু এতে তোমার কোনও ভূমিকা নেই।"

"না নেই।" মাথা নাড়ল সংহিতা।

"পৃথিবীর অনেক মানুষ গভীর কষ্টের মধ্যে কোনওমতে বেঁচে আছে, কেন বেঁচে আছে তা তারাই জানে না, একজন চলে গেলে অন্য জন মুখ থুবড়ে পড়বে, তুমি কতজনকে নিয়ে ভাববে? আর অভিশাপ দেওয়া? ওটা ফালতু। অল্প বয়সে আমিও কয়েকজনকে অভিশাপ দিয়েছিলাম। তারা সবাই দিব্যি বেঁচে আছে। ফুলেফেঁপে আনন্দেই আছে। আগে বোধহয় শকুনের অভিশাপে গোরু মারা যেত, এখন ঈশ্বরের অভিশাপেও কোনও কাজ হয় না। তুমি ভেবো না, বহু বছর আগে তুমি অভিশাপ দিয়েছিলে বলে আজ ওদের এই দুর্দশা।" মিলা আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালল।

"আমি কিছুই ভাবছি না।"

"দ্যাটস গুড। একটা নাও, বেরিয়ে আসতে পারবে।"

"নাঃ। তুমি ডিনার করবে না?"

"এই তো," ভাজা মাছগুলো দেখাল মিলা আঙুল তুলে, "এটাই আমার

ডিনার। আমি আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব।" মিলার কথা একটু জড়িয়ে এল।

"আমি উঠলাম।" সংহিতা দাঁড়াল।

"বাট, বিশ্বাস করো, আমি ওই মেয়েটাকে, কী যেন নাম—, হ্যাঁ, যাকে পোড়ানো হয়েছিল—!"

মিলাকে সাহায্য করল সংহিতা, "টিকলি।"

"হ্যাঁ, টিকলি টিকলি!" আচমকা চুপ করে গেল মিলা। বেরিয়ে এল সংহিতা।

ছায়াছায়া অন্ধকারটা চলে গিয়ে কাচের মতো আলো এখন চারধারে। সে দেখল সংখ্যায় তারা বেড়ে গেছে কিন্তু সেই বিকৃত শরীরের স্ত্রীলোকটি ধারেকাছে নেই। টিকলি। টিকলি কোথায় গেল? যে হাঁটতে পারে না সে উধাও হল কী করে? তার জায়গায় যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না নিচু হয়ে থাকায়, কিন্তু তিনি যে একজন পুরুষ এবং অতিবৃদ্ধ তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ পায়ের তলায় কাঁপুনি শুরু হল। ক্রমশ সেটা দ্রুত হচ্ছিল আর সেইসঙ্গে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সবাই বসে পড়ল। তবু শরীর ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ নাকে তীব্র কটু গন্ধ প্রবেশ করল। তার দাপটে জ্ঞান হারাল সবাই।

যখন জ্ঞান ফিরে এল, সেটা কতটা সময়ের পর কেউ জানে না, তখন আতঙ্কিত হয়ে হাহাকার করতে লাগল সবাই। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে পশ্চিম আকাশে সূর্য দেখা দিল। সূর্য ওঠার পর আর একবার ভূকম্পন হল এবং সেটা থেমে গেলে একটি ভয়ংকর দর্শন প্রাণী সামনে চলে এল। সে মানুষের মতো কথা বলতে পারে এবং গতিতে কেউ তাকে হারাতে পারবে না। এই প্রাণীর হাতের লাঠি এগিয়ে এসে প্রত্যেকের মুখ স্পর্শ করল। তার ফলে কারও চেহারা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে গেল, কারও শরীরে ভয়ংকর কালো রং ছড়িয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই বিশেষ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ধ্বনিত হল। সে অবাক হয়ে দেখল যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের বেশির ভাগই নেই। কিন্তু সেই বৃদ্ধ আলোকিত মুখ ওপরে তুললেন। এখন পায়ের তলার জমি স্থির। সে লক্ষ করে দেখল যাদের মুখ এবং শরীরের রং কালো হয়ে গিয়েছিল তারা ধারেকাছে নেই।

এই সময় আকাশবাণী হল, "তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা মানবজনমের সময়ে কোনও পাপকার্য করোনি। তোমাদের ওপর যে-অন্যায় অত্যাচার হয়েছে তা নীরবে সহ্য করেছ। তোমরা তৃষিতকে পানীয় দিয়েছ, আহতকে সেবা করেছ। স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি থেকে কখনওই দূরে থাকোনি। সেই কারণেই তোমাদের জন্যে স্বর্গের দুয়ার খোলা হয়েছে। তবে সেখানে পৌঁছোবার আগে শেষবার নিজেকে নির্মল করে নিতে হবে।

"তোমরা জানো না স্বর্গ কী, সেখানে পৌঁছোলে কী দেখতে পাবে। এখান থেকে যাত্রা শুরু করার পরে তোমরা একসময় একটি বিশাল খাদের সামনে উপস্থিত হবে। সেই খাদ বেয়ে তীব্র স্রোতের নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই খাদ এবং নদীর ওপাশে দেখতে পাবে বিশাল বিশাল গাছ এবং দিগন্তছোঁয়া মাঠ। ওই মাঠের কাছে পৌঁছোতে তোমাদের একটি দীর্ঘ সেতু অতিক্রম করতে হবে। সেই সেতু অতিক্রম তারাই করতে পারবে যারা এতকাল যাবতীয় অসৎকর্ম থেকে বিরত থেকেছ। স্বর্গে গেলে তোমাদের অপূর্ব ফলমূল পরিবেশন করা হবে। সাদা সুন্দর পাত্রে বিশুদ্ধ সুরা যা অতীব সুস্বাদু কিন্তু নেশা তৈরি করবে না, তোমরা গ্রহণ করতে পারবে। তোমরা যাত্রা শুরু করো।"

আকাশবাণী শেষ হওয়ামাত্র সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। সে দেখল ওই বৃদ্ধ তাঁর অশক্ত শরীরের জন্যে এগোতে পারছেন না। সে তাঁর পাশে পৌঁছে বলল, "আপনি আমার কাঁধে একটি হাত রাখুন, আমি আপনাকে সাহায্য করছি।"

বৃদ্ধ কাতর চোখে তাকালেন, "আমার বোঝা তুমি কেন বইতে চাইছ?"

"আপনি আমার পিতৃতুল্য। আসুন।"

বৃদ্ধের পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। কয়েক পা এগিয়েই তিনি থেমে গেলেন, "একটা কথা না বলে আমি পারছি না। আমি যৌবনে অসুস্থ হওয়ায় হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলাম। চিকিৎসা করিয়ে একটু সুস্থ হলে হাসপাতালে থাকার সময় লুকিয়ে একটা সিগারেট খেয়েছিলাম। ভয় হচ্ছিল, সেই পাপের জন্যে হয়তো আমাকে নরকবাস করতে হবে।"

সে হেসে ফেলল, "ওটা বোধহয় পাপকাজ নয়।"

"কী বলছ! আমি চিকিৎসা করাতে গিয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করছি, সেটা তো অন্যায়। আর অন্যায় মানেই তো পাপ।" বৃদ্ধ শিউরে উঠলেন।

"তা হলে আপনার মুখ আলোকিত হয়ে উঠল কেন?"

"আমি সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত স্বর্গে পৌঁছোতে পারব না। যত এগোচ্ছি তত দুর্বল হয়ে পড়ছি। তুমি আমাকে না ধরে থাকলে পড়ে যেতাম।" বৃদ্ধ বললেন।

সে লক্ষ করল সবাই এখন মাথা তুলে হাঁটছে। কিন্তু হাঁটার গতি কমে গেছে। পশ্চিম আকাশে সেই যে সূর্য উঠেছিল প্রায় সেখানেই থেকে গিয়েছে। কিন্তু ওই সূর্য একদম অচেনা, পৃথিবীতে থাকার সময় দেখতে পায়নি।

আর-একটু এগোবার পর বৃদ্ধের জন্যে দাঁড়াতে হল। একটু স্বস্তি ফিরতেই বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "নরক কীরকম অনুমান করতে পারি, স্বর্গে গেলে আর কী পাব?"

হঠাৎ পিছন থেকে একজন বলে উঠল, "স্বর্গসুখ, যা পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।"

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, "হে ঈশ্বর, তুমি মহান, আমাকে অনুগ্রহ করার জন্যে আমি স্বর্গসুখ লাভ করব। আমি নিজেকে চিরকাল তোমার পায়ে অর্পণ করেছি। তাই আজ আমার কোনও চিন্তা নেই।"

আরও খানিকটা যাওয়ার পর পথটা পাহাড়ের ভেতর ঢুকে বেঁকে যেতে আরম্ভ করল। দু"পাশে নেড়া পাহাড়। পায়ের তলায় ছোট ছোট নুড়ি বিছানো পথ। তার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল, বৃদ্ধের তো হবেই। বৃদ্ধ বললেন, "পারছি না, আর পারছি না।"

"পারতেই হবে আপনাকে, মনে জোর আনুন।"

"তুমি কেন আমার জন্যে কষ্ট করছ?"

"আমি কিছুই করছি না। ঈশ্বর যা ইচ্ছা করছেন তাই হচ্ছে।"

"একটু দাঁড়াও। উঃ।"

দাঁড়াতে হল। খানিক বাদে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি পৃথিবীতে অনেক ভাল কাজ করেছ, না?"

"জানি না।"

"জানো না! তা হলে তোমার মুখ কালো হয়ে যায়নি কেন? এই পথে না এসে নরকের পথে গেলে না কেন? শেষমুহূর্তে এই মিথ্যে বলার জন্যে স্বর্গের দরজা তোমার জন্যে নাও খুলতে পারে।"

"আশ্চর্য! আমি তো সত্যি জানি না।"

"পৃথিবীতে তুমি কী করতে?"

"মনে করতে পারছি না। আমার কিছুই মনে নেই। কেউ ধরিয়ে দিলে, কোনও নাম বললে তখন মনে আসে।" সে বলল।

আবার হাঁটা শুরু হল। আর একটা বাঁকের কাছে আসামাত্র ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল। বৃদ্ধ উল্লসিত গলায় বললেন, "জলের আওয়াজ হচ্ছে। তার মানে আমরা সেই নদীর কাছে পৌঁছে গিয়েছি।" উত্তেজিত হয়ে তিনি একাই দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

সংহিতার যখন চা খাওয়া প্রায় শেষ তখন মিলা এল। মুখচোখ এখন বেশ ফোলা, ভঙ্গিতে আলস্যের ছাপ। সিক্তা তার চা দিয়ে গেল।

"ঘুম হল?" জিজ্ঞাসা করল সংহিতা।

"সারারাত কীভাবে ঘুমিয়েছি টের পাইনি। ভোরে সেই যে জাগলাম আর এল না। মাথা ধরে আছে।" মিলা বলল।

সংহিতা হাসল।

"হ্যাঁ। ঠিকই। আসলে আমি কোনও নেশাতেই আসক্ত নই অথচ পৃথিবীর প্রায় সব নেশার স্বাদ নিয়েছি। একা মদ খেতে আমার ভালই লাগে না। কাল যে কী হল? কলকাতায় আসার আগে বোধহয় বছর দেড়েক এক পেগও মদ খাইনি।"

"অনেকদিন ছবি আঁকোনি।"

"এখানে এলে তো আমি কাজ করি না। একদম বিশ্রাম।" চায়ে চুমুক দিল মিলা।

সংহিতা মেয়েটাকে ভাল করে দেখল। সংক্ষিপ্ততম পোশাক এখন ওর পরনে। বেশ কিছু বছরের আলাপ কিন্তু কখনও যেচে তার কাছে থাকতে আসেনি।

চা শেষ করে মিলা বলল, "বাঃ। আগের থেকে ভাল লাগছে। ওহো, শোনো, আমি যদি ওদের দেখতে যেতে চাই তা হলে তুমি কি আপত্তি করবে?"

"কাদের?"

"আমি টিকলির কথা বলছি।"

অবাক হল সংহিতা। মদ খেতে খেতে যা শুনেছিল তা ভুলে যায়নি? কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ও যেতে চাইছে কেন?

মিলা বলল, "ভেবেছিলাম কলকাতায় কয়েকদিন থেকে পণ্ডিচেরিতে যাব। ওখানে আমার পরিচিত এক স্প্যানিশ আঁকিয়ে মাস দুয়েক ধরে আছে। যতটা ভাল ছবি আঁকে তার চেয়ে অনেক ভাল প্রেম করতে পারে। আমি কলকাতায় আসব তা ও জেনেছিল। তখন বেশ কয়েকবার ফোন করে অনুরোধ করেছে ওর কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে। সমুদ্রের গায়ে একটা বাড়ি ভাড়া করে আছে। গেলে খুব মজা হবে।"

"পারো বটে।" সংহিতা প্রশ্রয়ের হাসি হাসল।

"হয়তো কালই চলে যেতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার আগে ওই টিকলিকে একবার দেখে যাই। হয়তো ওকে দেখার পর দারুণ কোনও আইডিয়া মাথায় এসে যাবে, কে বলতে পারে।" সংহিতার দিকে তাকাল মিলা, "কী? তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে, একটা মেয়ে অর্ধমৃত হয়ে পড়েছে আর তাকে নিয়ে আমি ছবির বিষয় কী করে চিন্তা করছি!"

"আমি কিছুই ভাবছি না মিলা।" সংহিতা বলল।

"তা হলে?" মিলা তাকাল।

"আমি তোমাকে ঠিকানা দিচ্ছি।"

"ঠিকানা নিয়ে কী করব? ওখানে আমি কে? কেন আমাকে ওরা অ্যালাউ করবে?"

"কী বলতে চাও?" সন্দেহের চোখে তাকাল সংহিতা।

"তুমি ওখানে গেলে আমি তোমার সঙ্গী হতে পারি।" মিলা বলল।

আপত্তি জানাতে গিয়েও থেমে গেল সংহিতা। সমবেদনা জানানো মানুষের অন্যতম কর্তব্য। তার মনে পড়ে গেল আকাশবাণীর কথা। সব বানানো, সব অলীক। কিন্তু তার মধ্যেও মনে হচ্ছিল একটা সত্যি লুকিয়ে চুরিয়ে আছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, "সত্যি বলো তো, কেন যেতে চাইছ?"

"জানি না। বিশ্বাস করো। ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার পর কেবলই মনে হচ্ছে পণ্ডিচেরিতে না গিয়ে টিকলির কাছে যাওয়া উচিত।" মিলা কাপ সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর তার শোওয়ার ঘরে চলে গেল। তার যাওয়া দেখল সংহিতা। এই মেয়েটার সঙ্গে গত রাত অবধি দেখা মেয়েটার কোনও মিল নেই। সত্যি কি নেই?

ড্রাইভার এলে গাড়ি বের করতে বলল সংহিতা। একটা অফ হোয়াইট

শাড়ি আর একই রঙের জামা পরে বাইরের ঘরে এসে সে দেখল মিলা জিন্‌স আর শার্ট পরে বসে সিগারেট খাচ্ছে। সে বলল, "সিগারেটটা ওখানে গিয়ে খেয়ো না।"

"আমি এখনও বাচ্চা মেয়ে নই। চলো।"

সিক্তাকে যা ইচ্ছে তাই রান্না করতে বলে সংহিতা মিলাকে নিয়ে লিফটে উঠল। নীচে নেমে গাড়িতে উঠতে গিয়ে ফোন পেল সে। নিজের পরিচয় দিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, "ম্যাডাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি কি বাড়িতে আছেন?"

"না। আমি একটা দরকারে বেরিয়েছি। কী ব্যাপার বলুন তো?" সংহিতা অবাক হল।

"ঝাড়গ্রামের ওই কেসটার ব্যাপারে আপনার মেড সার্ভেন্টকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার।"

"আপনি বিকেলে আসুন। আমি থাকব।"

"ও কে ম্যাডাম।" অফিসার লাইন কেটে দিলেন।

মিলার দিকে তাকাল সংহিতা। চুপচাপ জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছে। সে বিষয়টা নিয়ে মিলার সঙ্গে কথা বলার দরকার মনে করল না।

আজ দরজা খুলল জয়ব্রত। খুলে বেশ অবাক হল।

সংহিতা বলল, "আমরা ভেতরে ঢুকলে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না!"

"না না। এসো, আসুন।" সরে দাঁড়াল জয়ব্রত।

"এর নাম মিলা। ছবি এঁকে খুব খ্যাতি পেয়েছে। বছরের বেশির ভাগ সময় বিদেশে থাকে। সেখানেই ওর এগজিবিশন হয়। আর ইনি, টিকলির বাবা।" সংহিতা বলল।

মিলা নমস্কার জানালে হাতজোড় করল জয়ব্রত। তারপর ওদের বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। মিলা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার শরীর কেমন আছে।"

জয়ব্রত সংহিতার দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিল, "ভাল, ভালই।"

সংহিতা বলল, "গতকাল তোমার হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি কিন্তু ভাল বলেননি।"

মাথা নাড়ল জয়ব্রত, "আমি ভাল থাকার চেষ্টা করি। প্রতিটি সকালে ঘুম

ভেঙে যাওয়ার পর ভাবি, আর একটা দিন পাওয়া গেল। দিনটা ভালভাবে কাটাতে হবে।"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"কেন?" জয়ব্রত সোজা হয়ে তাকাল।

"শুনলাম, ওর কোনও ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না।"

"হচ্ছে না কারণ সম্ভব হচ্ছে না।"

"এখন ও যে-অবস্থায় আছে তাতে চিকিৎসা করালে কাজ হবে?"

"জানি না। দিন দিন ওর অবস্থাও খারাপ হচ্ছে। আগে মোটামুটি ভালই কথা বলত। এখন ন্যাজাল ভয়েসে কথা বলছে। আমার ডাক্তারকে বলেছিলাম, তিনি সব শুনে একটুও উৎসাহ দেখাননি।"

মিলা অবাক হল, "মানে? একজন ডাক্তার উৎসাহ দেখাননি? তাঁর কর্তব্য পেশেন্টকে চিকিৎসা করা!"

জয়ব্রত বলল, "উনি বলেছিলেন হোমিওপ্যাথি ওষুধে টিকলির চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। তাই পেশেন্টকে দেখে কোনও লাভ হবে না।"

"হোমিওপ্যাথি!" ঠোঁট থেকে অদ্ভুত স্বরে বেরিয়ে এল শব্দটি।

"কিছু মনে করবেন না, ওই চিকিৎসায় অনেককেই সুস্থ হয়ে যেতে দেখেছি, এই আমিও তো এতদিন ভাল আছি। চলে ফিরে বেড়াচ্ছি।"

"গোড়া থেকেই হোমিওপ্যাথি করাচ্ছেন?"

"না, প্রথমে অ্যালাপ্যাথি করিয়েছিলাম। কেমোও হয়েছিল। কিন্তু তারপর—।" কথা শেষ করল না জয়ব্রত।

মিলা সংহিতার দিকে তাকাল। চুপচাপ বসে সংহিতা জয়ব্রতকে দেখছে। মিলা বলল, "চলো, টিকলির কাছে যাই।"

সংহিতা বলল, "কাল আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল।"

মিলা জয়ব্রতকে বলল, "আপনি মেয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবেন।"

একটু ইতস্তত করল জয়ব্রত। সেটা দেখে মিলা বলল, "শুনলাম আপনি নাকি বলেছেন ওকে মেরে ফেলতে পারলে আপনি হালকা হতেন। নিজের মেয়ে বলে পারছেন না। আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়াটা নিশ্চয়ই ততটা কঠিন হবে না!"

উঠে দাঁড়াল জয়ব্রত, "চলুন।"

দোতলায় উঠতেই সেই প্রৌঢ়াকে দেখা গেল। টিকলির ঘর থেকে বেডপ্যান নিয়ে বেরিয়ে আসছে। জয়ব্রত তাকে জিজ্ঞাসা করল, "হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।" প্রৌঢ়া পাশ দিয়ে নীচে নেমে গেল।

জয়ব্রত প্রথমে ঘরে ঢুকল। খুব আন্তরিক গলায় বলল, "মাগো, তুমি কি গান শুনবে?"

সংহিতা আর মিলা ঘরে ঢুকে দেখল টিকলির এক দিকে মাথা হেলানো। জয়ব্রত ওপাশে রাখা টেপরেকর্ডারে ক্যাসেট ভরে সুইচ অন করল। কয়েক সেকেন্ড বাদে গান বাজল, "এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।" সংহিতা লক্ষ করল টিকলির পোড়া মুখের চামড়া গান শোনামাত্র একটু নরম হয়ে গেল। গান শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রটা বন্ধ করে জয়ব্রত বলল, "তুমি যখন ছোট্ট ছিলে তখন একজন এই বাড়িতে খুব আসত। তোমাকে আদর করত। তোমার কি কারও কথা মনে পড়ে?"

মুখ তুলতে চেষ্টা করল টিকলি। কিন্তু আটকে যাওয়া চামড়ায় বোধহয় চাপ লাগতেই নামিয়ে নিল। মাথা নাড়ল সে, না।

"একটু ভাবো। ওর নাম ছিল সংহিতামাসি।"

এবার একটা নাকি স্বরে কথা শোনা গেল, "হলুদ শাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

মিলা সংহিতার দিকে তাকাল। মাথা নাড়ল সংহিতা, হ্যাঁ।

"আজ তিনি আর তাঁর বন্ধু এই বাড়িতে এসেছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান, তুমি কি কথা বলবে?" জয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর দিল না টিকলি। পাথরের মতো বসে রইল। জয়ব্রত ওদের দিকে তাকাল, "মনে হচ্ছে টিকলি কথা বলতে চাইছে না।"

মিলা এগিয়ে গিয়ে টিকলির পাশে বসল, "টিকলি, তুমি কথা বলবে না?"

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে টিকলি বলল, "এতদিন কোথায় ছিলে?" গলার স্বর বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও অভিমানের ছোঁয়া পাওয়া গেল।

মিলা সংহিতার দিকে তাকাল। সংহিতা মাথা নেড়ে মিলাকে কথা বলতে ইঙ্গিত করল।

"টিকলি খুব অন্যায় করেছি। কী করব বলো। কাজের জন্যে বাইরে যেতে হয়েছিল যে।"

"এতদিন!"

"হ্যাঁ। আর শোনো, আমার সঙ্গে একজন বান্ধবী এসেছে। কথা বলবে?"

"তোমরা কেন এসেছ? আমি বুঝতে পারি আমাকে মানুষের মতো দেখায় না।"

সংহিতা এগিয়ে গেল কাছে। হাঁটু মুড়ে বসে বলল, "কে বলল তোমাকে? ভালভাবে চিকিৎসা করালে তুমি আবার আগের মতো হয়ে যাবে।"

"বাবা বলে না, কিন্তু কাজের মাসি বলে, চিকিৎসা করতে যে টাকা লাগবে তা বাবার নেই। আমি যদি মরে যেতাম, বাবা যদি তখন আমাকে না বাঁচাত তা হলে খুব ভাল হত। চশমার নীচ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে এল গালে।

মিলা নিজের রুমালে ওর গাল মুছিয়ে দিল, "না, কাঁদবে না। আমরা তো এসেছি, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি গান শুনতে খুব ভালবাসো?"

কথা না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল টিকলি।

"কী গান?"

"রবীন্দ্রনাথের গান।"

আরও পাঁচ মিনিট পরে দু'বেলা এসে দেখা করবে কথা দিয়ে মিলা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সঙ্গে সংহিতা এবং জয়ব্রত।

নীচে নেমে জয়ব্রত বলল, "কিছু মনে করবেন না, আপনি বলে এলেন যে, দু'বেলা এসে ওর সঙ্গে দেখা করবেন। এর ফলে ও আপনাকে আশা করবে। আশাভঙ্গ হলে ও মানসিক আঘাত পাবে। কথাটা না বললেই পারতেন।"

মিলা বলল, "আপনি কী করে ভাবলেন আমি ওকে মানসিক আঘাত দেব? কথাটা আমি আন্তরিকভাবেই বলেছি।"

"মানে? আপনি রোজ দুবেলা আসবেন?"

"চেষ্টা করব।"

"কিন্তু ও আপনাকে সংহিতা বলেই জেনেছে।"

"নামে কী এসে যায়? আমি না হয় ওর কাছে সংহিতাই থাকলাম।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" জয়ব্রত বিড়বিড় করল।

"আপনি তো এতদিন ধরে ওর পাশে আছেন, এবার আমাদের বুঝতে দিন।"

দুপুরের খাওয়ার পর সংহিতা বলল, "সত্যি, তুমি আমাকে আজ অবাক করে দিয়েছ।"

"কিছুই করিনি।" মিলা মাথা নাড়ল।

"কিন্তু তুমি কী করতে চাইছ?"

"আমি এখনও জানি না।"

"তা হলে তুমি আগামীকাল পণ্ডিচেরিতে যাচ্ছ না?"

"নাঃ। কিছুদিনের মধ্যে তো যাওয়া যাবে না। তুমি দেখেছ, যতই কাপড়ের আড়াল থাকুক ওর শরীর একটা মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু নয়। যাঁরা মূর্তি তৈরি করেন তাঁদের কাজ করতে দেখেছি। যেভাবে কেটে কেটে তারা একটা অবয়ব তৈরি করে বোধহয় সেইভাবে টিকলির শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।" মিলা বলল।

সংহিতা শুনল। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করল, "টিকলির ব্যাপারে তুমি এত ইন্টারেস্ট নিচ্ছ কেন? তোমার তো নিশ্চয়ই এসব করার কোনও কথাই ছিল না।"

"কখনও কখনও বোধহয় এমন হয়ে যায়। আচ্ছা, তুমি তো মেয়েটাকে অল্পবয়সে দেখেছিলে। তুমি কিছু অনুভব করছ না?" মিলা তাকাল।

"অবশ্যই। মেয়েটাকে দেখে খুব খারাপ লেগেছে। শরীর তো বটেই। ওর চোখও তো পুড়ে গেছে। সেখানে কোনওদিন আলো ফুটবে কিনা সন্দেহ। আমাকে ওর মনে নেই। কিন্তু হলুদ শাড়ির কথা মনে রেখেছে। যে-কোনও মেয়েকে সংহিতা হিসেবে মেনে নিতে ওর আপত্তি নেই, দেখলে তো! আমি শুধু ভাবছি, জয়ব্রত আজ নয় কাল চলে যাবে। তখন টিকলির কী হবে। অনাথ আশ্রম রয়েছে। কিন্তু ওর মতো শরীরের অনাথদের জন্যে এদেশে কোনও আশ্রম আছে কিনা আমি জানি না।" সংহিতা মাথা নাড়ল, "ওর জন্যে জয়ব্রতর বেঁচে থাকা খুব জরুরি।"

মিলা বলল, "কলকাতায় তো ক'দিনের জন্যে আসি। এখানকার ডাক্তার মহলের সঙ্গে কি তোমার জানাশোনা আছে?"

"আছে। তাঁরা কেউ জেনারেল ফিজিশিয়ান, কেউ হার্ট বা হাড়ের ডাক্তার, কেউ গাইনি। ওহো, গতকাল আমার সঙ্গে ডক্টর মালহোত্রার আলাপ হয়েছিল। উনি ঠিকঠাক বলতে পারেন।"

"একটা অ্যাপয়ন্টমেন্ট করো না?"

"তুমি যাবে?"

"আমরা দু"জনেই যাব। একটা চেষ্টা করা যাক। তোমার সঙ্গে ভদ্রলোক যাই করে থাকুক না কেন তারপর প্রায় তিন যুগ চলে গিয়েছে। তুমি নিজেই বলেছ সেসবের কোনও অনুভূতি বেঁচে নেই। তা হলে ওই মেয়েটির কথা ভেবে ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলি, হয়তো ক্লিক করলেও করতে পারে।"

মিলার অনুরোধে মিসেস কপুরকে ফোন করে ডক্টর মালহোত্রার মোবাইল নম্বর নিয়ে সংহিতা একটু ভাবল। তারপর নিজেই ফোন করল। ডক্টর মালহোত্রার সহকারী জানালেন যে, তিনি এখন অপারেশন থিয়েটারে আছেন। সংহিতা নিজের নাম এবং ফোন নম্বর ভদ্রলোককে দিয়ে বললেন, "ডক্টর যখন ফ্রি হবেন তখন যেন একবার ফোন করেন।"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "হু ইজ হি?"

"আমার সঙ্গে গতকাল পরিচয় হয়েছে। শুনলাম ডাক্তার হিসেবে ওঁর খুব খ্যাতি আছে। টিকলির ব্যাপারটা বোধহয় ওঁর বিষয়েই পড়বে।"

মিলা চলে গেল নিজের ঘরে।

সংহিতা উঠল না। তার মনে হচ্ছিল মিলার এই উদ্যোগের কারণ বোধগম্য হচ্ছে না। এবং সেই উদ্যোগ নিতে সে সংহিতা সাজতেও দ্বিধা করছে না। কিন্তু সংহিতা কেন মিলার মতো উৎসাহিত হচ্ছে না? সে টিকলিকে শৈশবে দেখেছিল। এখন টিকলি জানছে তার ছোটবেলার সংহিতামাসি অনেক বছর পরে ফিরে এসেছে। এই মিথ্যেটার বদলে সত্যিটাও হতে পারত। সে কি অতীতের অপমান ভুলতে পারছে না? আচ্ছা, অতীতে যদি জয়ব্রত তাকে অপমান না করত, তার বিশ্বাসকে মর্যাদা দিত তা হলে সংহিতা কি ওই বাড়ির বউ হয়ে এতদিন থাকতে পারত? তখন সংসার এবং মেয়ের দায়িত্ব তাকে নিতে হত। সেসব সামলে ছবি আঁকার উৎসাহ কি পেত? তা না পেলে আজকে ভারতজুড়ে তার যে-নাম তা সম্ভব হত না। বাবা সেই ভেঙে পড়ার দিনগুলোতে পাশে থেকে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। ওই কাজে ডুবে গিয়েছিল বলেই সে ধীরে ধীরে সব ভুলতে পেরেছিল বলে এতদিন মনে করেছে। কিন্তু সত্যি কি ভুলতে পেরেছে? কার লেখা কবিতা এখন মনে পড়ছে না, লাইনটা ছিল, "ক্ষমা করতে শেখো"।

আশ্চর্য! ক্ষমা না করলে এতগুলো বছর সে চুপচাপ থেকে গেল কেন?

টেলিফোন বাজল। ওটা অন করামাত্র ইংরেজিতে প্রশ্ন এল, "কে আমাকে

ফোন করেছিলেন? আমার অ্যাসিস্টেন্ট নামটা ঠিক উচ্চারণ করতে পারছে না। আমি ডক্টর মালহোত্রা!"

সংহিতা হাসল, "আমি সংহিতা।"

"ওহো! আপনি! বলুন, কী ব্যাপার?" ডক্টর মালহোত্রা সহজ গলায় বললেন।

"আমার খুব পরিচিত একটি মেয়ে যাকে আমি চার-পাঁচ বছর বয়সে দেখেছিলাম, তার ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাইছি। বিয়ের কিছু পরে, ধরুন, বছর আটেক আগে ওর শ্বশুরবাড়ির লোকরা অত্যাচার এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, শেষপর্যন্ত তারা ওর মাথা-শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দেয়। মেয়েটা শেষপর্যন্ত বেঁচে গিয়েছে কিন্তু তার সর্বাঙ্গ পুড়ে, গলে একটা চর্বি-মাংসের স্তূপ হয়ে গিয়েছে। হাত-পা শরীরের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে, চোখ অন্ধ এবং মাথার চুল পুড়ে আর বোধহয় তৈরি হয়নি। ওর বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলে আর চিকিৎসা করাতে পারেননি। এতদিন পরে এরকম পেশেন্টকে কি আপনার চিকিৎসাশাস্ত্র সাহায্য করতে পারে?"

সংহিতা কথা শেষ হতেই ডক্টর মালহোত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, "অপরাধীরা এখন কোথায়?"

"জেলে। বিচারক তাদের শাস্তি দিয়েছেন।"

"দেখুন, মেয়েটিকে না দেখলে আমি কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না। ঠিক সময়ে ব্যাপারটা যত সহজ ছিল তা এতদিন পরে না থাকাই স্বাভাবিক। ওয়েল, আপনি আগামীকাল সকালে লাউডন স্ট্রিটের দ্য থার্ড আই নার্সিংহোমে ওকে ভরতি করে দিন। আমি ওদের বলে দিচ্ছি। আপনি যখন রেফার করছেন তখন যে করেই হোক আগামীকালই ওকে দেখতে যাব। ঠিক আছে। কাল সন্ধেবেলায় ফোন করবেন। বাই।" ডক্টর ফোন ছেড়ে দিলেন।

সংহিতা ফোন রেখে মিলার ঘরে গেল। দরজায় দাঁড়াতেই সে চমকে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। ওর পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। দ্রুত ওর পাশে চলে এসে সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আরে! কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে কান্না থেমে গেল। ডান হাতে চোখ মুছল মিলা। তারপর মুখ না তুলে বলল, "কী জানি! হঠাৎ কাঁদতে ইচ্ছে করল।"

"এ কী! কোনও কারণ ছাড়াই কাঁদতে ইচ্ছে করল বলে তুমি কাঁদছ?"

"অনেকদিন কাঁদিনি। শেষ কবে কেঁদেছিলাম তা মনেও নেই।"

"আমি কখনও শুনিনি কেউ অনেকদিন কাঁদা হয়নি বলে একটু কেঁদে নিচ্ছে!"

এবার উঠে বসল মিলা। জলের দাগ গাল থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "এই ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হল যদি আমার অবস্থা টিকলির মতো হত তা হলে কী করতাম? শরীর বলতে যা থাকবে তা কাপড়ের আড়ালে রেখে অন্ধ হয়ে মাথায় রুমাল বেঁধে বছরের পর বছর বসে থাকতে হত? জানি না শোওয়া সম্ভব হত কিনা! একটা গাছ হেঁটে চলে বেড়ায় না কিন্তু তার ডালপালা বড় হয়, পাতা বাতাসে নাচে, ফুল এবং ফল হয়। নিজের প্রাণটাকে সে তার মতো উপভোগ করে। ওসবের কিছুই তো করা সম্ভব হত না। সঙ্গে সঙ্গে বুকে কাঁপুনি এল। তখন কাঁদলাম। বিশ্বাস করো, আজ এই কান্নাটা কাঁদতে খুব ভাল লেগেছে। এখন নিজেকে বেশ হালকা বলে মনে হচ্ছে।"

"পাগল!" হেসে মাথা নাড়ল সংহিতা, "তুমি যার কথা ভেবে এত কল্পনা করলে সে হয়তো এসব কিছুই ভাবছে না। যাক গে, ডক্টর মালহোত্রা ফোন করেছিলেন। উনি টিকলিকে আগামীকাল সকালে লাউডন স্ট্রিটের দ্য থার্ড আই নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে বলেছেন। কালকেই ভরতি করিয়ে দিতে হবে।"

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল মিলা, "দারুণ খবর। নার্সিংহোমটা কোথায় তুমি জানো?"

"না। তবে ওই রাস্তায় গেলে যে-কেউ নিশ্চয়ই বলে দেবে।"

"কাল অ্যাডমিট করালে ডক্টর দেখবেন কবে? কিছু বলেছেন?"

"কালই। সন্ধ্যায় ফোন করতে বলেছেন।"

"তা হলে তুমি এখনই জয়ব্রতবাবুকে ফোন করে জানিয়ে দাও। ওঁরা যেন সকালেই টিকলিকে তৈরি করে রাখেন।"

"তুমিই বলো।"

"ওঃ। তুমি এখনও—! নম্বরটা বলো।"

সংহিতার বলা নম্বরে ফোন করল মিলা, "হ্যালো! আমি মিলা বলছি। চিনতে পারছেন। বাঃ। শুনুন, টিকলির ব্যাপারে আমরা একজন বিখ্যাত ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আগামীকাল সকালে ওকে নার্সিংহোমে ভরতি করতে বলেছেন। প্রথমে নিশ্চয়ই ওকে পরীক্ষা করে দেখবেন।

লাউডন স্ট্রিটের দ্য থার্ড আই নার্সিংহোম। আপনার আপত্তি নেই তো?" সরাসরি জানতে চাইল সে। তারপর স্পিকার ফোন অন করে দিল।

"উনি বাড়িতে এসে দেখতে পারবেন না?" জয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল।

"ওঁর মতো ব্যস্ত ডাক্তার সেই সময়টা পাবেন না।"

"কিন্তু...।" থেমে গেল জয়ব্রত।

"বলুন?"

"প্রথমত, ওকে মুভ করানো মুশকিল। দোতলা থেকে নামিয়ে গাড়িতে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। তা ছাড়া গাড়ির সিটে বসে থাকতেও পারবে না।"

"এটা কোনও সমস্যা হল জয়ব্রতবাবু? নার্সিংহোমের অ্যাম্বুলেন্স যাবে, লোকজন স্ট্রেচারে শুইয়ে নীচে নামাবে। অ্যাম্বুলেন্সের বেডে শুয়েই নার্সিংহোমে যাবে।"

"ও! কিন্তু সমস্যা হল আমার পক্ষে বাজেট না জানলে হ্যাঁ বলা সম্ভব নয়।"

"কেন?"

"সংহিতাকে আমি আমার আর্থিক অবস্থার কথা বলেছি।"

"শুধু পরীক্ষা করার জন্যে সামান্য টাকা লাগবে। আপনি এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনার কাজের লোকটিকে বলবেন ওকে সকাল সকাল তৈরি রাখতে।"

"কিন্তু—!"

"আচ্ছা জয়ব্রতবাবু, আপনি কি চান না মেয়েটা সুস্থ হয়ে উঠুক?"

"নিশ্চয়ই চাই।"

"তা হলে আর কথা বাড়াবেন না। নমস্কার।" ফোন অফ করে মিলা বলল, "অদ্ভুত! দারিদ্র্যের অহংকার থেকে কেউ কেউ এখনও মুক্ত হল না।"

"অহংকার কেন বলছ? অক্ষমও চায় না অসম্মানিত হতে।" সংহিতা বলল।

"আমরা ওঁকে অসম্মানিত করছি?"

"যে যেভাবে নেবে—! যাক গে। নার্সিংহোমে ফোন করে অ্যাম্বুলেন্স বুক করে দেওয়া উচিত।"

সংহিতা উঠে বসার ঘরে গিয়ে টেলিফোন নম্বরের বই বের করে

নার্সিংহোমের লিস্ট দেখতেই দ্য থার্ড আই পেয়ে গেল। সে রিশেপসনে ফোন করে ডক্টর মালহোত্রার নাম বলতেই ভদ্রমহিলা খুব গুরুত্ব দিয়ে জয়ব্রতর বাড়ির ঠিকানা নোট করে নিয়ে বললেন, "কাল সকাল আটটায় অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে যাবে ম্যাডাম। ডক্টর মালহোত্রা খবর দিয়েছেন পেশেন্টকে ভরতি করে নিতে।"

সংহিতা ফোন রেখে দিয়ে বলল, "মিলা, জয়ব্রত একটা কথা ঠিকই বলেছে। টিকলিকে ঠিকঠাক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হলে কত খরচ হবে তা জানা দরকার ছিল।"

"হ্যাঁ। জানা থাকলে সুবিধে হবে। কাল নার্সিংহোমে গিয়ে খোঁজ নিলে জানা যাবে।" বলেই মিলা সংশোধন করল, "ওরাই বা কী করে বলবে! ডক্টর খানিকটা আন্দাজ দিতে পারবেন।"

বিকেল পাঁচটা নাগাদ পুলিশ অফিসার এলেন। মিলা তার কিছুক্ষণ আগে ড্রাইভারকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে কাছাকাছি একটা মল-এ। টুকটাক কেনাকাটি করতে।

মুখোমুখি বসে অফিসার বললেন, "আপনার মেডকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।"

"আবার?" বিরক্ত হল সংহিতা।

"এরকম কেসে সঠিক তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত এই অপ্রিয় কাজটা করতে হয়। ওকে একবার এখানে আসতে বলুন।"

সংহিতা গলা তুলে ডাকতেই সিক্তা এসে দাঁড়াল দরজার এপাশে।

অফিসার একটা নোটবই বের করে দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "হরিহর মাহাতো তোমার কে হয়?"

সিক্তা অবাক হল প্রথমে। বলল, "তার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল।"

"তার মানে, সে তোমার স্বামী!"

"হুঁ!"

"যে-লোকটার সঙ্গে তুমি ঝাড়গ্রামে ছিলে সে তোমার কে হয়?"

"কেউ না।"

"তা হলে তার সঙ্গে একই ঘরে অতদিন থাকলে কেন?"

সংহিতা হাত তুলল, "অফিসার, এই প্রশ্নটা আপনি করতে পারেন না।

দু'জন অ্যাডাল্ট মানুষ একসঙ্গে কেন থাকল তা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"না ম্যাডাম। একজন বিবাহিতা মহিলা যদি অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বাস করে তা হলে তাকে ব্যভিচারিণী বলা হয়।"

"যদি কোনও বিবাহিত পুরুষ অনাত্মীয়া কোনও মহিলার সঙ্গে বাস করেন, তাঁর সন্তানের পিতা হন তা হলে তাকে কী বলা হয় অফিসার?"

"প্রচণ্ড অপরাধ। তাকে জেলে যেতেই হবে।"

"তাই? আমাদের দেশে এরকম বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা কম নয়। বিশেষ করে ফিল্ম ওয়ার্ল্ডে তাঁরা দিব্যি আছেন। কই, তাঁরা তো জেলে যাননি?" সংহিতা বলল, "আপনি অন্য প্রশ্ন যদি থাকে তা হলে করুন।"

সিক্তার দিকে তাকালেন অফিসার, "তুমি এর আগে আমাদের বলেছ যে, তোমার ভাশুররা অত্যন্ত অত্যাচার করত। তারা তোমাকে প্রলোভন দেখাত। তুমি তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবে?"

সিক্তা বলল, "আমার জায়েরা সব জানত।"

"তারা অস্বীকার করেছে। তোমার স্বামীও বলেছে এ ব্যাপারে কিছু জানে না।"

"আমি কী বলব! ওর বুদ্ধি তো খুব কম।"

"কম?" হাসলেন অফিসার, "মাওবাদীদের এজেন্ট হিসেবে যে কাজ করতে পারে তার বুদ্ধি নেই বলে কী করে বিশ্বাস করব? আর তুমি সেটা জানতে!"

"অসম্ভব। সে কখনওই ওই কাজ করতে পারে না। ক্ষমতাই নেই।"

"তাই? তা হলে ওর ঘরে মাওবাদীদের পোস্টার কী করে পাওয়া গেল?" অফিসার হাসলেন, "এক সময় হয়তো হাবাগোবা ছিল কিন্তু পরে বদলে গেলেও আগের স্বভাবটাই লোকজনদের দেখাত হরিহর। গোপনে মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। তুমি তো বিয়ের পর তার সঙ্গে একঘরে থাকতে। এই পরিবর্তন, মাওবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা তুমি নিশ্চয়ই জানতে।"

"না। আমি কিছুই জানি না। এখনও বিশ্বাস করি না।"

"তুমি মিথ্যে বলছ!"

"ঠিক আছে, প্রমাণ করুন আমি মিথ্যে বলছি।" হঠাৎ খেপে গেল সিক্তা।

"তোমার ভাশুররাই কথাটা বলেছে। ওই ড্রাইভার লোকটার সঙ্গে ভাব হওয়ার পর হরিহর যাতে কোনও বাধা না দেয়, কোনও হল্লা না করে তাই দু'জনের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। তারপর আন্দোলনের কাজে যাচ্ছ বলে ড্রাইভারের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলে। হরিহর সেটা বিশ্বাস করেছিল কারণ তখন সে মাওবাদীদের গুপ্তচর হিসেবে উত্তেজিত থাকত।" পুলিশ অফিসার আবার নোটবই-এ চোখ রাখলেন।

"আমি কারও সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিইনি।" সিক্তা বলল।

"তা হলে তোমার ভাশুররা মিথ্যে বলেছে?"

সিক্তা মাথা নাড়ল, "ওরা কী বলেছে আমি জানব কেমন করে?"

"ওরা মিথ্যে বলেনি। ওদের দেওয়া ইনফর্মেশন পেয়ে আমরা হরিহরের ঘরে যাই। তার তক্তাপোশের তলায় মাওবাদীদের হাতে লেখা পোস্টারের বান্ডিল রাখা ছিল। ওকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসার সময় কোনও কান্নাকাটি করেনি, প্রতিবাদও নয়।"

"ভালই করেছেন। এই কারণে কি ওকে সারাজীবন জেলে আটকে রাখবেন?"

"মানে?" অফিসার বিরক্ত হলেন।

"সারাজীবন যদি ও না ফিরতে পারে তা হলে ওর ভাগের জমি দাদারা নিজেদের করে নেবে। মাওবাদীদের গুপ্তচর বলে কাউকে ধরিয়ে দিলে তো তাদেরই লাভ।"

"বেশ তো, তাকে কোর্টে তোলা হয়েছে। ধরা পড়ার পর থেকে সে একটা কথাও বলেনি। চারদিন পরে বিচারক আবার শুনবেন। তখন তুমি এসব কথা তাঁকে বোলো। কিন্তু তোমার ভাশুররা যদি একটাও প্রমাণ আমাদের দিতে পারে তা হলে তোমাকে জেলের ভাত খেতে হবে।" অফিসার নোটবই বন্ধ করলেন।

সংহিতা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, "আপনারা এটা কী করছেন বলুন তো! যারা মানুষ খুন করছে বিনা কারণে, যারা দেশদ্রোহিতা করছে তাদের মোকাবিলা করতে পারছেন না, কিন্তু নিরপরাধ কিছু মানুষকে জেরা করার নামে নাজেহাল করে ভাবছেন প্রচুর কাজ হচ্ছে! দিস ইজ ব্যাড।"

"ম্যাডাম, আপনি জানেন না, জঙ্গলমহলে যাদের নিরপরাধ বলে আপাত

চোখে মনে হয় তারাই মাওবাদীদের শক্তি জোগাচ্ছে।”

“আপনি হরিহরকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছেন?”

“কেন?”

“ও যে হাবাগোবা নয় তা একজন ডাক্তারই বলতে পারেন।”

“না, তা করা হয়নি।”

“চমৎকার। আপনার কী মনে হয়, কোনও হাবাগোবা লোক গুপ্তচরের কাজ ঠিকঠাক করতে পারে?”

“তা সম্ভব নয়।”

“তা হলে ওর তক্তাপোশের তলায় মাওবাদীদের পোস্টার অন্য কেউ লুকিয়ে রেখে আপনাদের খবর দেওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক?” সংহিতা বলল, “হরিহরের দাদাদের থানায় ধরে এনে জেরা করলে আপনাদের কাছে নতুন তথ্য আসতে পারে।”

“নিশ্চয়ই করব।” মাথা নাড়লেন অফিসার, “কিন্তু একজন মাওবাদীর সঙ্গে দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করেও এই মেয়েটি কিছুই জানতে পারল না, এটা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।”

“আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। কিন্তু সব স্বামী কি বাইরে কী করছেন তা ফিরে এসে স্ত্রীকে জানান? আপনি যে-পুলিশ অফিসার হিসেবে যেসব তদন্ত করছেন তা স্ত্রীকে রোজ বলেন? আপনিই ভেবে দেখুন!”

“না। সরকারি চাকরিতে গোপনীয়তা রাখতেই হয়।”

“মাওবাদীদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ।”

“ঠিক আছে। যদি হরিহরের বিরুদ্ধে কেস ওঠে তা হলে ওকে কোর্টে যেতে হবে।”

“অবশ্যই যাবে। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।”

অফিসার উঠে দাঁড়ালেন, “আপনি একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তার ওপরে একজন বড়সাহেব আপনার কথা বলেছেন। আমি কথা দিচ্ছি প্রমাণ ছাড়া কোনও স্টেপ নেব না।”

অফিসার চলে গেলে দরজা বন্ধ করে সিক্তা কাঁদতে বসল। সংহিতা বিরক্ত হল, “কী হচ্ছে এটা?”

“আমাকে তুমি ছাড়িয়ে দাও।”

“তারপর?”

"আমার জন্যে পুলিশ তোমাকে বারে বারে বিরক্ত করছে। আমার কপালে সুখ সহ্য হবে না, কোথাও শান্তিতে থাকতে পারব না!"

"প্রেম করে যার সঙ্গে ঘর ছাড়লে তার সম্পর্কে খোঁজখবর করোনি কেন?"

"কেউ বলতে পারত না। সবাই বলত ও ভাল রোজগার করে। ভাল মানুষ। আর ঘর যদি না ছাড়তাম তা হলে এতদিনে আমার সর্বনাশ করে ওর দাদারা বদনাম দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত। কতবার ওকে বলেছি এই কথা। শুনে বোকার মতো তাকিয়ে থেকেছে। বোঝেইনি।"

"এরকম ছেলের সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দিল কেন?"

"অনেক জমি আছে, খাওয়াপরার অভাব নেই দেখে ঘাড় থেকে নামাতে চাইল।"

"আমি ছাড়িয়ে দিলে কোথায় যাবে?"

"ঝাড়গ্রামের মাসির কাছে ছাড়া যাওয়ার তো জায়গা নেই। মাসি রাজি না হলে আমি খারাপ হয়ে যাব।" কান্না মেশানো গলায় বলল সিক্তা।

"খারাপ হয়ে কী করবে?"

"মদ খাব, সিগারেট খাব, সব মেনে নেব।"

জোরে হেসে ফেলল সংহিতা। কান্না থামিয়ে বড় চোখে তাকে দেখল সিক্তা।

সংহিতা বলল, "তুমি তো দেখতে পাচ্ছ মিলাকে। ও মদ খাচ্ছে, সিগারেট টানছে। তা হলে ও কি খারাপ হয়ে গেছে?"

উত্তর দিল না সিক্তা। মাথা নিচু করল।

সংহিতা হাসল, "আসুক সে। তাকে বলতে হবে সে একটা খারাপ মেয়ে।"

"না।" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সিক্তা, "না, বোলো না। উনি খুব ভাল।"

"তা হলে এই যে বললে—!"

"আমি আগে কাউকে দেখিনি। মিলাদিদিকে বললে আমি মুখ দেখাতে পারব না।"

"ঠিক আছে। কাল থেকে অনেক ছুটোছুটি আছে, ঝামেলা বাড়িয়ো না। যাও।"

রাত্রে মিলার সঙ্গে কথা বলল সংহিতা। প্লাস্টিক সার্জারির ব্যাপারটা সম্পর্কে তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। টিকলির শরীরকে তৈরি করতে নিশ্চয়ই অনেকবার অপারেশন টেবিলে নিয়ে যেতে হবে। প্রথম কথা, এইসব করার সময় যদি ওর প্রাণসংশয় হয় তা হলে জয়ব্রত তাদেরই দায়ী করবে। দ্বিতীয়ত, খরচের পরিমাণ না জেনে এগোনো উচিত হবে না। জয়ব্রত যে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারবে না তা জানিয়ে দিয়েছে।

মিলা সংহিতার সঙ্গে একমত হল। বলল, "তুমি ঠিকই বলছ। হয়তো ওকে দেখার পর আমার ভেতরের আবেগ সক্রিয় হয়েছে। কাল ডক্টর কী বলেন তা শোনা যাক। আমি কিন্তু অন্য কিছু ভাবছি। টিকলির এই চিকিৎসা নিশ্চয়ই বছরখানেক ধরে চলবে। এর মধ্যে যদি জয়ব্রতবাবুর কিছু হয়ে যায় তা হলে কী হবে? মোটামুটি চেহারা ফিরে পেলেও ওর চোখ নিয়ে সমস্যাটা থাকছে। সে দুটো কী অবস্থায় আছে, অপারেশন করে ঠিক করা যায় কিনা তা আমরা কিছুই জানি না। জয়ব্রতবাবু না থাকলে কোথায় ফিরে যাবে সে?"

"আমি জানি না। জয়ব্রত ওর জন্যে কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করেছে কিনা!"

"যাক গে। এসব ভাবনা ভেবে তো কোনও লাভ নেই। কালকের দিনটা যেতে দাও। ডক্টরের কথা শোনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।" মিলা উঠে গিয়েছিল।

ভোর ভোর উঠতে হবে বলে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরেছিল ওরা। খাওয়ার আগে একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিয়েছিল সংহিতা। ঘুম যখন ভাঙল তখন ভোর পাঁচটা। একটানা ঘুমোনোয় শরীর বেশ ঝরঝরে। আর তখনই খেয়াল হল, আজ রাত্রে সে স্বপ্নটা দেখেনি। এরকম তো গত কয়েকদিন হয়নি। একটু একটু করে সে শেষ বিচারের দিন পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ বিচারের পরেও কয়েকটা স্তর আছে। তা হলে সেসব স্তরের স্বপ্ন সে দেখল না কেন? যদি গোটা স্বপ্নটা একটা সিডিতে রেকর্ডেড থাকত আর রোজ একটু একটু করে দেখা যেত তা হলে—! না, আমি স্বপ্ন দেখব বললেই স্বপ্ন দেখা যায় না। এই পৃথিবীর অনেক মানুষ হয়তো কোনও দিনই স্বপ্ন দেখেনি। যে-কোনও রকম স্বপ্ন! স্বপ্ন কী তাই তারা জানে না। কিন্তু তার স্বপ্নের শেষটা যদি আর কখনও না দেখতে পায়! খুঁতখুঁত করতে লাগল মন।

অ্যাম্বুলেন্সে শুয়ে টিকলি এল নার্সিংহোমে। সঙ্গে জয়ব্রত। সংহিতা লক্ষ করল, আজ জয়ব্রতকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে। টিকলিকে যখন নামানো হচ্ছে তখন মিলা এগিয়ে গেল ওর পাশে, "টিকলি, কষ্ট হয়নি তো আসতে?"

রুমালে ঢাকা মাথা, কালো চশমার আড়ালে চোখ, গলা থেকে পায়ের পাতা অবধি নাইটিতে ঢাকা, টিকলি শরীর না নাড়িয়ে বলল, "না। তুমি কে? হলুদ শাড়ি?"

"হ্যাঁ।" মিলা উত্তর দিল।

টিকলিকে ভরতি করে নিল নার্সিংহোম। ওর বিছানার পাশে বসল জয়ব্রত, "এবার তুই ঠিক হয়ে যাবি মা।"

"সত্যি বলছ?"

"সত্যি। নইলে এঁরা এতদিন পরে তোর জন্যে কেন আসবেন?"

"এরা? হলুদ শাড়ির সঙ্গে আর কে?"

মিলা আর সংহিতা ওদের কথা শুনছিল। মিলা জবাব দিল, "আমার বন্ধু।"

"আচ্ছা, আমি কি আবার দেখতে পাব?" টিকলি জিজ্ঞাসা করল।

"আমরা সবাই তাই আশা করছি।" মিলা জবাব দিল।

"তখন আমি চোখ খুললেই বাবা আর তোমাকে চিনতে পারব। তুমি কি এখনও হলুদ শাড়ি পরে এসেছ?" টিকলি জিজ্ঞাসা করল।

"না গো। আজ পরিনি। কিন্তু যেদিন তুমি প্রথম দেখবে, সেদিন অবশ্যই পরব।"

ভরতির ব্যাপারে যা কিছু সই-সাবুদ তা সংহিতাই করল। নার্সিংহোম আপাতত কুড়ি হাজার টাকা আগাম হিসেবে নিল। সংহিতাই তার ক্রেডিট কার্ড মারফত পেমেন্ট করল। মিলা তখন টিকলির কেবিনে ছিল। নীচে নেমে এসে জানতে পেরে বলল, "আমার মাথা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস তুমি ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে রেখেছিলে। আমি তো একদম খালি হাতে চলে এসেছি।"

"বেশ করেছ। চলো, এখন আর এখানে থেকে কোনও লাভ হবে না। এঁদের কাজ এঁরাই করুন। বরং সন্ধেবেলায় আসা যাক। ডক্টর মালহোত্রা তখন জানাবেন বলেছেন।" সংহিতা কথাগুলো বলে চারপাশে তাকাল, "জয়ব্রত কোথায়?"

মিলা মুখ ঘুরিয়ে দেখল। জয়ব্রত রিসেপশনের কাছেপিঠে নেই। বলল, "একটু আগে তো কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন।"

"ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাওয়া উচিত।" সংহিতা এগিয়ে গেল খোঁজার জন্যে। মিনিট চারেক পরে ওরা বুঝতে পারল জয়ব্রত নার্সিংহোমের ভেতরে নেই। সংহিতা বলল, "দেখলে? সব গেছে কিন্তু জেদ এখনও যায়নি। ওই শরীর নিয়ে একাই ফিরে গেছে।"

মিলা বলল, "জেদ বোলো না। ভদ্রলোক বোধহয় এখন তাঁর অতীতের ব্যবহারের জন্যে খুব লজ্জিত বোধ করছেন। এ নিয়ে আর কথা না বলাই ভাল।"

ওরা নার্সিংহোমের বারান্দায় বেরিয়ে আসামাত্র ড্রাইভারকে দেখতে পেল। দ্রুত এগিয়ে আসছে। সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "কী ব্যাপার?"

"ম্যাডাম, ওই ভদ্রলোককে আমি গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছি।" ড্রাইভার বলল।

"কোন ভদ্রলোক?" সংহিতার কপালে ভাঁজ পড়ল।

"ওই যে, যাঁর মেয়েকে ভরতি করতে আপনারা এসেছেন।"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছ মানে? উনি চাননি?"

"না না। আমি দেখলাম উনি নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এই এইখানে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর কোনওরকমে এক পা-দু'পা ফেলে এগোতে গিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম ওঁর শরীর খারাপ হয়েছে। তাই গাড়ি এখানে এনে ওঁকে তুলে বসিয়ে দিলাম একপাশে। উনি সেই থেকে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। আমি কী করব তা বুঝতে পারছিলাম না।" ড্রাইভার জানাল।

ওরা দ্রুত গাড়ির কাছে চলে এল। পিছনের সিটে দরজার গায়ে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রয়েছে জয়ব্রত। সংহিতা সেদিকের জানলায় চলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "শরীর খুব খারাপ লাগছে?"

চোখ খুলল জয়ব্রত, "তেমন কিছু নয়। দিন কয়েক হল মাঝে মাঝে ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে। আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

"তোমার হোমিওপ্যাথ ডাক্তারকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?"

"জানি না।"

সংহিতার মনে পড়ল। সে তার মোবাইলের ব্যবহৃত নম্বরগুলো থেকে সেই হোমিওপ্যাথের নম্বর বের করে বোতাম টিপল। ভদ্রলোক ফোন ধরতে সে জয়ব্রতর শারীরিক অবস্থাটা জানাল। ডাক্তার বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হচ্ছে এখন অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা করালে ওঁর কষ্ট খানিকটা কমবে। এক কাজ করুন। ওঁকে একজন হেমাটোলজিস্টের কাছে নিয়ে যান। আমি নাম ফোন নম্বর সব বলছি, নিয়ে নিন।"

সেটা মোবাইলে লোড করে নিয়ে সংহিতা বলল, "ওর ডাক্তার তো হাত তুলে নিল। এই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বলল।"

কথাগুলো মিলাকে বলছিল সে, কিন্তু জয়ব্রত বলে উঠল, "কোথাও যেতে হবে না। আমাকে যদি তোমরা দয়া করে পৌঁছে দাও বাড়িতে—, প্লিজ।"

সংহিতা মিলার দিকে তাকাল। মিলা ইশারায় তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "ভদ্রলোকের অবস্থা ভাল বলে মনে হচ্ছে না। ওঁকে এখনই হাসপাতালে ভরতি করা দরকার। মুশকিল হল, কোন হাসপাতালে ওঁর চিকিৎসা হতে পারে তাই জানি না।"

সংহিতা বলল, "ঠাকুরপুকুরের ক্যান্সার হসপিটালের সুখ্যাতি আছে। কিন্তু তারা তো ওর পুরনো রেকর্ড জানতে চাইবে। তা ছাড়া কোনও ডাক্তার রেফার না করলে ওরা ভরতি করবে কিনা তাও জানি না।"

"কিন্তু একটা চেষ্টা করা দরকার। টিকলির সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ওঁর বেঁচে থাকা দরকার। এতদিন ওই কেমোর পর আর কোনও চিকিৎসা হয়নি, রোগ কী অবস্থায় আছে কে জানে। চলো, যাই ঠাকুরপুকুরে।"

মিলা সামনে বসল। সংহিতা জয়ব্রতর সঙ্গে পিছনে, দূরত্ব রেখে।

ভাগ্য সাহায্য করল। ঠাকুরপুকুরের একজন ডাক্তার সংহিতাকে দেখেই এগিয়ে এলেন, "আপনি? কী ব্যাপার?"

কোনও একটা অনুষ্ঠানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বলে মনে করতে পারল সংহিতা। সে ব্যাপারটা খুলে বলতেই ডাক্তার বললেন, "কোনও সমস্যা নেই, চলুন, ভরতি করিয়ে নিতে বলছি। তবে আজই ওর পাস্ট রেকর্ড দিয়ে যাবেন।"

মিলা বলল, "গোড়ার দিকে অ্যালোপ্যাথি করিয়েছিলেন, কেমোও হয়েছিল। কিন্তু তা বহু বছর আগে। তখনকার বিভিন্ন টেস্টের রিপোর্ট

যদি পাওয়া যায় তা হলে কি তা কাজে লাগবে? এতগুলো বছর তো হোমিওপ্যাথের কাছে চিকিৎসায় ছিলেন। এই সময় কোনও কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে কিনা তা জানি না।"

"সর্বনাশ। এরকম বোকামি কেউ করে! আসুন।"

ডাক্তারের নাম সৌমিত্র দত্ত। তিনি উদ্যোগ না নিলে ভরতি করা সম্ভব হত না। জয়ব্রত সমানে প্রতিবাদ করে যাচ্ছিল। সে হোমিওপ্যাথিতে ভাল আছে। তা ছাড়া বাড়িতে মাসি ছাড়া কেউ নেই। সেটাও তো সমস্যা।

কিন্তু দুই মহিলা ওর কথায় কর্ণপাত করল না। ডক্টর সৌমিত্র দত্ত বললেন, "আমরা আজই সব কিছু পরীক্ষা করছি। চোখের তলা, আঙুল দেখে মনে হচ্ছে হিমোগ্লোবিন বেশ কমে গিয়েছে। আপনারা ওঁর অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা জমা দিয়ে যান। আমার কার্ডটা রাখুন। রাত ন'টার পর ফোন করবেন।"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "আপনার এক্সপেরিয়েন্স কী বলে?"

"কিছুই প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না। আমরা ভাল কিছু হোক এই আশা করছি।"

সংহিতাকে আবার ক্রেডিট কার্ডের সাহায্য নিতে হল। এবারও কুড়ি হাজার টাকা জমা দিয়ে দিল ও। গাড়িতে বসে মিলা বলল, "অনেক খরচ হল তোমার!"

হেসে উঠল সংহিতা, কিন্তু কোনও কথা বলল না।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই ডক্টর মালহোত্রার ফোন এল, "ম্যাডাম, আমি ঘণ্টাখানেক ফ্রি আছি। আপনি কি এর মধ্যে একবার নার্সিংহোমে আসতে পারবেন?"

মিলার দিকে তাকাল সংহিতা। তারপর বলল, "নিশ্চয়ই।"

"ধন্যবাদ।" ফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক।

সংহিতা বলল, "ডক্টর মালহোত্রা এখনই কথা বলতে চাইছেন।"

"তাই? ঠিক আছে, তুমি রেস্ট নাও, আমি যাচ্ছি।" মিলা উঠে দাঁড়াল।

"ভদ্রলোক তোমাকে চেনেন না। আমাকে তো তোমার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিতে হবে।"

সংহিতার কথা শেষ হতেই মিসেস কপুরের ফোন এল। প্রথমে তিনি জানালেন যে, ডক্টর মালহোত্রার চেক এসে গেছে। সংহিতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে

তিনি জমা দিয়ে দিতে পারেন। কাগজপত্র তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তারপর মিসেস কপুর জিজ্ঞাসা করলেন, "আর দেরি করা ঠিক হবে না। এখনই এগজিবিশন করলে ঠিক কতগুলো ছবি পাওয়া যাবে?"

"আমি এখন ছবিতে মন দিতে পারছি না মিসেস কপুর। এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কয়েকদিন পরে কথা বলব।" সংহিতা দ্রুত ফোন রাখল।

নার্সিংহোমের চেম্বারে ইজিচেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ডক্টর মালহোত্রা। সংহিতারা ঘরে ঢুকলে বললেন, "আসুন, আসুন, আমি একটু এখানেই বসে কথা বললে নিশ্চয়ই আপনারা আমাকে অভদ্র ভাববেন না।"

"না না। বিশ্রাম নিন আপনি। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি।" সংহিতা বলল।

"গোটা দিনে এই সময়টুকুই নিজের জন্যে রাখি। তারপরেই তো ছুটতে হবে। মনে হল, এই সময়েই আপনার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারি। বসুন।"

কিছুটা দূরের চেয়ারে বসে সংহিতা মিলার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিল। মিলা যে কত ভাল শিল্পী, বিদেশে বেশ নাম করেছে ইত্যাদি বলায় ডক্টর মালহোত্রা বললেন, "খুব খুশি হলাম। একদিন সময় বের করে আপনার কাজ দেখতে হবে।"

মিলা বলল, "টিকলির ব্যাপারে আপনার ওপর নির্ভর করে আছি।"

"টিকলি? ও, মেয়েটি! আপনার কে হয় ও?"

"আমার কেউ হয় বলতে পারছি না। গতকালই সংহিতার সঙ্গে গিয়ে ওকে প্রথম দেখলাম।"

"আই সি!" ডক্টর মালহোত্রা বললেন, "দেখুন, অনেকটা সময় চলে গিয়েছে। পুড়ে যাওয়া শরীরের চর্বি, মাংস দুর্ঘটনার এক বছরের মধ্যে যে-অবস্থায় ছিল এখন তা নেই। আমি ডাক্তারি পরিভাষা ব্যবহার না করে বলছি অবহেলায় ফেলে রাখায় শরীরের ওইসব অনেক শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সব প্রথম আমাকে জানতে হবে আপনারা কী চাইছেন?"

মিলা বলল, "ওকে অপারেশনের মাধ্যমে স্বাভাবিক চেহারায় ফিরিয়ে আনা যায় না?"

"কাজটা এখন খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহী। ওকে অন্তত দেড় বছর চাই আমার।"

"এই দেড় বছরে কতগুলো অপারেশন হবে?"

"আই ডোন্ট নো। কাজে না নামলে বলতে পারব না। প্রথম ছয় মাসের পর ছবিটা স্পষ্ট হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার দক্ষিণা ছাড়াও প্রচুর খরচ হবে।"

"আন্দাজ পেতে পারি?" মিলা জিজ্ঞাসা করল।

"এই মুহূর্তে বলা অসম্ভব। অন্তত দশ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা রাখা উচিত।"

"যা করার আপনি করুন। টাকার জন্যে আটকাবে না।" মিলা উঠে দাঁড়াল। সংহিতা অবাক হয়ে তাকাল মিলার দিকে। মিলা ক্রমশ অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে তার কাছে।

এখন চারধারে তপ্ত বাতাস, পায়ের তলার জমিও উত্তপ্ত। সে অবাক হয়ে দেখল সেই বৃদ্ধ তার পাশে কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন নিচু গলায় বলল, "আমি জীবনে অনেক পাপ করেছি, কিন্তু প্রতিদিন একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করতাম, একজন গরিব অসুস্থকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়ে দিতাম। এই কারণে আমি কি এখন ক্ষমা পেতে পারি না?"

আর একজন কথা বলল, "যদি কেউ পরিকল্পনা করে ভাল কাজের দ্বারা পাপ ঢাকতে চায়, তা হলে তাকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। তারপর ঈশ্বর বিচার করবেন সে পাপমুক্ত হয়েছে কিনা! আমি শুনেছি নরকের আগুন খুব ভয়ংকর। বহু হাজার বছর ধরে উত্তপ্ত হওয়ায় সেই আগুনের রং কালো হয়ে গিয়েছে। সেই আগুনের তুলনায় পৃথিবীর আগুন অনেক শীতল, আরামদায়ক। সেই আগুনে প্রবেশ করতে হবে পাপীদের। সেই আগুনে রয়েছে অগ্নিসর্প। তাদের আকৃতি বিশাল। আছে ঘোড়ার মতো চেহারার বিছে। ওরা কামড়ালে বিষ ভয়ানক যন্ত্রণা ছড়িয়ে দেবে।"

এই সময় ঝড় উঠল। আগুনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। আর্তনাদ প্রবল হওয়ায় শিউরে উঠল সে। আমি কী করেছিলাম? আমি কোনওদিন কাউকে আঘাত দিইনি। কখনওই গর্বিত বোধ করে কাউকে অবহেলা করিনি। জীবনে সুরাপান থেকে দূরে থেকেছি। যে-ব্যাপারে আমার কোনও জ্ঞান নেই সে-ব্যাপারে কাউকে কখনও উপদেশ দিইনি। আমি কখনওই আত্মহত্যার কথা ভাবিনি। আমি মানুষ দূরে থাক, কোনও জীবকেই হত্যা করিনি। আমার ওপর যে-অন্যায় অবিচার হয়েছিল, তা মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু, হ্যাঁ,

আমি আহত এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে সেই অন্যায়কারীকে অভিশাপ দিয়েছিলাম। একমাত্র সেই কারণেই কি আমাকে নরকের প্রচণ্ড আগুনে প্রবেশ করে অগ্নিসর্পের কামড় খেতে হবে?

সে যখন এইসব ভাবছিল তখন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছিল। সে অনুভব করল, বৃদ্ধ তার ডান হাত শক্ত করে ধরে রেখেছেন। ক্রমশ সে এবং তাকে ধরে রাখা বৃদ্ধ একটা চুম্বকের টানে যেখানে গিয়ে পৌঁছোল সেখানে ত্রয়োদশীর আলো ছড়ানো। সেই পাহাড়ি পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই জলের শব্দ আবার কানে এল। বাঁক নিতেই অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ সাঁকো ঝুলে আছে। সাঁকোর নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উন্মত্ত জলের ধারা। আকাশবাণী হল, "তোমরা নিশ্চয়ই এখন আগুনের তাপে তৃষ্ণার্ত হয়ে আছ। তোমরা স্বচ্ছন্দে ওই নদীর জল পান করে তৃষ্ণা দূর করতে পারো।"

সে দেখল বৃদ্ধ তাকে ছেড়ে ওই শরীর নিয়ে দৌড়ে গেলেন নদীর কিনারে। আঁজল ভরে জল নিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ঈশ্বর, তুমি মহান।"

সে ধীরে ধীরে জলের কাছে গেল। কীরকম সাদাটে জল! সে পান না করে জলে নামল। একটু একটু করে সে এগিয়ে যেতেই জল তার বুক স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর হালকা হয়ে গেল, মনে হল সমস্ত ক্লেদ শরীর থেকে দূর হয়ে গেল। সে নদীতে ডুব দিতেই স্নিগ্ধ হয়ে গেল মন। যেন হৃদয়ের পূর্বগগনে সূর্য উঠল। সে ফিরে এল পাড়ে। আর তখনই আকাশবাণী হল, "তোমাদের জন্যে এই মুহূর্তে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে প্রবেশের আগে তোমাদের শেষ পরীক্ষা দিতে হবে। ওই সাঁকোর ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে তোমাদের। যে-মুহূর্তে সাঁকোতে পা রাখবে, সেই মুহূর্তে বহু নীচে বয়ে যাওয়া নদীর জল আগুনের চেয়ে উত্তপ্ত হয়ে যাবে। যদি পূর্বজীবনের কোনও পাপের জন্যে ওই সাঁকো থেকে পড়ে যাও তা হলে নিমেষে ভস্মীভূত হয়ে যাবে।"

সে অবাক হয়ে দেখল সমস্ত শারীরিক অসুবিধে উপেক্ষা করে বৃদ্ধ দৌড়োতে লাগলেন সাঁকোর দিকে। যাওয়ার আগে তার দিকে একবারও তাকালেন না। পড়ি কি মরি করে বৃদ্ধ দৌড়োতে চেষ্টা করলেন সাঁকোর দিকে। অবাক হয়ে ওঁর যাওয়া দেখল সে।

ঘুম ভেঙে যেতে জানলার বাইরে অপূর্ব মোলায়েম আকাশ দেখতে পেল সংহিতা। কিন্তু স্বপ্ন বুকের পাঁজরে যে-চাপ তৈরি করেছিল, তা এখনও মিলিয়ে যায়নি। সে বড় বড় শ্বাস ফেলল। তারপর বিছানা ছেড়ে চলে এল জানলার পাশে। সূর্য ওঠেনি, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে গোটা আকাশজুড়ে তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। সংহিতা চোখ বন্ধ করতেই শব্দ দুটো মনে এল, হৃদয়ের পূর্বগগনে সূর্য উঠছে। না, এভাবে কোনওদিন ভাবেনি সে। সামনের আকাশে লালের সঙ্গে সোনারং মিশছে। স্বপ্নে শব্দ দুটো তৈরি হলেও তাকে চাক্ষুষ করার অবকাশ পায়নি সে। মনে হল, এই যে সামনে যা দেখছে তার সঙ্গে বোধহয় তেমন কোনও পার্থক্য নেই।

কিন্তু এই স্বপ্নগুলো দেখছে কেন সে? টিভি ধারাবাহিকের মতো পরপর স্বপ্নগুলো আসছে না। কখনও পিছিয়ে যাচ্ছে, কখনও সামনে। কিন্তু আজ স্বপ্ন শেষ হল যেখানে, সেখান থেকেই স্বর্গে যাওয়ার সাঁকো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তা হলে কি ঈশ্বর নামক মহাশক্তিমান তার জন্যে স্বর্গের ব্যবস্থা করে রেখেছেন! ওইসব অগ্নিসর্প অথবা অগ্নিবিছের কামড় তাকে খেতে হবে না?

হেসে ফেলল সংহিতা। কৈশোর পার হওয়ামাত্র যার বিয়ে হয়েছিল অথচ প্রেম পায়নি এবং সেই বিয়ে ভেঙে গেল বিনা অপরাধে, মহাশক্তিমান ঈশ্বর তার সেই ক্ষতিপূরণ করলেন না অবহেলায়, তার জীবনে বাবাই তো ঈশ্বরের ভূমিকা নিয়েছিলেন। ডিভোর্সের পর সারাক্ষণ পাশে থেকে ডিপ্রেশনের অন্ধকার থেকে টেনে তুলে নতুন করে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। একটু একটু করে যখন পায়ের তলায় মাটি জমছিল ঠিক তখনই জয়ব্রতর সঙ্গে আলাপ। সরকারি কলেজে ছবি আঁকা শেখাত সে। ওর সম্পর্কে কিছুই না জেনে মনে হয়েছিল জয়ব্রতর সঙ্গ পেলে সে অনেক কিছু পাবে। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা শেখাতে পারেন, কাজটা জানেন ভালভাবেই কিন্তু নিজে সৃষ্টি করতে পারেন না। কোথায় যেন পড়েছিল, জীবনে কখনও খেলেননি এমন মানুষ কোচ হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন। নিজে জলে না নেমেও বিখ্যাত সাঁতারু তৈরি করেছিলেন কেউ কেউ। দীর্ঘকাল আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করেছেন অথচ নিজে ছবি আঁকেননি, আঁকলেও তাঁর কোনও এগজিবিশন হয়নি এমন উদাহরণের অভাব নেই।

সংহিতা যখন জেনেছিল ভদ্রলোক বিবাহিত এবং একটি সন্তানের জনক

তখন বিষণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু যেই জানল সেই মহিলা জয়ব্রতকে ত্যাগ করে প্রেমিকের সঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে, তখন সমস্ত বিষণ্ণতা উধাও হয়ে আকর্ষণের তীব্রতা বাড়িয়েছিল। মনে হয়েছিল ওই একলা মানুষের পাশে তার থাকা উচিত। আর জয়ব্রত তাকে গ্রহণ করেছিল সুন্দরভাবে। সংহিতা বুঝেছিল, জয়ব্রতর মনে তার জন্যে ভালবাসা তৈরি হয়েছে। কিন্তু কখনওই জয়ব্রত শোভনসীমার বাইরে পা বাড়ায়নি। একা নিঝুম দুপুরে ঘরে বসে সে ছবি নিয়ে কত কথা বলে গেছে, তাকে উৎসাহ দিয়েছে, কিন্তু কখনওই তার শরীরের দিকে হাত বাড়ায়নি। বরং টিকলিকে এগিয়ে দিয়েছে তার সামনে। মনে হয়েছিল টিকলিকে সে বোঝাতে চায় মা চলে যাওয়ার ক্ষতি অনেকটা পূর্ণ করে দিতেই সংহিতার আসা।

সূর্য উঠল। মাথা নাড়ল সংহিতা। সেসব দিন কবে চলে গিয়েছে। এখন মনে করা মানে পুরনো সাদা কাগজে শুকিয়ে যাওয়া জলের দাগে আঙুল বোলানো। কিন্তু তারপর? প্রায় তিন দশক সে ছবির পর ছবি এঁকে গিয়েছে। একটু একটু করে গোটা ভারতের শিল্পরসিকরা তার নাম জেনেছে। এখন তার ছবি অনেকের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। তার কোনও অর্থাভাব নেই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাকে হারাতে হয়েছে বাবা এবং মাকে। যাওয়ার আগে মা অবশ্য তার সাফল্যের খানিকটা দেখে গিয়েছেন। তিনিই স্বামীর বাড়ি বিক্রি করে মেয়ের কাছে এসে ছিলেন শেষ কয়েকটা বছর।

তারপর শূন্যতা। এই ফ্ল্যাটে ঢোকার পর আর কেউ তার পাশে নেই। সিক্তার আগে দু'বছর, ছয় মাস, কখনও কয়েকদিন একের পর এক মেয়ে এসেছে এই ফ্ল্যাটে কাজ করতে। তাদের সবার নাম এখন মনেও নেই। কিন্তু তাদের উপস্থিতি এক ধরনের নিরাপত্তার আভাস দিলেও তারা তো সঙ্গী হতে পারে না।

আশ্চর্য ব্যাপার, তৃতীয়বার কোনও পুরুষের সান্নিধ্যের কথা সে ভাবতেই পারল না। প্রচুর স্তুতি, প্রচুর আয়োজন এই জীবনে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও মন সায় দেয়নি। কেউ কেউ আড়ালে তার সম্পর্কে বাঁকা কথা বলে। ফ্রিজিড উওম্যান। যার কোনও উত্তাপ নেই। ওর সঙ্গে থাকা মানে ডিপফ্রিজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বসে থাকা। ঘুরে ঘুরে কথাগুলো কানে আসত। অনীশদার ছবি তার ঠিকঠাক পছন্দ হত না। কোনও এগজিবিশনে দেখা

হলেই বলতেন, গলা খুলে তার প্রশংসা করতেন। লোকটার যত দুর্নামই থাক, কখনওই তাকে বিব্রত করেননি। তবে তাঁর মুখে কিছু আটকাত না। একদিন বললেন, "ওহে, শুনলাম পৃথিবীর যাবতীয় প্রেমকে তুমি কবরে শুইয়ে দিয়েছ।"

"বুঝলাম না!" সে হেসে ফেলেছিল।

"ছেলেছোকরারা বলছিল। প্রেম থেকে তুমি এক লক্ষ হাত দূরে। তা আমি বললাম, তা হলে ওর ছবিতে এত প্রেম থাকে কী করে!"

"কী জবাব পেলেন?"

"অশিক্ষিতরা কী জবাব দেবে? শুধু একজন বলল, ওর প্রেম বরফ হয়ে গেছে। কাছে গেলেই উত্তর মেরুর বাতাসটাকে টের পাওয়া যায়। আমি বললাম, কই, আমি তো কখনও টের পাইনি। বরং ওকে আমার মরূদ্যান মনে হয়।" বলে হো হো করে হেসে ওঠেন, "বেশ আছ, স্বধর্মেই থেকো চিরদিন।"

কিন্তু আফশোস হয় এখন। এইরকম থাকার কথা কি তরুণ বয়সে ভাবতে পারত? ছবি আঁকার সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়গুলোতে যে একাকী মনে হয় তা অস্বীকার করবে কী করে? বারংবার নিজেকে বুঝিয়েছে, দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ঢের ভাল। যা কিছু কষ্ট তা সে নিজের বুকেই রেখে দিয়েছে কিন্তু প্রত্যাঘাত করেনি, কারও সঙ্গে নতুন করে জড়াতে চায়নি।

তখনই মিলার কথা মনে এল। মিলার কোনও শেকড় নেই। ওর যা ভাল লাগে তাই করে, তার জন্যে কারও কাছে কৈফিয়ত দেয় না। সিগারেট খায়, নেশা করে, যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে তাৎক্ষণিক সম্পর্কে জড়ায়। কলকাতা আর ভিয়েনা তার কাছে ভিন্ন শহর নয়। ওর সঙ্গে অন্য কোনও বাঙালি শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়কের বিন্দুমাত্র মিল নেই। কলকাতায় এসেই সে জানিয়েছিল, এক বিদেশি বন্ধুর সঙ্গে কয়েকদিন বাস করতে পণ্ডিচেরিতে যাবে। ওর ক্ষেত্রে এরকমটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মেয়ে টিকলির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সমস্ত প্রোগ্রাম বাতিল করে দিল? ডক্টর মালহোত্রা যে-বিপুল খরচের কথা বলেছেন, তা এককথায় মেনে নিয়েছে। মিলার আর্থিক সংগতির কথা তার জানা নেই। আজ ইউরোপের এক ইউরো মানে ভারতের প্রায় পঁয়ষট্টি টাকা। ডলারের থেকে ঢের বেশি। তাই মিলা ওখানে ছবি এঁকে যা রোজগার করে তা নিশ্চয়ই প্রচুর। কিন্তু প্রচুর হলেই অপরিচিত একটি

অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার জন্যে খরচ করতে হবে? ও নিজে যে-জীবনযাপন করে তার সঙ্গে এই মানসিকতার সম্পর্ক কতখানি? মিলা কত সহজে টিকলির কাছে সংহিতা সেজে গেল। সংহিতা সাজলে টিকলি তাকে গ্রহণ করবে বলে ওই অভিনয় করল সে। কী লাভ ওর?

মিলা চা খেতে এল বারমুডা আর গেঞ্জি পরে। চায়ে চুমুক দিয়ে সে বলল, "আমি তোমাকে একটা কথা বলছি, তুমি না বলবে না।"

সংহিতা বলল, "বেশ তো শুনি।"

"টিকলির ব্যাপারে যা খরচ হবে, তার দায়িত্ব আমাকে নিতে দাও।"

"কেন?"

"কেন আবার? ধরে নাও, ইচ্ছে হয়েছে। কিছুদিন মূর্তি গড়ার চেষ্টা করেছিলাম। বুঝতে পারলাম ওটা আমার জন্যে নয়। টিকলি এখন মাংসের তাল। ডক্টর মালহোত্রা তাকে মূর্তি বানাবেন। আমি ওই কাজে সাহায্য করব।" মিলা চায়ের কাপ নামাল।

"দু'দিন আগে এটা তোমার জানা ছিল না।"

"ছিল না। আমি আগামীকালের কথা ভাবি না। আমি প্রতিদিনের জন্যে বাঁচি। আজ মনে হচ্ছে এই কাজ করলে তা আমাকে সুখ দেবে। ব্যস, আই ওয়ান্ট টু ডু দিস।"

"আগামীকাল যদি মনে হয় কাজটা করতে ভাল লাগছে না, তখন কী হবে?"

"তা হলে তুমি আমাকে চেনোনি। আমি যে-কাজটা ধরি তা শেষ না করে ছাড়ি না। এই যে আমি ভিয়েনায় থাকি, ইউরোপে ঘুরে বেড়াই, কারণ কলকাতায় গোটা বছর পড়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না। কোনও পুরুষকে বেশি দিন ভাল লাগে না, আমি কী করব? এইভাবে ষাট বছর দিব্যি চালিয়ে দিতে পারব।" মিলা বলল।

"এই ছটফটানির পিছনে কি কোনও আঘাত বা দুঃখ আছে?"

"বিন্দুমাত্র নয়। আমি একটা থিয়োরিতে বিশ্বাস করি। কিছুদিন একসঙ্গে থাকার পর পরিস্থিতি যদি আমাকে বাধ্য করে ছেড়ে চলে যেতে তখন একটুও দুঃখ পাই না। উলটে ভাবি, কিছু ভাল ভাল মুহূর্ত পেয়েছি বলেই তো একসঙ্গে ছিলাম। সেই ভাল মুহূর্ত পাওয়ার জন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই।

ভেবে দেখো, ওই সব মুহূর্তগুলো যা আমি এতকাল পেয়েছি, তা একসঙ্গে আমার মনে এলে কী আনন্দ যে হয়!"

"বুঝলাম। ষাট বছর পার হলে?"

"ফাইন। একটা নির্জন ঘুমঘুম পাহাড়ি শহরে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকব। আর কুয়াশা দেখব।" শব্দ করে হেসে উঠল মিলা।

"সত্যি তোমার তুলনা নেই!"

"ছাড়ো! তোমাকে কিন্তু এখনই বেরুতে হবে।"

"কোথায়?"

"আশ্চর্য! ভুলেই বসে আছ। কাল জয়ব্রতবাবুকে হাসপাতালে ভরতি করে এসেছ, আর খোঁজ নিয়েছ?"

"নিয়েছিলাম কাল সন্ধ্যায়। নতুন খবর পাইনি।"

"ভদ্রলোক একা রয়েছেন। ওঁর বাড়িতেও খবর দিতে হবে। নিশ্চয়ই হাসপাতালে ওঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া দরকার।" মিলা বলল।

সংহিতা অবাক গলায় বলল, "তুমি যে এত প্র্যাকটিকাল জানতাম না। চলো।"

জয়ব্রতর কাজের মহিলাটি ওদের দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। গতকাল বাপ-মেয়ে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে চলে যাওয়ার পর আর কোনও খবর নেই। গোটা রাত সে জেগে কাটিয়েছে। সংহিতা অনেক বুঝিয়ে ওকে শান্ত করল। জয়ব্রত দিন কয়েকের মধ্যে চিকিৎসা করিয়ে ফিরে আসবে, টিকলির ফিরতে একটু দেরি হবে। মিলা প্রৌঢ়ার হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলল, "তোমার খাওয়ার জন্যে এ থেকে বাজার করে নিয়ো। আর ওরা যদ্দিন না আসে বাড়িটাকে দেখো।"

টাকা হাতে পেয়ে প্রৌঢ়া খুশি হল।

জয়ব্রতর ব্যবহারের জন্যে যা দরকার তা একটা প্যাকেটে নিয়ে ওরা যখন আবার গাড়িতে উঠল, তখনই টেলিফোন এল নার্সিংহোম থেকে। ডক্টর মালহোত্রা আজ দুপুরেই প্রথম অপারেশনটা করবেন। কিন্তু তার আগে পেশেন্টের বাবাকে নার্সিংহোমে এসে কয়েকটা কাগজে সই করতে হবে। সংহিতা জানাল, "পেশেন্টের বাবা খুব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি

হয়েছেন। তাঁর বদলে আমি সই করলে হবে?"

"আপনার নাম।"

নাম বলতেই মহিলা বললেন, "হ্যাঁ, পারেন। ডক্টর মালহোত্রা আপনার নামই রেকর্ডে রেখেছেন। প্লিজ, এগারোটার মধ্যে চলে আসুন।"

ওরা প্রথমে টিকলির নার্সিংহোমেই গেল। অপারেশন করার জন্যে যেসব সই প্রয়োজন হয় সংহিতা তা করে দিল। তাদের জানানো হল, "ডক্টর মালহোত্রা ঠিক একটার সময় কাজ শুরু করবেন। আপনারা সেই সময় থাকলে ভাল হয়।"

যদিও তখন ভিজিটার্সদের পেশেন্টের কাছে যাওয়ার সময় হয়নি, তবু আজই অপারেশন হবে বলে ওদের অনুমতি দেওয়া হল। কেবিনে ঢুকে ওরা দেখল টিকলি বেডে বসে আছে, সামনে পা দুটো, পেছনে বালিশের পাহাড়। মিলা কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বসে থাকতে ভাল লাগছে?"

টিকলির মুখ ঈষৎ ফিরল, "হলুদ শাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার শুতে ভাল লাগে না। তুমি কোথায় ছিলে?"

"আমাকে তো এখানে থাকতে দেবে না, তাই বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম।"

"তোমার বাড়িতে কে কে আছে?" টিকলি জিজ্ঞাসা করল।

"কেউ নেই। আমি একা।" মিলা বলল।

"তা হলে তুমি আমাদের বাড়িতে চলে এসো।"

"তুমি সেরে ওঠো, হাঁটাচলা করো, তখন যাব।"

এই সময় নার্স কেবিনে ঢুকলেন, "আমি ওকে অনেকবার বলেছি। ডক্টর মালহোত্রা এমন একজন ডাক্তার যিনি কখনওই হেরে যান না। তুমি আবার হাঁটতে পারবে, বসতে পারবে, আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখতে লাগবে তোমাকে।"

"হলুদ শাড়ি, নার্সদিদি ঠিক বলছে?"

"একদম ঠিক।" মিলা বলল।

নার্স বলল, "ওমা! এ কী কথা। তোমার মাসির কি নাম নেই?"

"থাক নাম। আমি হলুদ শাড়ি বলেই ডাকব। আচ্ছা হলুদ শাড়ি, আমি কি আবার দেখতে পাব?" টিকলি যেন এখন একটু ক্লান্ত।

"নিশ্চয়ই। আগে শরীরটা ঠিক হয়ে যাক, তারপর চোখের চিকিৎসা হবে।"

সংহিতা চুপচাপ শুনছিল। নার্স মিলাকে একটা টুল এগিয়ে দিলে সংহিতা ইশারায় মিলাকে বাইরে আসতে বলল। মিলা বেরিয়ে এলে সংহিতা বলল, "তুমি ওর কাছে থাকো। তুমি কাছে থাকলে ও মনে জোর পাবে। আমি ঠাকুরপুকুর থেকে ঘুরে আসি। যদি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তা হলে তোমাকে তুলে বাড়ি চলে যাব। লাঞ্চ করে আবার একটার মধ্যে এখানে আসতে হবে।"

মিলা একটু ভাবল, তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ভেতরে চলে গেল।

এখনও শহরে ব্যস্ততা প্রবল হয়নি। গাড়ি ছুটছিল ঠাকুরপুকুরের দিকে। মিলার কথা ভাবলেই অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে সংহিতার। সেটা না মজার, না খারাপ কিছুর। মেয়েটা কী সহজে টিকলির কাছে সংহিতা হয়ে গেছে। আজ বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বারমুডা ছেড়ে শাড়ি পরে এসেছে এবং সেই শাড়ির রঙে হলুদ রয়েছে। ও যেন একটু একটু করে মিলার স্বভাব ভুলে সংহিতা হয়ে যেতে চাইছে। মুশকিল হল, সংহিতা বুঝতে পারছে না সে কেন খুশি হতে পারছে না!

ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে পৌঁছে ব্যাগ থেকে কার্ডটা বের করল। গত রাতে সে দু'বার ফোন করেছিল, প্রতিবারই শুনেছে আউট অফ রিচ। গাড়ি থামামাত্র সে কার্ডের নম্বরে ফোন করল। এবার ডাক্তারের গলা পাওয়া গেল, "হ্যালো।"

"নমস্কার। আমি সংহিতা বলছি। গতকাল আমার পরিচিত একজনকে...।"

তাকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কাল পেশেন্টকে ভরতি করিয়ে একদম নিপাত্তা হয়ে গেলেন?"

"অনেক ঝামেলার মধ্যে আছি ডাক্তার। কিন্তু আমি আপনার কথামতো রাতে ফোন করেছিলাম। আউট অফ রিচ বলছিল।" সংহিতা জবাব দিল।

"আপনি কখন আসতে পারবেন?"

"আমি এসেই গিয়েছি। আপনাদের হাসপাতালেই আমি।"

"ওঃ। আমার নামটা নিশ্চয়ই কার্ডে দেখেছেন। চলে আসুন।"

ডাক্তার একা ছিলেন না। ওই ঘরটিতে আরও তিন জন ডাক্তার বসে গল্প করছিলেন। সংহিতাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "কিছু মনে করবেন না, জয়ব্রতবাবুও শুনলাম আর্ট কলেজে পড়াতেন। কিন্তু উনি আত্মহত্যা করতে চাইছেন কেন? এতদিন চিকিৎসা না করিয়ে থাকা তো আত্মহত্যার শামিল। আপনারা এটা অ্যালাও করলেন?"

মাথা নাড়ল সংহিতা, "বহু বছর যোগাযোগ ছিল না। কয়েকদিন আগে জানতে পারলাম যে, উনি অসুস্থ।"

"কিছু মনে করবেন না, জয়ব্রতবাবুর সঙ্গে আপনার—।"

"পরিচিত।" কথা শেষ করতে দিল না সংহিতা।

"ওঁর চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন?"

খুব দ্রুত দ্বিধা সরিয়ে দিয়ে সংহিতা বলল, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু উনি এখানে থাকতেই চাইছেন না।"

"আমি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। আসুন।"

ডাক্তার ওকে যে-ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে আরও তিন জন পেশেন্ট রয়েছেন। সংহিতা দেখল জয়ব্রতর শরীরে রক্ত এবং স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। তাকে দেখে জয়ব্রত বলল, "আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।"

"কেন?"

"আমি হোমিওপ্যাথিতেই ভাল থাকব।" জয়ব্রত অন্য দিকে তাকাল।

"ছেলেমানুষি করার বয়স কি এখনও গেল না?" সংহিতা নিচু গলায় বলল।

ডাক্তার বললেন, "আপনি কথা বলুন। যাওয়ার আগে দেখা করে যাবেন।"

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সংহিতা লক্ষ করল বাকি তিন জন পেশেন্টের মধ্যে এক জন তার দিকে তাকিয়ে, বাকি দু'জন ঘুমোচ্ছেন।

সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি চিকিৎসা করাতে চাইছ না কেন?"

"কারণ এই চিকিৎসার খরচ চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"বেশ। তুমি কেন আমাকে বারংবার ফোন করেছিলে?"

"আই অ্যাম সরি।"

"সরি মানে? আমাকে হ্যামার করে করে বাড়িতে নিয়ে গেছ কেন?"

"টিকলির ব্যাপারটা নিয়ে কী করব বুঝতে পারছিলাম না, তাই।"

"তুমি ওকে মেরে ফেলতে পারতে! বাপ হয়ে মেয়েকে মারতে না পারার কান্না কাঁদার কী দরকার ছিল! মেরে জেলে যেতে। বিচারের আগেই মৃত্যু এসে যেত।"

"আমি পারিনি।" দু'পাশে মাথা দোলাল জয়ব্রত।

"কিন্তু তুমি তাই করতে চাইছ?"

"মানে?"

"আজ মেয়েটার প্রথম অপারেশন হবে। যিনি করবেন তাঁর বিশ্বাস টিকলি আবার আগের চেহারায় ফিরে যাবে। হয়তো চোখের দৃষ্টিও ফিরে পেতে পারে। কিন্তু তুমি যদি আত্মহত্যা করো তা হলে মেয়েটার কী হবে? যে-মুহূর্তে জানতে পারবে তুমি নেই সেই মুহূর্তেই ও ভেঙে পড়বে। তুমি বেঁচে আছ, অনেকটা সুস্থ হয়েছ জানলে ও লড়াই করতে জোর পাবে। নার্সিংহোম ওকে টানা রাখবে না। মাঝে মাঝেই ওকে বাড়িতে গিয়ে থাকতে হবে। তখন কোন বাড়িতে যাবে? যে-কোনও মানুষই চাইবে নিজের বাড়িতে যেতে। তুমি পৃথিবীতে না থাকলে ও সেখানে কার কাছে থাকবে?" একটানা প্রশ্ন করে গেল সংহিতা।

উত্তর দিল না জয়ব্রত। চোখ বন্ধ করল।

"ও হাঁটাচলা করুক, নিজের ওপর আস্থা ফিরে আসুক, তুমি চাও না?"

"চাই।"

"তা হলে ততদিন তোমাকে পৃথিবীতে থাকতে হবে।"

"কিন্তু এই চিকিৎসার তো বিপুল খরচ—!"

"ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।"

"অসম্ভব!"

"কেন?"

"আমি তোমার কাছে কী করে হাত পাতব?"

"হাত পাতার কথা উঠছে কেন?"

"আমাকে বেঁচে থাকতে হবে তোমার দয়া নিয়ে। আমার ভুলের জন্যে যে-তুমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে একদিন, সেই তুমি আজ আমাকে বাঁচাতে এসেছ? নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না সংহিতা।" চোখ দিয়ে জল

গড়িয়ে এল জয়ব্রতর।

"সন্তানের জন্যে বাবা-মাকে অনেক ত্যাগ করতে হয়। আমার বাবাও সব ছেড়ে দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। টিকলির জন্যে যদি এটুকু করো তা হলে মেয়েটা বেঁচে যাবে। ওর জীবনের চেয়ে কি তোমার এই মানসিকতা বেশি মূল্যবান?"

জয়ব্রত অনেকক্ষণ কথা বলল না। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "কতদিনে ও সুস্থ হবে?"

"আমি ডাক্তার নই যে, সময়টা বলতে পারব।" উঠে দাঁড়াল সংহিতা।

"আমাকে এখানে কতদিন থাকতে হবে।"

"এখানকার ডাক্তার যতদিন থাকতে বলবেন। প্লিজ জেদ ধোরো না। আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি। তোমার কিছু জিনিস এই প্যাকেটে নিয়ে এসেছি। কাজের লোককে বুঝিয়ে বলেছি। সে ঠিক থাকবে। আমি আবার কাল আসব।" ঘর থেকে বেরিয়ে এল সংহিতা।

ডাক্তার রাউন্ডে বেরিয়েছিলেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলার জন্যে অপেক্ষা করতে হল ঘণ্টাখানেক। মুখোমুখি হলে তিনি বললেন, "জয়ব্রতবাবু যদি আগে আসতেন তা হলে অবস্থা এতটা খারাপ হত না। আমার সামনে একটাই পথ খোলা আছে। ওর শরীরে রক্ত বাইরে থেকে দিলে তেমন কাজ হবে না। ওঁর শরীরকেই রক্ত তৈরি করতে হবে, যে-কাজটা প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে বলে ধারণা করছি। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।"

"বলুন।"

"ওঁর টাইপের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাবে এমন একজন ডোনার দরকার যার বোনম্যারো বের করে জয়ব্রতবাবুর শরীরে স্থাপন করতে হবে। এই অপারেশন এখন আর তেমন কঠিন নয়। আপনি নিশ্চয়ই জানেন একজন সুস্থ লোক তার একটা কিডনি ডোনেট করে অসুস্থ মানুষকে বাঁচাতে পারেন। যিনি দান করলেন তাঁর ক্ষতি হয় না বলাই যেতে পারে। বোনম্যারোর ক্ষেত্রেও ডোনারের কোনও ক্ষতি হয় না। জয়ব্রতবাবুর ক্ষেত্রে অপারেশন যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব তত ওঁর পক্ষে ভাল হবে।" ডাক্তার বললেন।

"কিন্তু ডোনার কোথায় পাব?"

"আত্মীয় বন্ধুদের বলুন। তবে শর্ত হল ওঁর টাইপের সঙ্গে ডোনারের মিল থাকা অত্যন্ত জরুরি। টাকার বিনিময়ে ডোনার হয়তো পাওয়া যাবে কিন্তু

আমি সাজেস্ট করব আত্মীয় বন্ধুদেরই অ্যাপ্রোচ করুন। দেখুন, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সেরকম কয়েক জনকে পাওয়া যায় কিনা। পেলে আমরা তাঁদের পরীক্ষা করব।"

সংহিতা ভেবে পাচ্ছিল না কে বোনম্যারো ডোনেট করতে রাজি হবে!

সে মাথা নাড়ল, "আমি চেষ্টা করব।"

"ও হ্যাঁ, আপনি একবার অফিসে গিয়ে কথা বলুন।" ডাক্তার চলে গেলেন।

অফিস থেকে বলা হল যে-ইঞ্জেকশনগুলো এখন জয়ব্রতকে দেওয়া হচ্ছে তার দাম বেশ বেশি। তাকে আরও বিশ হাজার এখনই জমা দিতে বলা হল। ব্যাগ খুলে ক্রেডিট কার্ড বের করে দিল সংহিতা।

ঠিক পৌনে একটায় নার্সিংহোমে পৌঁছে গেল সংহিতা। মিলা বলল, "তোমাকে ডক্টর মালহোত্রা দেখা করতে বলেছেন। উনি এসে গিয়েছেন।"

"তুমিও চলো।" সংহিতা এগোল।

"জয়ব্রতবাবু কেমন আছেন?"

"চিকিৎসা শুরু হয়েছে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বেটার লেট দ্যান নেভার। চেষ্টা করছেন ডাক্তার। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছে।" সংহিতা দাঁড়াল।

"কী?"

"ডোনার চাই যিনি বোনম্যারো ডোনেট করবেন। যে-কেউ হলে চলবে না, যাঁর সঙ্গে ওর সব কিছু মিলে যাবে তাঁকেই দরকার। কোথায় পাব তাঁকে?"

মিলা বলল, "আগে টিকলির অপারেশন হোক তারপর ওটা নিয়ে ভাবব।"

ডক্টর মালহোত্রা তাঁর চেম্বারে বসে ল্যাপটপে ব্যস্ত ছিলেন। সংহিতাদের দেখে যন্ত্রটা বন্ধ করে বললেন, "ভাল খবর। মেয়েটির রক্ত কোনও সমস্যা তৈরি করবে না। ওই অবস্থায় দীর্ঘকাল পড়ে থাকলে রক্তে চিনি বেড়ে যায়, ইউরিক অ্যাসিডও সীমা ছাড়ায়। বাট আওয়ার টিকলিকে অলমাইটি কোনও প্রবলেম দেননি। আশা করছি আজ খানিকটা কাজ করে ফেলতে পারব।"

সংহিতা বলল, "আমি এই চিকিৎসার কিছুই জানি না। একদম নির্বোধের

মতো প্রশ্ন করছি, আপনি কি আজ জুড়ে থাকা শরীরের অঙ্গগুলো ছাড়াবার চেষ্টা করবেন?"

"প্রথমেই তো ওর রূপ নয়, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলোকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা উচিত। তাই না?" ডক্টর মালহোত্রা বললেন, "ওহো! যে জন্যে আপনাকে খবর দিতে বলেছিলাম সেটা মিটে গেছে। টিকলির ব্লাড গ্রুপ খুব কমন নয় আবার রেয়ার বলাও চলে না। নার্সিংহোম সেই সমস্যার সমাধান করেছে। আপনাদের এক জন যদি ব্লাড ডোনেট করেন তা হলে নার্সিংহোম প্রয়োজনে পেশেন্টদের সাহায্য করতে পারবে।"

মিলা বলল, "নিশ্চয়ই। আমরা অফিসে গিয়ে কথা বলছি।"

এই সময় ইন্টারকমে ডক্টর মালহোত্রাকে জানিয়ে দেওয়া হল, ওটিতে সবাই তৈরি। ডক্টর সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পা ফেলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আজ দুপুরে খাওয়া হয়নি। মিলা তা সত্ত্বেও আজই রক্ত ডোনেট করতে চেয়েছিল, সংহিতার আপত্তিতে আগামী কাল দেবে বলে ঠিক করেছিল। টিকলিকে ঘুমন্ত দেখে এসেছে ওরা। বিকেলের চা ফ্ল্যাটে বসে খেতে খেতে মিলা বলল, "ভিয়েনাতে আমি রান্না করে খেতাম। আমার ফেবারিট ডিশ কী ছিল বলো তো?"

সংহিতা তাকাল। মিলা বলল, "নরম ভাত, মাখন, ডিমসেদ্ধ আর আলুসেদ্ধ।"

"বিশ্বাস করি না। রোজ এই খেলে তোমার ফিগার এমন থাকত না। এতদিনে ফুটবল হয়ে যেতে। ঘি বা মাখন আমি শেষ কবে খেয়েছি তা ভুলেই গিয়েছি।"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিক্তা শুনছিল, বলল, "আজ রাত্রে করব?"

মিলা বলল, "দারুণ হবে। সারাদিন তো না খেয়ে আছি, ব্যালান্স হয়ে যাবে।"

সংহিতা সিক্তার দিকে তাকিয়ে হাসল, "তাই করো। গোবিন্দভোগ আছে তো?"

"আছে।" উৎসাহিত সিক্তা ভেতরে চলে গেল।

সংহিতা বলল, "সিক্তার মুখখানা দেখলে? আজ ওকে কী রাঁধব তা

ভাবতে হবে না, পরিশ্রমও বেঁচে যাবে। ভিয়েনাতে ভাল চাল পেতে?"

"বাসমতী।" মিলা বলল, "হ্যাঁ, জয়ব্রতবাবুর ব্যাপারটা বলো।"

"আমি অনেক ভাবছি কিন্তু কূল পাচ্ছি না। পরিচিত কাউকে ব্লাড ডোনেট করতে বললে আপত্তি করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কিডনি বা বোনম্যারো দিতে কে রাজি হবে? কাগজে কিডনি চেয়ে বিজ্ঞাপন চাওয়া হয়। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষ কি তাতে রেসপন্স করে? অত্যন্ত গরিব মানুষ যার অন্য কোথাও টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে-ই টাকার বিনিময়ে রাজি হতে পারে। তা ছাড়া লোকে এতদিনে জেনে গিয়েছে যে, একটা কিডনি শরীর থেকে বাদ গেলে কেউ মারা যায় না। বোনম্যারো সম্পর্কে কোনও ধারণা পাবলিকের নেই।" সংহিতা বলল।

"কিন্তু কিডনি দেওয়ার চেয়ে বোনম্যারো দেওয়া অনেক সহজ, কোনও ঝুঁকি নেই। আমি ভিয়েনাতে দুটো কেসের সঙ্গে জড়িত ছিলাম।" মিলা বলল।

"একটু বুঝিয়ে বলো তো!"

"সরল করে বলছি। আমাদের শরীরের হাড়ের মধ্যে যে-মজ্জা আছে তা রক্ত তৈরি করতে সাহায্য করে। সেই রক্ত শরীর পরিশোধিত করে নেয়। লিউকেমিয়া পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে মজ্জা অকেজো হয়ে আসে। ফলে রক্ত উৎপাদন কমতে শুরু করে, শ্বেতকণিকা বাড়তে শুরু করে। বাইরে থেকে পেশেন্টকে রক্ত দিলে প্রথম দিকে একটু কাজ হলেও পরে শরীর তা নিতে পারে না। তখন পেশেন্টের হাড়ের ভেতর তাজা মজ্জা ঢুকিয়ে দিলে দেখা যায় আবার ধীরে ধীরে নতুন রক্ত তৈরি হচ্ছে। সাধারণত কুঁচকি থেকে হাঁটুর ওপরটা, হাঁটুর তলা থেকে গোড়ালির ওপর পর্যন্ত যে-হাড় আছে, যা বেশ মোটা এবং শক্ত, তাদেরই ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া দরকারে কাঁধ থেকে কনুই, কনুই থেকে কবজির হাড়ও একই কাজে লাগে।"

চুপচাপ শুনছিল সংহিতা, এবার মাথা নাড়ল, "কেউ রাজি হবে না।"

"আমার মনে হয় বিজ্ঞাপন দিলে অনেক ডোনার পাওয়া যাবে।"

"কিন্তু ডাক্তার বলেছেন যে, উনি প্রফেশন্যাল ডোনারদের চান না।" সংহিতা বলল, "তা ছাড়া লোকটাকে জয়ব্রতর টাইপ হতে হবে।"

মিলা বলল, "বিজ্ঞাপনটা দিয়েই দেখো। হয়তো ডোনার লাখ চার-পাঁচ চাইবে। টিকলির জন্যেই জয়ব্রতবাবুর বেঁচে থাকা দরকার।"

সংহিতা ওর পরিচিত একজন সাংবাদিককে ফোন করল যিনি খুব নামকরা খবরের কাগজে কাজ করেন। সব শুনে ভদ্রলোক বললেন, "বিজ্ঞাপনটায় কী থাকবে বলুন।"

সংহিতা বললে সেটা লিখে নিয়ে ভদ্রলোক পড়ে শোনালেন। সংহিতা বলল, "বিজ্ঞাপনের চার্জ কত যদি জানিয়ে দেন তা হলে আমি পাঠিয়ে দেব।"

"বিজ্ঞাপনের কপি, বিল নিয়ে একজন যাবে, তার হাতে দিয়ে দেবেন।"

আজ রাত্রে স্বপ্নটা দেখল না সংহিতা। রাত্রে একটার বদলে দুটো ঘুমের বড়ি খেয়েছিল সে। অনভ্যস্ত নরম ভাত হয়তো ঘুমটাকে গভীর করেছিল। একটানা ঘুমিয়ে যখন সিক্তার ডাকে চোখ মেলল তখন শরীর বেশ ঝরঝরে।

একটু বেশি ব্রেকফাস্ট সেরে মিলার সঙ্গে বেরিয়ে আগে নার্সিংহোমে পৌঁছেছিল তারা। টিকলি এখনও ঘুমিয়ে আছে। নার্স বললেন, "ভোরবেলায় সেন্স ফিরে এসেছিল, ডক্টর মালহোত্রা বলে গিয়েছিলেন ঘুমের ওষুধ দিতে। এখন যত ঘুমোবে তত ভাল।"

আজ মিলা তার ক্রেডিট কার্ড থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা নার্সিংহোমে অগ্রিম হিসেবে জমা দিল। সংহিতা লক্ষ করল মেয়েটার মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

আজ জয়ব্রতকে অনেকটা ভাল দেখাচ্ছিল। টিকলির খবর পেয়ে ওর মুখে খুশি ছড়িয়ে পড়ল, "কখন জ্ঞান আসবে?"

মিলা বলল, "জ্ঞান এসে গিয়েছে। এখন ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।"

সংহিতা বলল, "একটা কথা জানিয়ে রাখি, টিকলির চিকিৎসার যাবতীয় খরচ মিলাই দিচ্ছে। ও টিকলিকে সুস্থ দেখতে চায়।"

অবাক হয়ে তাকাল জয়ব্রত। অদ্ভুত গলায় বলল, "আপনি তো ওকে কখনও দেখেননি?"

মিলা হাত ওপরে তুলল, "ঠিকই। তবে এ নিয়ে কথা বলতে চাই না। আমার জীবনে কোনও ইচ্ছে প্রবল হলে আমি সেটা পূর্ণ করতে চাই। টিকলির ব্যাপারে যা করছি তা ওই ইচ্ছের জন্যে। আমার মনে হল করলে ভাল লাগবে। আর এ নিয়ে কথা নয়।"

"কী বলব আমি? টিকলির কপালে শুধু দুঃখকষ্ট ছাড়া কিছু ছিল না বলে

ভাবতাম, এখন দেখছি ভুল ভেবেছিলাম। কিন্তু আমি তো অনেক ভাল আছি। যেসব ইঞ্জেকশন, ওষুধ এখানে দিচ্ছে তা বাড়িতে গিয়েও তো দেওয়াতে পারি। তাই না?" প্রশ্নটা সংহিতাকে।

মিলা বলল, "গতকাল এসেছেন আর আজই যাই যাই করছেন? আপনার মেয়ে কিন্তু এরকম ছেলেমানুষি করেনি। আপনাকে তো এখনও ব্লাড দিচ্ছে। কোর্স শেষ হোক তারপর ওসব ভাববেন।"

জয়ব্রত ছেলেমানুষের মতোই কথা বলল, "আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কীরকম খরচ হয়েছে?"

"কেন?"

"জাস্ট, কৌতূহল হল।"

মাথা নাড়ল সংহিতা, "আমরা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।"

"ও। শোনো, দোতলায় টিকলির পাশের ঘরে গিয়ে খাটের নীচে একটা বড় প্যাকেট পাবে। দেখো, যদি কাজে লাগে।" জয়ব্রত বলল।

"কী আছে ওতে!"

"নিজের চোখেই দেখো।" চোখ বন্ধ করল জয়ব্রত।

বিজ্ঞাপনের কথা শুনে ডাক্তার বললেন, "আর কী করবেন! যারা আবেদন করবে, দেখবেন, তাদের মধ্যে কোনও প্রফেশনাল ডোনার না থাকে। এমনিতেই খুব দেরি হয়ে গিয়েছে। এই যে ওঁকে কথা বলতে দেখছেন, কোনও কোনও দিন বেশ ফ্রেশ দেখাবে ওঁকে, কিন্তু তার সঙ্গে শরীরের ভেতর যে-ক্ষয় চলছে তার কোনও সম্পর্ক নেই। ওগুলো সাময়িক ব্যাপার। যদি তিন-চার দিনের মধ্যে অপারেশনটা করতে পারতাম তা হলে লড়াই করার সময় পাওয়া যেত।"

সংহিতা তাকাল, "তেমন এমার্জেন্সি হলে আমি রাজি আছি।"

"আপনি?" ডাক্তার তাকালেন।

"বললেন তো, কোনও ক্ষতি হবে না।"

"না। তবে ডোনার অল্পবয়সি হলে ভাল হয়। ঠিক আছে, আপনার কয়েকটা টেস্ট আমরা নেব। দেখা যাক। আসুন।"

প্রথমেই বিপত্তি হল। সংহিতার ব্লাড গ্রুপ একদম আলাদা। ওর বোনম্যারো জয়ব্রতর কোনও কাজে লাগবে না। ডাক্তার বললেন, "প্রাথমিক শর্ত হল

দু'জনের একই ব্লাড গ্রুপ হতে হবে। তারপর আরও কয়েকটা টেস্ট মিলে গেলে ডোনারকে অ্যাকসেপ্ট করব আমরা।"

মিলা শুনছিল। বলল, "জয়ব্রতবাবুর সঙ্গে আমারও ব্লাড গ্রুপ মিলছে না।"

ডাক্তার বললেন, "আপনাকে বলেছিলাম জয়ব্রতবাবুর রক্তের গ্রুপ বিরল নয় আবার পেতে অসুবিধেও হয়। বিজ্ঞাপনে ব্লাড গ্রুপ মেনশন করেছিলেন?"

"না।" সংহিতার খারাপ লাগল ভুল করায়।

"তা হলে তো ঠগ বাঁছতে গাঁ উজাড় হবে।"

মিলা বলল, "আজকের কাগজে বোধহয় বিজ্ঞাপন বের হয়নি। বেরোলে ওই ভদ্রলোক ফোন করতেন। না বেরোলে ওঁকে বলো ব্লাড গ্রুপ অ্যাড করে দিতে।"

তখনই ফোন করল সংহিতা। সে শুনে আশ্বস্ত হল কারণ কাল খুব চাপ থাকায় বিজ্ঞাপনটা ছাপা যায়নি। আগামীকাল অবশ্যই বের হবে। সংহিতা ভদ্রলোককে জয়ব্রতর ব্লাড গ্রুপটা জানিয়ে বলল যাতে বিজ্ঞাপনে দিয়ে দেওয়া হয়।

দুপুরে ডক্টর মালহোত্রার ফোন এল, "ম্যাডাম। একটু আগে পেশেন্টকে দেখে এলাম। আই অ্যাম হাপি। এখন কিছুদিন ওর পিছনে লেগে থাকতে হবে। আমি মনে করছি, মাসখানেকের মধ্যে হাত আর আঙুল ফিরে পাবে।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর।" সংহিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

"আরে না না। মেয়েটির শরীর আমাদের সঙ্গে খুব কোঅপারেট করছে। বাই।"

বিকেলে নার্সিংহোমে গিয়ে টিকলির কেবিনে ঢুকতেই নার্স বলে উঠলেন, "এই যে, হলুদ শাড়ি এসে গেছেন। আজ ঘুম থেকে ওঠার পর শুধু দুটো প্রশ্ন। বাবা কোথায়? হলুদ শাড়ি কেন আসছে না? নিন কথা বলুন।"

পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়েছে টিকলিকে। মিলা পাশে বসল, "কেমন আছ?"

"খুব ব্যথা।" নির্জীব গলায় উত্তর দিল টিকলি।

"তুমি তো অনেক কষ্ট করেছ। এখন ভাল হয়ে যেতে আর একটু কষ্ট সহ্য করো।"

"আজ ডাক্তারবাবু বলেছে—!"

"কী বলেছেন?"

"আমি এক মাস পরে নিজের হাতে খেতে পারব।"

"বাঃ! তাই তো চাই।"

"আমার বাবা কোথায় গো?"

"তুমি কি জানো তোমার বাবার শরীর খারাপ?"

"জানি। বাবা আমার পাশে বসে কাঁদত আর বলত আমি মরে গেলে তোর কী হবে? আমি বলতাম, তুমি মরার আগে আমিই মরে যাব। কিন্তু আমি যখন ভাল হয়ে যাচ্ছি, তখন বাবাও ভাল হয়ে যাবে, তাই না?"

"ঠিক। কিন্তু বেশি কথা বলছ।"

"বেশ চুপ করছি, শুধু বলো বাবা কোথায়।"

"হাসপাতালে। আমরা জোর করে ভরতি করেছি।"

"আমরা মানে? তোমার সঙ্গে কে আছে?"

"তোমার আর এক মাসি।"

"ভাগ্যিস তোমরা এলে।" শ্বাস ফেলল টিকলি।

রাত্রে আজও দুটো ঘুমের বড়ি খেল সংহিতা। আজও সে স্বপ্ন দেখেনি। না দেখলে শরীর বেশ তাজা লাগে। তখনই মনে পড়ল অনেকদিন আঁকার ঘরে ঢোকা হয়নি। ছবিটা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে।

আজ সকালে মিলা চা খেতে এল শাড়ি পরে। চোখ কপালে তুলল সংহিতা, "এ কী সাজ আজ?"

"এটা তোমার শাড়ি। ওই ঘরের আলমারিতে ছিল।"

"দেখছি।"

"ফর এ চেঞ্জ—!" হাসল মিলা।

চা খেতে খেতে সংহিতা বলল, "তুমি অনেকদিন আটকে আছ। টিকলির চিকিৎসা তো এখন রুটিনে চলবে। যাও, পণ্ডিচেরি ঘুরে এসো।"

"তাড়াতে চাইছ কেন বলো তো?" মিলা রেগে গেল।

"তাড়াব কেন? তুমি এইরকম জীবনযাপনে কি অভ্যস্ত! বনের পাখিকে কি খাঁচায় ভাল লাগে?"

হাসল মিলা, "ধরে নাও এটা আমার অজ্ঞাতবাস। কেউ জানে না আমি কোথায় আছি! আমার মোবাইলের সুইচ অফ করে রেখেছি।"

সংহিতা অবাক হল "কেন?"

"ওই জীবন আগে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আমি এখন টিকলির সঙ্গ পেতে চাই। ধরে নাও, ফর এ চেঞ্জ!" হাসল মিলা।

বিজ্ঞাপনটা কাগজে ছাপা হয়েছে। সংহিতার ল্যান্ডলাইন নম্বরে প্রথম ফোন এল সকাল আটটায়। একজন ভদ্রলোক জানতে চাইলেন অন্য গ্রুপের রক্ত হলে চলবে কিনা! তাঁকে না বলতে হল। দ্বিতীয় ফোনে সংহিতাকে বোঝাতে হল বোনম্যারো ব্যাপারটা ঠিক কী! শুনে "ওরে বাবা" বলে ফোন রেখে দিলেন ভদ্রমহিলা। তৃতীয় ফোন করলেন যিনি তিনি নিজের বয়স বললেন, "বিরাশি।" বিরাশি শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিল সংহিতা। ভদ্রলোক বললেন, "বিরাশি শুনে অবাক হবেন না। আমি যে-কোনও যুবকের মতো সচল আছি। রোজ ভোরে আট কিলোমিটার হাঁটি। সম্প্রতি শেয়ারে বিশাল লস করেছি। তাই আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়েছে। আমি যদি ডোনেট করি, তা হলে কীরকম টাকা পাব?"

সংহিতা বলল, "আপনার ফোন নম্বর এবং নাম বলুন। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে দেখি, তারপর আপনাকে জানাব।"

"বেশি দেরি করবেন না প্লিজ।" নাম ও ফোন নম্বর বলে থামলেন ভদ্রলোক।

বেলা দশটার সময় ওরা বের হল। তখন পর্যন্ত আর ফোন আসেনি। সংহিতা ভেবেছিল প্রচুর ফোন আসবে তাই নিজের মোবাইল নম্বর বিজ্ঞাপনে দেয়নি। সে সিক্তাকে বলল, "তুমি এই প্যাডে যারা যারা ফোন করবে তাদের নাম আর ফোন নম্বর লিখে রাখবে। বলবে দুপুরে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব। পারবে তো?"

সিক্তা মাথা নাড়ল, "পারব।"

আজ নার্সিংহোমে পৌঁছে সংহিতা বলল, "তুমি টিকলির কাছে থাকো আমি ঠাকুরপুকুর থেকে ফেরার পথে তোমাকে নিয়ে যাব।"

ঘড়ি দেখল মিলা, মাথা নেড়ে নেমে গেল।

ঠাকুরপুকুরে যাওয়ার পথে সংহিতার বেশ মজা লাগছিল। টিকলি জানছে যে, তার দেখা হলুদ শাড়ি আবার ফিরে এসেছে। চার বছর বয়সে দেখা মুখ, মনে না থাকাই স্বাভাবিক। মিলা খুব সুন্দরভাবে ওর কাছে সংহিতা হয়ে গেছে। যদি টিকলি নাম জিজ্ঞাসা করে তা হলে মিলা নিশ্চয়ই নিজের নাম বলবে। চার বছরের স্মৃতিতে সংহিতা আর মিলার মধ্যে পার্থক্য এখন থাকা সম্ভব নয়।

ডাক্তার সজোরে মাথা নাড়লেন, "অসম্ভব। ওই বয়সের মানুষকে দিয়ে চলবে না। আপনাদের ডোনার আনতেই হবে। আমি আজ থেকেই কেমো শুরু করেছি। দুই সপ্তাহের কোর্স শেষ হলে অপারেশন করব। আমি জানি না ভদ্রলোক ধকলটা নিতে পারবেন কিনা! নিতে পারলে এবং বোনম্যারো পেলে আমি ওঁর বেঁচে থাকার ব্যাপারে আশাবাদী।"

"কিন্তু আমি ডোনার পাব কোথায়?"

"খোঁজ করুন। এ নেগেটিভ ব্লাড একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। বি নেগেটিভ হলে আমি এতটা উৎসাহী হতাম না। ওটা খুব কম মানুষের রক্তে দেখা যায়। আপনি তো কয়েকটা দিন সময় পাচ্ছেন।"

"আর কোনও উপায় নেই?" ডুবে যাচ্ছে এমন মানুষের গলা সংহিতার।

"ছিল। যদি ওঁর বয়স অনেক কম হত। তা হলে এখনই আমি ওঁর শরীর থেকে ম্যারো বের করে কেমো শুরু করতাম। কেমো যেমন রোগটাকে বাড়তে দেয় না তেমনি সমস্ত প্রতিরোধক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয়। ওঁর শরীর থেকে নেওয়া ম্যারো কতগুলো প্রসেসের মাধ্যমে উন্নত করে আবার শরীরে স্থাপন করলে সেটা কাজ শুরু করে দিত। কিন্তু এই বয়সে সেটা সম্ভব নয়।" ডাক্তার বললেন।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জয়ব্রতর কাছে গেল সংহিতা। জয়ব্রতর চোখ বন্ধ। নলগুলো সক্রিয় রয়েছে। আজ ওর মুখটাকে খুব সাদাটে মনে হল। একজন নার্স পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করলেন।

আজ সকাল থেকে টিকলির জ্বর এসেছে। সামান্য জ্বর। নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীরমুখে মিলা জানাল। সংহিতা তাকাল, "হঠাৎ?"

"নার্স বলল এরকম নাকি হতেই পারে। শরীরে কাটাকুটি হয়েছে তো!"

"ডক্টর মালহোত্রার সঙ্গে কথা বলবে?"

"দেখি, বিকেলে একবার আসব। তখনও জ্বর থাকলে—!"

"তোমার সঙ্গে টিকলির আজ কথা হয়নি?"

"হয়েছে। খুব সামান্য। ওর বাবার খবর কী?"

"কেমো শুরু হয়েছে।"

"সেটা তো অনেককাল আগে হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। অপারেশনের আগে নাকি দরকার।"

"বিরাশি বছরের ভদ্রলোকের কথা বলেছ?"

"হ্যাঁ। কাজে লাগবে না। দেখো, যাদের টাকা নেই তারা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। তার যুক্তি আছে। যার মাসে তিন হাজার টাকা রোজগার সে বাইপাস সার্জারির কথা ভাববে না। ওষুধ খেয়েই মরে যাবে। যার ক্ষমতা আছে সেও তো মাঝে মাঝে অসহায় হয়ে পড়ে, একজন ডোনারের অভাবে জীবন চলে যাচ্ছে তা পকেটে টাকা নিয়েও দেখতে হয়।"

"এদিকে কোথায় যাচ্ছ?"

"জয়ব্রতর বাড়িতে। সেই প্রৌঢ়া মহিলার সঙ্গে কথা বলে আসা দরকার।"

"ও হ্যাঁ। বুড়ির বোধহয় কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, নইলে একা ওখানে পড়ে থাকত না। শোনো, নার্সের কাছে শুনলাম টিকলির অপারেশন আপাতত চারটে দফায় হবে। প্রথম দফা হয়ে গেছে। বাকি রইল তিনটে।"

"তারপর বাড়িতে নিয়ে আসা যাবে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু—!" মিলা থেমে গেল। তারপর বলল, "আগে হোক। আমি ভবিষ্যতের কথা ভাবি না। তখন যা পরিস্থিতি হবে তেমনই করা যাবে।"

প্রৌঢ়া দরজা খুলে হাউমাউ করে উঠল। বলল, "তোমরা কেউ আমাকে খবর দাও না। একা একা ভূতের মতো বসে থাকি আর ভাবি। মেয়েটা কেমন আছে?"

সংহিতা বলল, "বেশ ভাল আছে। একবার অপারেশন হয়েছে। ক'দিন পরে নিজের হাতে খেতে পারবে।"

"সত্যি? ও মা দুর্গা, তোমার কাছে মানত করেছি—।"

"দাঁড়াও। তোমার নিজের খাওয়া দাওয়া ঠিক হচ্ছে?" মিলা জিজ্ঞাসা করল।

"যা দিয়ে গেছ তাতে তো অনেকদিন চলে যাবে। আচ্ছা, তুমি, তোমরা, বাবুর এই ফোনে আমাকে খবর দিতে পারো না?" ঘর থেকে জয়ব্রতর রেখে যাওয়া মোবাইল নিয়ে এল প্রৌঢ়া।

সেটা লক্ষ করে মিলা বলল, "চার্জার কোথায়?"

"মানে?" প্রৌঢ়া বুঝতে পারল না।

"একটা তার তোমার বাবু পিছনে ঢোকায়?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ।" সেটা নিয়ে এল প্রৌঢ়া। মিলা চার্জে বসিয়ে দিয়ে বলল, "রোজ অন্তত আধঘণ্টা এইভাবে চার্জ করিয়ে রাখবে। তা হলেই কথা বলতে পারবে।"

সংহিতা প্রৌঢ়াকে বলল, "আমি একবার ওপরের ঘরে যাব।"

"যাও না।"

সংহিতা একাই ওপরে চলে এল। টিকলির পাশের দরজায় একটা প্রায় ছন্নছাড়া ঘর দেখতে পেল সে। কোনও কিছু গোছানো নেই। বিছানার চাদরেও ময়লাটে ছাপ। ওই প্রৌঢ়া করে কী? এই ঘরে কোনও বোহেমিয়ান শিল্পী বাস করলে বলার কিছু থাকে না কিন্তু জয়ব্রত কি বোহেমিয়ান? কখনওই নয়।

ঘরে ঢুকে চারপাশে তাকাতে তাকাতে সে নিচু হয়ে খাটের তলায় চোখ রাখল। রাজ্যের জিনিসপত্র ধুলোয় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। ওখানে যে কতকাল ঝাঁট পড়েনি তা কে জানে! জয়ব্রত বলেছিল এই খাটের নীচে নাকি একটা প্যাকেট আছে, সেটা দেখতে হবে। হাত লাগাবে কিনা ভাবছিল সংহিতা, মিলার গলা পেল, "এ কী! ওভাবে বসে আছ কেন?"

"বিশল্যকরণী খুঁজছি।" সংহিতা হাসল।

"মানে?"

"খাটের নীচে প্রায় গন্ধমাদন পর্বত আছে। তার ভেতরে একটা প্যাকেট রেখেছেন জয়ব্রতবাবু। সেটা বের করে দেখতে হবে।" সংহিতা বলল।

পিছন থেকে প্রৌঢ়া এগিয়ে এল, "আমি দেখছি।"

মিলা বিরক্ত হয়ে বলল, "এই ঘরের এমন অবস্থা কেন?"

"কী করব দিদি। বাবু আমাকে এই ঘরে ঢুকতেই দিত না।" প্রৌঢ়া নিচু হয়ে জিনিসপত্র টেনে বের করতে লাগল। সুটকেস, যার রং ধুলো ঢেকে

দিয়েছে। কয়েকটা প্লাস্টিকের ঝুড়ি, প্রচুর বই এবং পত্রিকা। সব শেষে বের হল ধুলোমাখা রোল করে রাখা একটা লম্বা প্যাকেট।

সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কী?"

মিলা বলল, "আগে ওপরের ধুলো ঝেড়ে নাও।"

প্রৌঢ়া পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা করল, "প্যাকেট ছিঁড়ব?"

মিলা বলল, "আমাকে দাও।"

লম্বাটে পিজবোর্ডের নলের মুখ খুলল সে। বলল, "মনে হচ্ছে ছবি।"

"ছবি?" সংহিতা অবাক হল। তার মনে পড়ল একসময় ওইরকম শক্ত পিজবোর্ডের বড় নলের মধ্যে ছবি পাঠানো হত। ততক্ষণে মিলা সন্তর্পণে ভেতর থেকে গোল করে রাখা ক্যানভাস বের করে ফেলেছে। সেটাকে টানটান করতেই চমকে উঠল সংহিতা! সে এতটাই অবাক হল যে, মেঝেতে বসে পড়ল। মিলা ছবি দেখে বলল, "বাঃ! দারুণ ছবি। কার আঁকা? এই ছবি জয়ব্রতবাবু এঁকেছিলেন? তুমি আগে দেখেছ?" প্রশ্নটা করে সংহিতার দিকে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, "কী হল?"

সংহিতার মুখ তখন চৌচির। কান্নায় ভেঙে পড়েছে সে। দু'হাতে মুখ ঢেকেও নিজেকে সামলাতে পারছিল না। মিলা গলার স্বর নামাল, "ছবিটা তুমি চেনো?"

"হ্যাঁ।" ঠোঁট কামড়াল সংহিতা, "চিনি। খুব চিনি।"

"জয়ব্রতবাবু এত চমৎকার ছবি আঁকতেন?" মিলা মুগ্ধ হয়ে বলল।

উঠে দাঁড়াল সংহিতা, "এটা ওঁর আঁকা ছবি নয়।" ছবিটার চারটে কোণ এবং পিছন দিকটা ভাল করে দেখে বলল, "কোথাও ওঁর সিগনেচার নেই। অন্তত ওই অন্যায়টা উনি করেননি।"

"একটু খুলে বলো, আমি বুঝতে পারছি না।" খাটের ওপর ছবিটাকে রাখল মিলা।

"ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

"হ্যাঁ। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এটা তুমি এঁকেছ?"

নীরবে মাথা নাড়ল সংহিতা, হ্যাঁ।

"এত ভাল ছবি এভাবে পড়ে আছে কেন?"

"কী করে বলব! আমি জানতাম ছবিটা হারিয়ে গিয়েছে। জয়ব্রত নিজে যদি খাটের তলায় প্যাকেট খুলতে না বলত তা হলে জানতামই না।"

"কী করে হারিয়েছিল?"

"আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ছবির বিপণন আদৌ উন্নত ছিল না। এত গ্যালারিও তখন ছিল না। অ্যাকাডেমি বা দু'-একটা জায়গায় নিজেদের উদ্যোগে যে-এগজিবিশন হত তাতে দর্শক আসত হাতে গোনা, ক্রেতা খুব কম। সেসময় একটা ভাল ছবি পাঁচ হাজারে বিক্রি হলে আমরা খুব খুশি হতাম। আমাদের আগে অনেক বড় শিল্পী তো ফুটপাতের পাশের রেলিং-এ ছবি ঝুলিয়ে প্রদর্শনী করেছেন। ওই সময় জয়ব্রত আমাকে বলে দিল্লিতে একটা এগজিবিশনে ছবি দিতে। এই ছবিটা সে আমার কাছ থেকে নিয়েছিল দিল্লিতে পাঠাবে বলে।

"মাঝে মাঝে খোঁজ নিতাম ছবিটার ব্যাপারে। সে বলত ছবি বিক্রি হয়নি। যারা এগজিবিশন করেছিল তারা ফেরত পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু ছবিটার দেখা তখন পেলাম না। জয়ব্রত জানিয়েছিল ছবিটা নিয়ে যিনি ট্রেনে কলকাতায় ফিরছিলেন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কেউ বোধহয় চুরি করে নিয়ে গেছে। শুনে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এর মাস কয়েক পরে একটা স্যুভেনির আমার হাতে আসে। দিল্লিতে যে-এগজিবিশন হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য ছবিও সেখানে ছাপা হয়েছে। আমি দেখলাম আমার ছবিও ছেপেছে ওরা কিন্তু শিল্পীর নাম অমৃতা গুপ্তা। আমি অবাক হয়ে জয়ব্রতর কাছে ছুটে গেলাম। স্যুভেনির দেখে সে বলল, এটা ভুল করে হয়েছে। এটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অমৃতা গুপ্তা কে? সে বলেছিল ওই নামের কাউকে চেনে না। আমার মনে সন্দেহ হল। আমি অমৃতা গুপ্তার খবর জোগাড় করলাম। সে দিল্লির মেয়ে। জয়ব্রতর পূর্বপরিচিত। দিল্লিতে গেলে তার বাড়িতে সে ওঠে। ফোন নম্বর জোগাড় করে আমি অমৃতার সঙ্গে কথা বললাম। সে স্পষ্ট বলল, ছবিটা যখন আমার নামেই প্রদর্শিত হয়েছে তখন এ নিয়ে কথা বলব না। আপনার যদি কিছু জানার থাকে তা হলে জয়ব্রতর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।"

"আপনি জয়ব্রতর কথা বলছেন কেন? আমি জানতে চাইলাম।"

"ও আমার হয়ে ছবি কালেক্ট করে। সাধারণত আমি ওকে বলি হাফডান ছবি পাঠাতে। আমি ফিনিশ করে নেব। এ বছর—!"

"আপনি কি এর জন্যে ওকে পে করেন?"

ভদ্রমহিলা খুব জোরে হাসলেন, বললেন, "এই পৃথিবীতে কেউ কোনও

কাজ বিনা পারিশ্রমিকে করে বলে শুনিনি। লাইন কেটে দিয়েছিল অমৃতা।”

“সেটা এমন বয়স যে, নিজের সৃষ্টির ওপর প্রচণ্ড মায়া জন্মে যায়। আমার আঁকা ছবি অন্যের নামে প্রদর্শিত হয়েছে, স্যুভেনির ছাপা হয়েছে, ছবিটা যে আমার তা প্রমাণও করতে পারব না। পাগলের মতো ছুটে গেলাম জয়ব্রতর কাছে। আমি যত অভিযোগ করি তত সে হাসে। বলে, সামান্য একটা ছবি যেটা হারিয়ে গিয়েছে তাকে নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? তোমার আঁকা ছবি দেখে যারা কপি করতে ওস্তাদ, তারা এমন কপি করে দেবে যে, বুঝতেই পারবে না, কোনটা আসল কোনটা নকল। ভুলে যাও।”

“কত টাকা পেয়েছ তুমি?”

“টাকা? আমি কী করে টাকা পাব?”

“আমার ছবি ওর নামে চালাবার সুযোগ দিয়ে—!”

“কী আজেবাজে কথা বলছ?”

“আমি অনেক ঝগড়া করেছি, কেঁদেছি, কিন্তু সে স্বীকার করেনি। কী করে অমৃতার নামে আমার ছবি প্রদর্শিত হল? না, ভুল হয়ে গিয়েছে। উদ্যোক্তারাই নাকি ভুল করেছে।

“কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে ওর দু’জন ছাত্রী আমার কাছে এল। তাদের আঁকা অর্ধসমাপ্ত ছবি জয়ব্রত দেখতে নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। তারপর আর প্রমাণের দরকার হয়নি। যাকে ভালবেসেছিলাম সে এত বড় বেইমানি করবে কল্পনা করতে পারিনি।”

মিলা চুপচাপ শুনছিল। বলল, “এই ছবিটা যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে এখানে এল কী করে?”

“আমি জানি না।” সংহিতা বলল।

“জয়ব্রতবাবু কি নিজের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে এটা দিল্লি থেকে ফেরত এনেছেন?”

“কিছুই জানি না। তবে মহিলা নিশ্চয়ই বিনা পারিশ্রমিকে কিছু করেননি। যে-টাকায় কিনেছিলেন বিক্রি করার সময় অনেক বেশি চাইবেন। জয়ব্রত সেটা জোগাড় করে কেন ছবি কিনবে? কিনলে এভাবে ফেলে রাখবে কেন?” বলতে বলতে সংহিতার খেয়াল হল, “আচ্ছা, ওই পাখির দুই পায়ের মধ্যে বাংলা ‘স’ লেখা আছে কিনা দেখো তো?”

মিলা দেখল। পাখিটা একটা ভেসে যাওয়া কাঠের টুকরোর ওপর বসে

আছে। তার দুটো পায়ের মাঝখানে কোনও বাংলা অক্ষর নেই। স—তো নয়ই। সেটা শুনে সংহিতা নিজে ছবি দেখল। দেখে বলল, "এ ছবি আমার আঁকা নয়।"

"কী বলছ?" অবাক হয়ে গেল মিলা।

"হ্যাঁ। আমার অরিজিন্যাল ছবি থেকে কপি করা হয়েছে। যারা ভাল কপি করে তাদের নিশ্চয়ই জয়ব্রত চিনত। উঃ, মাগো!"

"এমন হতে পারে সেই অমৃতাই কপি করে দিয়েছে জয়ব্রতকে। আর সেটা যে অরিজিন্যাল নয় তা বুঝতে পারেনি জয়ব্রত। চলো, অনেক বেলা হয়ে গেছে।" মিলা ছবিটাকে আবার কাগজের নলের ভেতরে ঢুকিয়ে নিল।

"ওটা নিচ্ছ কেন?"

"থাক না। ওই যে কথা আছে, যাকে রেখে দিয়েছ সেও একদিন তোমাকে রাখতে পারে।" মিলা হাসল।

প্রৌঢ়াকে আর এক প্রস্থ বুঝিয়ে ওরা গাড়িতে উঠল। সংহিতা মাথা নাড়ল, "তিরিশ বছর আগে যে-ধাক্কাটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল মারাত্মক। আজ অন্য রকমের ধাক্কা পেলাম।"

মিলা কিছু বলল না। শুধু সংহিতার হাতটা চেপে ধরল।

সিক্তার একটা ভাল গুণ হল বাড়িতে ঢোকামাত্র সে যাবতীয় সমস্যার ঝাঁপি সামনে নিয়ে আসে না। আজও দুপুরের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর খাতাটা সামনে আনল, "পাঁচজন ফোন করেছিল।"

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে খাতার পাতা খুলল সংহিতা। প্রথম ফোন, যদিও একই ব্লাড গ্রুপ নয় তবু দেখা করতে চায়। দ্বিতীয় জন জানিয়েছে তার একই ব্লাড গ্রুপ। কিন্তু দশ লক্ষ টাকার নীচে রাজি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ ফোন যারা করেছিল তারা কেন করেছে জানায়নি। পঞ্চম ফোন যিনি করেছিলেন তিনি মহিলা। পঁচিশ বছর বয়স। যদি দিন সাতেকের বেশি শুয়ে না থাকতে হয় তা হলে তিনি দিতে পারেন। ব্লাড গ্রুপও মিলে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা টাকার কথা লেখেননি।

মিলাকে দেখাল খাতাটা। চোখ বুলিয়ে মিলা বলল, "পাঁচ নম্বরের সঙ্গে কথা বলো। মনে হচ্ছে কাজ হবে। কী নাম লিখেছে? ঝরনা মিত্র। দেখো।"

ফোন করল সংহিতা। যে-মহিলা ফোন ধরলেন, তিনিই পাঁচ নম্বরে আছেন।

সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি বোনম্যারোর ব্যাপার জানেন?"

"হ্যাঁ। আমার হাড়ের ভিতর যে-মজ্জা আছে তা বের করে আর এক জনের হাড়ের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। তাই তো?"

"হ্যাঁ, প্রায় সেই রকমই।"

"কিন্তু আমি সাতদিনের বেশি বাড়ির বাইরে থাকতে পারব না।"

"বোধহয় ততদিন লাগবে না।"

"কত টাকা পাওয়া যাবে?"

সংহিতা শক্ত হল, "আপনি কত টাকা চান?"

"দু'লক্ষ।"

এক মুহূর্ত ভাবল সংহিতা, "ঠিক আছে। রাজি। কাল সকালে আসতে পারবেন?"

"কাল সকালে? ঠিক আছে। আমাকে অর্ধেক টাকা অগ্রিম দিতে হবে। কাজ হয়ে গেলে ঘোরাবেন না।"

"শুনুন। আগে ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করুন। তিনি যদি আপনাকে ডোনার হিসেবে গ্রহণ করেন তা হলে টাকা আপনি পেয়ে যাবেন।"

"কোথায় যেতে হবে।"

"ঠাকুরপুকুরের ক্যান্সার হসপিটালে।" সংহিতার কথা শেষ হওয়ামাত্র ফট করে লাইন কেটে দিল ঝরনা মিত্র। সংহিতার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "আরে!"

মিলা জিজ্ঞাসা করল, "কী হল?"

"ঠাকুরপুকুরের নাম শোনামাত্র রিসিভার নামিয়ে রাখল মহিলা।"

"সে কী?" মিলা বলল, "আবার করো তো!"

সংহিতা ফোন করে শুনল সুইচ অফ! অর্থাৎ লাইন কেটে দিয়েই ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন মহিলা।

মিলা বলল, "আমার মনে হচ্ছে ওই মহিলার পক্ষে ঠাকুরপুকুরে যাওয়া কোনও কারণে সম্ভব নয়। দাঁড়াও হাসপাতালের রিসেপশনে ফোন করি।"

লাইন পাওয়া খুব মুশকিল। শেষ পর্যন্ত পাওয়া যেতে মিলা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আপনাদের ওখানে ডোনার হিসেবে ঝরনা মিত্র বলে কেউ আছেন?"

"আপনি কে বলছেন?"

"আমাদের একজন পেশেন্ট এই মুহূর্তে আপনাদের ওখানে রয়েছেন।"

"কী চান বলুন?"

"এই ভদ্রমহিলা কি আপনাদের পরিচিত?"

"না।" ফোন রেখে দিলেন ভদ্রলোক।

মিলা সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। বিকেলে নার্সিংহোমে যাওয়ার আগে সে আবার ঝরনা মিত্রকে ফোন করল। এবার রিং হল। তারপর একটি পুরুষকণ্ঠ জানান দিল। মিলা জিজ্ঞাসা করল, "ঝরনা মিত্র আছেন?"

"ও এখন বাথরুমে। কে বলছেন?"

"আমার নাম সংহিতা। আমি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম বোনম্যারোর ডোনার চেয়ে। আমার আত্মীয়ের জন্যে দরকার। উনি টেলিফোন করেছিলেন।"

"ঝরনা টেলিফোন করেছিল?"

"হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?"

"আমি ওর হাজব্যান্ড। কী বলেছে ও।"

"উনি রাজি হয়েছেন। যে-টাকা চেয়েছেন তা আমরা দেব।"

"আপনার পেশেন্ট কি এখন হাসপাতালে?"

"হ্যাঁ। ঠাকুরপুকুরে।"

"সে যাবে বলেছে?"

"পরে বলবেন বলেছেন।"

"আমি আপনাকে পাঁচ মিনিট পরে ফোন করছি।" ভদ্রলোক ফোন রেখে দিলেন।

মিলা সংহিতাকে বলল, "দারুণ একটা নাটক হবে মনে হচ্ছে।"

সংহিতা বলল, "ঝরনা তো বলেনি পরে বলব।"

"ওটা না বললে নাটকটা জানা যেত না।"

ঠিক ছয় মিনিট পরে ফোন এল, "আমি অজিত মিত্র বলছি। আপনি এখনই ওকে ফোন করে বলুন পেশেন্টকে ঠাকুরপুকুর থেকে ট্রান্সফার করেছেন। বোধহয় ও আপত্তি করবে না।"

"ঠাকুরপুকুরে ওর অসুবিধে কেন হচ্ছে?"

"কারণ আমি ওখানে চাকরি করি। ঝরনা ঠাকুরপুকুরে গেলে আমি জানতে

পারব বলে যাবে না। সাতদিনের জন্যে ও তিন-চার মাস অন্তর বাপের বাড়ি যায়। মনে হচ্ছে তখনই এইসব টাকার জন্যে করে। আমাদের ওইভাবে টাকা রোজগার করার দরকার নেই। কত টাকা চেয়েছে?"

"দু'লক্ষ।"

"আমি এসবের কিছুই জানি না। কেন টাকা রোজগার করছে, কার জন্যে করছে তা ওই জানে। আমি এখন অন্য মোবাইল থেকে কথা বলছি। ও যদি যেতে রাজি হয় তা হলে দয়া করে আমাকে জানাবেন?"

"উনি বাপের বাড়িতে গেলেই তো জানতে পারবেন।"

"ও মাসে একবার যায়। কিন্তু প্রতিবার তো ডোনেট করে না।"

"ঠিক আছে।"

"আর একটা কথা, ওর সুগার খুব বেশি।"

"অনেক ধন্যবাদ।" ফোন রেখে দিল মিলা।

সংহিতা দাঁড়িয়েছিল। মিলা গল্পটা শোনাল।

"ভদ্রমহিলার টাকার এত দরকার যে, স্বামীকে লুকিয়ে ডোনার হতে চাইছেন?"

"হ্যাঁ। সেই লুকিয়ে রোজগার করা টাকা দিয়ে কী করবেন তা নিয়ে ভাবলে অনেক গল্প তৈরি হয়ে যাবে। অতএব শ্রীমতী ঝরনা মিত্র বাতিল।"

ছবি আঁকার সময় পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্রে মন বসাতে পারছে না সংহিতা। মিলার মনে আঁকতে না পারার জন্যে কোনও কষ্ট হচ্ছে কিনা বুঝতে পারে না সে।

আটদিনের মাথায় দ্বিতীয়বার অপারেশন করলেন ডক্টর মালহোত্রা। এবার নিম্নাঙ্গে। অপারেশনের পর তিনি খুব খুশি।

এদিকে জয়ব্রতর ডাক্তার কেবলই তাড়া দিয়ে যাচ্ছেন। দিশেহারা অবস্থা সংহিতার। একদিন মিলাকে নামিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার সময় ড্রাইভার ছেলেটি গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, "ম্যাডাম, আমি বোনম্যারো দিতে চাই।"

চমকে উঠল পিছনের আসনে বসা সংহিতা, "তুমি?"

"হ্যাঁ ম্যাডাম। আপনারা রোজ যে-কথা বলেন, তা শুনতে শুনতে মনে হল নিজের রক্তটা পরীক্ষা করিয়ে দেখি। কাল রিপোর্ট পেয়েছি, এ নেগেটিভ।

আমার তো কোনও অসুখ নেই। যদি আমার ম্যারো দিয়ে ওই মানুষটার প্রাণ বাঁচে—!"

"তোমার বাড়ির লোক রাজি হবে তো?" সংহিতা রীতিমতো উত্তেজিত।

"বাড়ির লোক বলতে শুধু মা। মাকে মাসির বাড়িতে রেখে দেব। বলব বাইরে বেড়াতে যাচ্ছি। আমাকে নিশ্চয়ই খুব বেশি দিন হাসপাতালে থাকতে হবে না।" ছেলেটি বলল।

"না। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।"

"তা হলে আজই ডাক্তারবাবুকে বলুন। আমি আপনার জন্যে বদলি ড্রাইভার দিয়ে দেব।" ছেলেটি বেশ খুশি হয়ে বলল।

"এই জন্যে তুমি কত চাও?"

"টাকা! আপনি যা মনে করেন তাই দেবেন।"

"আমি একজনকে দু'লক্ষ টাকা দিতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু তার দ্বারা হবে না।"

"বাপস। না না, অত টাকা নিয়ে আমি কী করব? আপনি আমাকে একই দেবেন। কিন্তু ম্যাডাম, আমার শরীর ঠিক থাকবে তো?"

"তুমি আমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে চলো। তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন।"

বিশাল একটা ভার নেমে গেল মাথার ওপর থেকে। এখন একটাই প্রার্থনা, রক্তের গ্রুপ যখন এক তখন অন্য টাইপগুলো যেন মেলে।

হাসপাতালে গিয়ে নার্সের মুখে খবরটা শুনতে পেল সংহিতা। কাল কেমো নিতে পারেনি জয়ব্রত। এটা ভাল লক্ষণ নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে কয়েকদিনে একটু সামলে নিয়ে আবার চিকিৎসায় ফিরে আসা কেসের অভাব নেই। সে ডাক্তারের কাছে ছুটল। তাঁকে জানাল, "বোনম্যারোর ডোনার পেয়ে গেছি। আমি জানতাম না যে, আমার গাড়ির ড্রাইভারের ব্লাড গ্রুপ এ নেগেটিভ।"

"গুড। কিন্তু এখন আমাদের কিছুদিন অপেক্ষা করতেই হবে।"

"কেন?"

"ওঁর শরীরের অবস্থার অবনতি হয়েছে। রোজ ক্রমাগত রক্ত দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু—। ওঁর নাকে দেখবেন লালচে রক্ত চলে আসছে। চব্বিশ ঘণ্টার পর আমি আপনাকে সঠিক অবস্থা বলতে পারব।" ডাক্তার বললেন।

খুব নার্ভাস বোধ করল সংহিতা। জিজ্ঞাসা করল, "খারাপ কিছু, আই মিন—!"

"আমি চেষ্টা করছি। আমাদের হাসপাতালের অন্য কয়েকজন ডাক্তারও জয়ব্রতবাবুর কেস নিয়ে ভাবছেন। মুশকিল হল, উনি অনেক দেরিতে এখানে এলেন। আমরা এখন বলতে পারি ক্যান্সার প্রথম স্টেজে ধরা পড়লে নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে রোগটাকে আটকে দেওয়া যায়। জয়ব্রতকে যখন এনেছেন তখন তাঁর অসুখ তৃতীয় স্তরে পৌঁছে গেছে।" ডাক্তার বললেন।

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল সংহিতার। একটা মানুষ, সে যতই অন্যায় করুক, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছে অথচ কারও কিছু করার নেই। জয়ব্রত যদি হোমিওপ্যাথিতে চলে না যেত তা হলে হয়তো সমস্যা এত প্রবল হত না। ওদিকে টিকলি খুব ভাল উন্নতি করছে। ডক্টর মালহোত্রা খুব খুশি। জলের মতো টাকা খরচ করছে মিলা।

শেষ পর্যন্ত জয়ব্রত চলে গেল। যাওয়ার আগে তার চেতনা ফিরে আসেনি। তিন দশক আগে সংহিতা কল্পনাও করেনি ওর শেষকৃত্যে তাকে উপস্থিত থাকতে হবে। হাসপাতাল থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে মিলাই উদ্যোগ নিয়েছিল।

মাস দেড়েক পরে টিকলিকে নার্স ধরে ধরে হাঁটাতে পারল। প্রচণ্ড উৎফুল্ল টিকলি। আনন্দিত মিলাও। আর দুটো অপারেশন বাকি রয়েছে। ডক্টর মালহোত্রা বলেছেন চোখের বড় সার্জেনের সঙ্গে কথা বলতে। ওঁর কাজ শেষ হলে দরকার পড়লে চেন্নাই নিয়ে যেতে পারে টিকলিকে।

সন্ধেবেলায় সংহিতা অবাক হল। মিলা তার পুরনো মদের বোতলটা বের করে গ্লাসে ঢালছে। তাকে দেখে বলল, "আজ সেলিব্রেট করছি। খাবে?"

"নাঃ।" সংহিতা বলল, "হঠাৎ সেলিব্রেশনের কী হল?"

"বাঃ। মেয়েটা হাঁটছে। কিছুদিনের মধ্যে নিজেই হাঁটতে পারবে। গ্রিপ করতে পারছে। যখন দেখেছিলাম তখন এরকম করতে পারবে বলে ভাবতে পেরেছিলে? তাই আজ উৎসব।"

"কিছুদিন থেকে একটা কথাই মাথায় পাক খাচ্ছে।"

"বলো।"

"ডক্টর মালহোত্রা যখন ওকে ছেড়ে দেবেন, তখন কোথায় যাবে? ওই কাজের লোকের সঙ্গে তো থাকা সম্ভব নয়।" সংহিতা বলল।

মিলা জবাব না দিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল।

"কিছু বলছ না যে!" সংহিতা প্রশ্ন করল।

"বলছি না কারণ উত্তরটা আমার জানা নেই।"

"তুমি এত করলে—।"

"দেখো, টিকলির জন্যে আমি কিছু করিনি।"

"এটা তোমার বিনয়।"

"আদৌ নয়। আমি যা করেছি তা নিজের জন্যে।"

"তার মানে?"

"আমার মনে হয়েছিল করলে ভাল লাগবে তাই করেছি।"

সংহিতা মিলাকে বুঝতে পারছিল না। সে কথা না বাড়িয়ে সিক্তাকে ডেকে এক কাপ কফি দিতে বলল।

গ্লাস শেষ করে মিলা, "এবার কলকাতায় অনেকদিন থাকা হয়ে গেল। এই শহরে এতটা সময় একনাগাড়ে থাকার কথা ইদানীং ভাবিনি। যাক গে, শোনো, আমি কাল দুপুরের ফ্লাইটে মুম্বই যাচ্ছি। ওখান থেকে গোয়া। আমার এক প্রৌঢ় গোয়ানিজ প্রেমিক সমুদ্রের ধারে চমৎকার কটেজে থাকে। ওর ওখানে ক'দিন থাকব। দারুণ ব্যাঞ্জো বাজায় লোকটা।"

"তারপর?" বড় চোখে মিলাকে দেখল সংহিতা।

"আমি জানি না ওখানে ক'দিন ভাল লাগবে থাকতে। না লাগলে মুম্বই ফিরে এসে ভিয়েনায় চলে যাব। দু'মাস পরে আমার এগজিবিশন। তার জন্যে তৈরি হতে হবে।"

"তুমি এদেশ থেকে চলে যাবে?" সংহিতার গলায় হতাশা চাপা থাকল না।

"মানে? আমি প্রত্যেক বছর বেড়াতে আসি, থাকি তো বাইরে।" মিলা হাসল।

"কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে?"

"দেখো, এখন আমার এখানে কোনও কাজ নেই। দু'বেলা নার্সিংহোমে যাওয়াটাকে এখন অন্তত কাজ বলতে পারো না।"

"টিকলির কী হবে?"

"আশ্চর্য! এই প্রশ্নের উত্তর আমাকে কেন দিতে হবে?"

রেগে গেল সংহিতা, "তুমি ওর জন্যে এত করলে, কী পরিমাণ টাকা খরচ

করলে, কেন করলে? ওকে তুমি চিনতে না। হঠাৎ—! এখন মেয়েটা একটু একটু হাঁটতে পারছে, ধরতে পারছে। ডক্টর মালহোত্রা বাকি কাজগুলো করে ফেললে ওর শরীর শেপে আসবে। তারপর বছরখানেক সময় পার হলে মুখের কপালের পোড়া জায়গাগুলো ঠিকঠাক করে দেবেন। তুমি ওকে সুস্থ জীবনে ফেরার আশা দেখিয়ে চলে যাচ্ছ। তাই যদি যাবে তা হলে এসব না করলেই পারতে!"

"শোনো। মেয়েটা একটা স্তূপের মতো পড়ে ছিল। ওর বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত। মনে হয়েছিল ওর জন্যে কিছু করলে আমার ভাল লাগবে। আমি যদি না যেতাম তা হলে জয়ব্রতবাবু মরে যাওয়ার পর ওর কী হবে তা নিয়ে আমি যেমন ভাবতাম না, তুমিও না। ওকে একটু একটু করে মানুষের চেহারায় ডক্টর মালহোত্রা ফিরিয়ে আনতেন না যদি আমি পাশে না দাঁড়াতাম। আমি যা করেছি তা নিজেকে খুশি করার জন্যে করেছি। আমি এখন বেঁচে থাকি নিজের জন্যে। কাউকে আনন্দিত করার মিশন আমার নেই। দিনের পর দিন পুরুষ বন্ধু, বিভিন্ন নেশা, শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে যে-আনন্দ পেতাম তা আমারই আনন্দ। হঠাৎ মনে হল টিকলিকে নিয়ে যে-আনন্দ আমি পেতে পারি তা আগের আনন্দগুলো থেকে আলাদা। তাই আমি পছন্দ করলাম। টিকলি আমাকে তুমি ভেবে কথা বলে, ওই অভিনয় করতে বেশ মজা লাগে আমার। কিন্তু ক্রমশ এই আনন্দ আমার কাছে আকর্ষণ হারাচ্ছে। পুরুষ বন্ধু বা নেশার ক্ষেত্রে যখন অরুচি এসে যায়, তখন আমি সরে যাই। হ্যাঁ, আমি চাই মেয়েটা হাঁটাচলা করুক। চোখে দেখুক। কতটা পড়াশুনো করেছে তা জানি না! পড়াশুনো থাকলে চাকরি করুক। কিন্তু এগুলো আমি নিজের হাতে পাশে থেকে করাতে পারব না। আমি ইতিমধ্যেই ক্লান্ত। কিন্তু ডক্টর মালহোত্রার যাবতীয় বিল, নার্সিংহোমের খরচ ছাড়াও ওর চোখের অপারেশনের জন্যে যা লাগবে তা আমি দেব। আমি নিজের ক্লান্তির জন্যে সরে যাচ্ছি, পালিয়ে যাচ্ছি না। আন্ডারস্ট্যান্ড?" মিলা তার শূন্য গ্লাসে আবার হুইস্কি ঢালল।

"ঠিক আছে। কিন্তু এখন ওর পাশে কে থাকবে? কে সঙ্গ দেবে?"

"নার্স আছে। ডাক্তার আছেন। আমি যখন নিজে থাকছি না, তোমাকে থাকতে বলব না।"

"ও তো তোমার খোঁজ করবে!"

"আমার নয়, তোমার। হলুদ শাড়ি পরা মহিলার নাম সংহিতা তা ও জানে।"

"তারপর? নার্সিংহোম যখন ওকে ছেড়ে দেবে অথচ বাকি অপারেশনগুলো কিছুটা সময়ের পরে করাতে হবে তখন ও কোথায় থাকবে? কাজের লোক পারবে ওর দেখাশোনা করতে? ওর খাওয়া ইত্যাদির খরচ কে দেবে?"

"ওটা আমার দেখার কথা নয়। নো!"

"তুমি লাখ লাখ টাকা খরচ করেছ, ভবিষ্যতে করবে—!"

"সেটা ওর চেহারাটাকে মানুষের মতো করে তোলার জন্যে। এক চুমুক খেয়ে নিয়ে মিলা বলল, "ওয়েল, কোনও আশ্রমে টাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দাও। তার জন্যে যা লাগবে—!"

মিলাকে থামিয়ে দিল সংহিতা, "ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

মিলা সোজা হল, "রাখো এসব কথা। একটা গান বাজাও। সলিল চৌধুরীর কোনও সিডি আছে। ফ্যান্টাস্টিক। রাগ কোরো না, প্লিজ। আছে সলিল চৌধুরী?"

আজকের রাত্রে ঘুমের ওষুধ খেল না সংহিতা। খাওয়ার কথা খেয়ালেই ছিল না। কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না মন। বিছানায় শরীর এলিয়েও যখন দু'চোখের পাতা এক হল না, তখন উঠে আঁকার ঘরে চলে এল। অনেকদিন পরে সেই অর্ধসমাপ্ত ছবির ক্যানভাসের সামনে দাঁড়াল সে। তুলি হাতে নিয়ে কখন রাতটা কেটে গেল সে বুঝতেও পারল না।

সকালে চায়ের সময় মিলা জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে তোমার? ঘুমোওনি?"

সংহিতা হাসল, কথা বলল না।

"তোমরা বাঙালিরা এত সেন্টিমেন্টাল—!" জিভে শব্দ করল মিলা।

"তুমি বাঙালি নও?"

"কী মনে হয় তোমার? পৃথিবীর যে কোনও দেশই আমার দেশ। দাঁড়াও ফোনটা করে নিই।" কলকাতায় এসে কেনা মোবাইল ফোন বের করল মিলা।

সংহিতা জিজ্ঞাসা করল, "ওই ফোন এখনও সুইচ অফ করে রাখার কী দরকার?"

"গোয়াপর্ব চুকে গেলে ওটা অন করব।"

নার্সিংহোমে ফোন করল মিলা। সে বোধহয় গতকাল বলে এসেছিল এখন পর্যন্ত কত খরচ হয়েছে তার হিসেব করে রাখতে। অঙ্কটা শুনে বলল, "এখনও অনেক টাকা আপনাদের কাছে জমা আছে। আপনি হিসেবটা রেডি রাখবেন।"

ফোন রেখে সংহিতাকে বলল সে, "দুটো অনুরোধ করব। তুমি নিশ্চয়ই নার্সিংহোমে যাবে। ওদের কাছ থেকে হিসেবের কাগজটা নিয়ে নিয়ো।" তারপর ছোট্ট পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল, "এতে টেলিফোন, মেল নম্বর রয়েছে। ভিয়েনার ঠিকানাও। টিকলির অপারেশনের ব্যাপারে যখনই টাকার দরকার হবে আমাকে ফোন অথবা মেল করে দিয়ো। ভারতে না থাকলে ওগুলো খোলা থাকে। রোজ মেল চেক করি। তোমার কাছ থেকে খবর পেলেই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। ও.কে?"

সংহিতা কার্ডটা তুলে চোখ বোলাল।

"পারলে একবার চলে এসো ভিয়েনায়। তোমার ভাল লাগবে।"

"দেখি!" তারপর জিজ্ঞাসা করল, "আজ যাওয়ার আগে টিকলির সঙ্গে দেখা করে যাবে নিশ্চয়ই। তারপর ওখান থেকে এয়ারপোর্টে চলে যেয়ো। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।"

"দরকার নেই। তোমার সিকিউরিটিকে বললে ট্যাক্সি ডেকে দেবে এয়ারপোর্টের জন্যে।"

"তার মানে? নার্সিংহোমে যাবে না?"

শব্দ করে হাসল মিলা, "গিয়ে কী করব? নাটক? ওসব আমার পোষায় না।"

যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল মিলা। যাওয়ার আগে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে গেল।

মিলা বেরিয়ে গেলে স্নান করল সংহিতা। করার পর শরীরটা একটু ভাল লাগল। যাব না যাব না করতে করতে শেষ পর্যন্ত নার্সিংহোমে গেল সে। নার্সের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল প্যাসেজে। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, "উনি কোথায়?"

"কেন?"

"সকাল ন'টা থেকে কেবল হলুদ শাড়ির খোঁজ করছে।"

"ওকে খুব জরুরি কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছে। এখন থেকে তাই আমাকেই আসতে হবে। আপনাকে অনুরোধ করব কথাটা যেন ওকে না বলেন।"

"কিন্তু—!"

"আমাকেই হলুদ শাড়ি বলে যাতে ও অ্যাকসেপ্ট করে তা দেখবেন।"

"কিন্তু গলার স্বর শুনে তো বুঝতে পারবে।"

"বলবেন, আমার সর্দি হয়েছে, গলার স্বর একটু বসে গেছে।"

"আচ্ছা!"

কেবিনে ঢুকে নার্স বললেন, "এই যে তোমার হলুদ শাড়ি এসে গেছে।"

"তাই?" মুখ ঈষৎ ঘুরল টিকলির। অপারেশনের পরে এটা সম্ভব হয়েছে।

"কিন্তু তুমি ওকে বেশি কথা বলাবে না। সর্দিতে গলা বসে গেছে ওর।"

"ওমা! কেন সর্দি হল?"

টিকলির পাশের টুলে বসল সংহিতা। গলার স্বর যতটা সম্ভব ভেঙে বলল, "ঠান্ডা গরমে। খুব গরম পড়েছে।"

"এখানে এসি চলছে, না?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তুমি বেশি কথা বোলো না। আমার হাত ধরে থাকো।"

তিরিশ পেরিয়ে যাওয়া মেয়ে কথা বলছে প্রায় বালিকার মতো। সংহিতা তার হাত ধরল। একটু পরেই টিকলি বলল, "তোমার হাত আজ অন্যরকম লাগছে। নরম নরম। তোমার কি জ্বর হয়েছে?"

"না, সর্দিতে।"

"ওষুধ খেয়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা বাবা এখন বোম্বের হাসপাতালে কেমন আছে?"

নার্সের দিকে তাকাল সংহিতা। নার্স বললেন, "কালই তো উনি বলে গেলেন তোমার বাবার অপারেশন হবে।"

"এখনও হয়নি?"

এই গল্পটা যে মিলা তৈরি করে গেছে তা তাকে বলেনি।

সংহিতা বলল, "বোধহয় আগামীকাল হবে।"

"আমার খুব ভয় করছে।"

"কেন?"

"বাবার যদি কিছু হয়ে যায়!"

"কিচ্ছু হবে না। তুমি ভয় পেয়ো না।"

"আমি যদি চোখে দেখতে পেতাম তা হলে বাবার কাছে চলে যেতাম।"

"নিশ্চয়ই দেখতে পাবে।"

"তুমি কি আবার ভিয়েনায় চলে যাবে?"

"না। কোথাও যাব না।"

সঙ্গে সঙ্গে সংহিতার আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল টিকলি।

দুপুরে 'কলকাতা কলকাতা' বইতে বেশ কয়েকটা আশ্রমের নম্বর পেয়ে গেল সে। অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, প্রতিবন্ধীদের জন্যে আশ্রম। মা-বাবা না থাকলে অনাথ বলা হয়, কিন্তু অনাথ আশ্রমে ফোন করে জানা গেল তারা টিকলিকে অনাথ বলতে রাজি নয়। বৃদ্ধাশ্রমে জায়গা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিবন্ধীদের আশ্রমে ফোন করে জানা গেল টিকলিকে তারা গ্রহণ করতে রাজি আছে কিন্তু চোখের অপারেশনের পর দৃষ্টি ফিরে পেলে আশ্রম ছেড়ে দিতে হবে। তারা প্রতি মাসে যে-টাকা নেবে তা আদৌ বেশি নয় বলে মনে হল সংহিতার। ওই টাকায় ওরা কী পরিষেবা দিতে পারে তাতে সন্দেহ হলেও সে আগামীকাল দেখতে যাবে বলে স্থির করল।

তারপরই মনে হল টিকলি যদি নিজের বাড়িতে থাকে তা হলে কেমন হয়! একজন আয়া রেখে দিলে সে টিকলিকে সবরকম সাহায্য করবে। ওই প্রৌঢ়া এখনও প্রায় প্রতিদিন তাকে ফোন করে খোঁজখবর নেয়। টিকলি থাকলে নিশ্চয়ই সব সুবিধে-অসুবিধে প্রৌঢ়া দেখবে। এর জন্যে যে-খরচ হবে তা না হয় সংহিতাই দিয়ে দেবে। এই দুটোর মধ্যে কোনটা মেয়েটার পক্ষে বেশি ভাল হবে তা প্রতিবন্ধী আশ্রমে যাওয়ার পর সে ঠিক করতে পারবে।

বিকেলেও নার্সিংহোমে গেল সে। গিয়ে শুনল ডক্টর মালহোত্রা মাস তিনেকের জন্যে টিকলিকে বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছেন। যদি আগামীকাল ওকে সংহিতা নিয়ে যায় তা হলে ভাল হয়। নার্সিংহোম মিলার জমা দেওয়া টাকা ফেরত চাইলে দিন কয়েক পরে চেকে ফেরত দেওয়া হবে।

খবরটা টিকলির কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সে পাশে গিয়ে বসতেই টিকলি বলল, "কাল আমি বাড়িতে যাব?"

"হ্যাঁ। কয়েক মাস পরে আবার আসতে হবে।"

"কিন্তু হলুদ শাড়ি, বাবা তো বাড়িতে নেই।" টিকলি বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করল।

"হ্যাঁ। সেটাই ভাবছি।"

"এক কাজ করো। তুমি আমাদের বাড়িতে চলে এসো।"

হেসে ফেলল সংহিতা, হেসে ওর হাত ধরল।

ওরা হাঁটছিল। পশ্চিম আকাশে তখন সূর্য সবে দেখা দিয়েছে। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে দ্রুত। বৃদ্ধ হাঁটতে পারছিলেন না আর। তার ওপর শরীরের ভার রেখে খুঁড়িয়ে চলছিলেন। একসময় বললেন, "না। আর পারব না। আমাকে এখানে রেখে তুমি চলে যাও।"

সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি স্বর্গে যাবেন না?"

"আমার কপালে নেই। আমি আর হাঁটতে পারছি না।" বৃদ্ধ ককিয়ে উঠলেন।

"ঠিক আছে। আপনি বিশ্রাম নিয়ে নিন, আমি অপেক্ষা করছি।" সে বলল।

"তুমি আমাকে চেনো না, জানো না, তবু আমার জন্যে এত করছ?"

সে জবাব না দিয়ে আরও কয়েক পা হাঁটতেই বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধের শরীর তখন এলিয়ে পড়েছে। বাঁক ঘুরতেই সে দৃশ্যটা দেখতে পেল। বিশাল খাদের ওপর একটি সাঁকো ঝুলছে। সেই সাঁকোর ওপর কোনও রেলিং নেই। সাঁকোর ওপারে লম্বা গাছ এবং চোখ জুড়িয়ে যাওয়া মাঠ দেখা যাচ্ছে। খাদের নীচ থেকে প্রচণ্ড শব্দ ওপরে উঠে আসছে। বৃদ্ধকে নিয়ে সে খাদের ধারে চলে আসতেই দেখতে পেল ওই গাছগুলোর পাশ দিয়ে সুন্দর জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। অথচ এই খাদের ভেতর থেকে গর্জনের সঙ্গে উঠে আসছে গরম বাতাস। এই সময় আকাশবাণী হল, "স্বর্গে প্রবেশের আগে ওই সাঁকো পার হতে হবে। যারা মনুষ্যজীবনে কোনও গর্হিত কাজ করেনি, অহংকার, ঈর্ষা বা স্বার্থপরতায় আক্রান্ত হয়নি, কাউকে প্রবঞ্চনা করেনি, গরিব দুঃখী অসুস্থ মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছে, তারাই ওই সাঁকোতে ওঠার

অধিকারী। ওই সাঁকো পার হলেই তোমাদের মন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠবে। তখন ওই জলের ধারায় সেই তৃষ্ণা চিরকালের জন্যে মিটিয়ে নেবে। ওই জলে অবগাহন করলে তোমরা নির্মল, পবিত্র হয়ে উঠবে। তারপর জানিয়ে দেব স্বর্গের কোন দরজা তোমাদের জন্যে খোলা থাকবে।"

আকাশবাণী থেমে যেতেই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। যে-বৃদ্ধ এতক্ষণ শারীরিক অক্ষমতায় কাতর ছিলেন তিনি ছিটকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দ্রুত সাঁকোর দিকে হাঁটতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল তাঁর শরীরের যেটুকু শক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে তা একত্রিত করে তিনি সাঁকো পার হতে চান। সে পিছন থেকে ডেকে সতর্ক করল, "ওইভাবে যাবেন না। আপনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বললেন, "আমারটা আমাকেই ভাবতে দাও।"

সে দেখল বৃদ্ধ দ্রুত সাঁকোর ওপর উঠে পড়লেন। কিন্তু খানিকটা এগোতেই সাঁকো দুলতে লাগল! কোনও ধরার জায়গা নেই। বৃদ্ধ কাঁপতে কাঁপতে এগোবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সাঁকোর মাঝখানে গিয়ে তিনি আর পারলেন না। সাঁকো এমন দুলতে লাগল যে, বৃদ্ধ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। সেতু থেকে নীচে পড়তে পড়তে কোনওরকমে দুই হাতে সেতুর একটা পাটাতন আঁকড়ে ঝুলতে লাগলেন।

সে দেখল যে-কোনও মুহূর্তে বৃদ্ধ নীচে পড়ে যাবেন। বৃদ্ধকে বাঁচাতে সে দৌড়াল। সাঁকো পায়ের নীচে প্রবলভাবে কাঁপছে। বৃদ্ধর কাছে পৌঁছোতে যেন অনন্ত সময় লেগে গেল তার। তারপর নিচু হয়ে বৃদ্ধের হাত ধরতেই তার মুঠো আলগা হয়ে গেল। সে দেখল নীচে প্রচণ্ড তপ্ত নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর তরল পদার্থ দেখতে খুবই ভয়ানক। সেখানে বৃদ্ধের শরীর পৌঁছোলে মুহূর্তমাত্র দেরি হত না গলে যেত। সে দু'হাতে বৃদ্ধকে টেনে তুলল সাঁকোর ওপর। বৃদ্ধ তখন বাক্‌রহিত।

তখনই আকাশবাণী হল, "হে বৃদ্ধ। সারাজীবন যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করে তুমি ওই স্বর্গে বাস করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলে। কিন্তু এই সাঁকো দর্শনমাত্র তোমার মনে লোভ জন্ম নিয়েছিল। দ্রুত স্বর্গে পৌঁছোবার জন্যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে সাঁকো পার হতে চেয়েছিলে। এবং সেই কারণে যে তোমাকে এতটা সময় সাহায্য করেছে, তাকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা করোনি। কিন্তু তুমি তোমার উপার্জিত ধন অনাথ আশ্রমের শিশুদের

প্রতিপালনের জন্যে দান করে এসেছ বলে সাঁকোর নীচের আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত তরল পদার্থে পড়ে যাওনি। যাও, এখন সাঁকো পার হয়ে ওই গাছের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া সুমিষ্ট জলে তৃষ্ণা দূর করো।

"স্বর্গে অসুন্দরের কোনও স্থান নেই। যেই তুমি স্বর্গের দরজায় পৌঁছোবে অমনি অপূর্ব সুন্দরী ও রূপবতী পরিরা এসে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা এতদিন তোমার অপেক্ষায় ছিল। তোমাকে চিরদিনের বন্ধু হিসেবে বরণ করে নেবে তারা। কখনওই তোমাকে বিরক্ত করবে না। তোমার জন্যে ফুলের বিছানা তৈরি করে রেখেছে তারা। যাও, এখন থেকে তুমি স্বর্গসুখ উপভোগ করো।"

আকাশবাণী শেষ হতেই বৃদ্ধ তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খুব ধীরে ধীরে সাঁকো পেরিয়ে সুন্দর গাছেদের আড়ালে চলে গেলেন।

পায়ের নীচে ভয়ংকর গর্জন। সাঁকো স্থির। ওপারের সুদৃশ্য গাছগুলো এখন স্পষ্ট। সে মুখ তুলল, "হে পরমেশ্বর, আপনি কি আমার কথা শুনতে পারছেন?"

আবার আকাশবাণী হল, "ইহলোক পরলোকের প্রতিটি শব্দ আমি জানতে পারি। একটা গাছ যখন তার পাতা খসিয়ে বাতাসে ভাসিয়ে দেয়, আমি তার পতনের শব্দ অনুভব করি।"

"আপনি ওই বৃদ্ধের জন্যে যে-ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যাকে আপনি স্বর্গসুখ বলেছেন তা কি আমার জন্যেও স্থির হয়েছে?" সে চেঁচিয়ে বলল।

"না।" গম্ভীর শব্দটির প্রতিধ্বনিও শোনা গেল।

"তা হলে স্বর্গে আমার জন্যে কী ব্যবস্থা থাকছে?"

"তুমি নারী। তাই স্বর্গে পৌঁছে তুমি আমাতেই বিলীন হয়ে যাবে।"

"তার মানে?"

"তোমার মুক্তি ঘটবে আমার মধ্যে। তারপর আর তোমার কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। আমাতে মিশে যাওয়াই তোমার আনন্দ।"

এক মুহূর্ত ভাবল সে। তারপর স্বর্গকে পিছনে রেখে যেদিক দিয়ে সাঁকো ধরে এসেছিল, সেদিকে হাঁটতে শুরু করল।

তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হল, "এ কী! তুমি ভুল পথে যাচ্ছ কেন?"

সে মাথা নাড়ল, "এইটেই আমার পথ।" সে সাঁকো পেরিয়ে এল। এসে বড় বড় শ্বাস নিল।

"তুমি কী করতে চাইছ?" আকাশবাণী হল।

"আমি পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই।"

"অসম্ভব। সেখান থেকে এসে কেউ ফিরতে পারে না। তুমি কি মূর্খ যে, স্বর্গের দরজা থেকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইছ?"

"যেখানে আমার কোনও নিজস্ব অস্তিত্ব নেই সেই জায়গা আপনার কাছে স্বর্গ হলেও আমার কাছে নয়।"

সে মাথা উঁচু করে হাঁটতে লাগল পরিচিত পথ ধরে।

ঘুম ভাঙল যখন তখন বেলা ভালই হয়েছে। প্রথমে মনে পড়েনি, পরে খেয়াল হল, এর আগে যতবার সে এইসব স্বপ্ন দেখেছে, ততবার স্বপ্নের শেষে ঘুম ভেঙে গেছে প্রবল অস্বস্তিতে। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হল। স্বপ্ন ফুরিয়ে গেছে কখন কিন্তু ঘুম ভাঙেনি। আর শরীরটাও বেশ ঝরঝরে লাগছে।

বাথরুম থেকেই ল্যান্ডফোনের রিং শুনতে পেয়েছিল। বেরিয়েই সিক্তাকে কথা বলতে শুনল সে। সিক্তা বলছে, "না মাসি, আমার ফোন নম্বর তুমি কাউকে দেবে না। আমি চাই না ওরা কেউ আমাকে ফোন করুক।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমার দরকার নেই। যা ইচ্ছে করুক ওরা। রাখছি।" বলে ফোন রেখে দিল সিক্তা।

সংহিতা কিছু না বলে টেবিলে বসল। চা নিয়ে এল সিক্তা। বলল, "মাসি ফোন করেছিল। সেই যে ঝাড়গ্রামের—!"

"ও। কী ব্যাপার?"

"বলল, কাল হরিহরের বাড়ি থেকে লোক এসেছিল, আমার ফোন নম্বর চেয়েছে। মাসি জানতে চাইছিল দেবে কিনা! আমি দিতে মানা করলাম।"

"কেন?"

"কেন দেবে? ওদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"হঠাৎ কী জন্যে দরকার হল?"

"যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, সে নাকি মারা গিয়েছে।"

স্থির হয়ে গেল সংহিতা। অবাক হয়ে সিক্তার দিকে তাকাল সে।

"তার শ্রাদ্ধ হবে। তাই আমাকে খবর দিতে চায়। যাকে কখনও স্বামী বলে ভাবতে পারিনি, তার শ্রাদ্ধে আমি কেন যাব? মাসি বলল, যে এসেছিল সে বলেছে, শ্রাদ্ধে গেলে আমাকে নাকি সম্পত্তিরও ভাগ দিতে বাধ্য হবে ওরা।

আমার দরকার নেই। যাকে স্বামী ভাবিনি তার সম্পত্তি আমি নেব কেন? যা ইচ্ছে করুক।"

"এসব কথা একেবারে মন থেকে বলছ?"

"হ্যাঁ দিদি।"

এবার হাসল সংহিতা, "তুমি পরে আফশোস করবে না তো?"

"না। আমি ঠিক বলছি না দিদি?"

"একদম ঠিক। একশো ভাগ ঠিক।"

শোনামাত্র মুখে হাসি ফুটল সিক্তার। চলে গেল সামনে থেকে। ওর যাওয়া দেখল সংহিতা। একটি পড়াশুনো না জানা মেয়েও বড় মাপের মানুষ হয়ে ওঠে কখনও সখনও। এই অভিজ্ঞতা জীবনই দিয়ে থাকে।

সকাল ন'টায় সংহিতা জয়ব্রতর বাড়িতে পৌঁছে গেল। প্রৌঢ়া দরজা খুলে তাকে দেখে জোরে জোরে কেঁদে উঠল। জয়ব্রতর মৃত্যুর খবর ওকে টেলিফোনেই জানানো হয়েছিল। তারপরে ড্রাইভারকে দিয়ে কিছু টাকা পাঠানো হয়েছিল।

একটু শান্ত হলে সংহিতা বলল, "তোমাকে একবার আমার সঙ্গে নার্সিংহোমে যেতে হবে। টিকলি জানে না ওর বাবা নেই।"

"কী হবে মেয়েটার? যত ভাবি তত হাত-পা কাঁপে আমার। ওই মেয়েকে নিয়ে আমি কীভাবে এই বাড়িতে থাকব দিদি?"

"এখান থেকে নার্সিংহোমে যাওয়ার সময় যেমন দেখেছ এখন টিকলি তেমন নেই। সে হাঁটাচলা করতে পারছে ধীরে ধীরে। হাত নাড়তে পারছে। তুমি গেলে সে খুব খুশি হবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। নিজের জিনিসপত্র সঙ্গে নাও।"

"কেন?"

"ক'দিন ওর সঙ্গে থাকতে হতে পারে।"

বাড়ি বন্ধ করে দরজায় তালা দিয়ে ছোট্ট ব্যাগে জামাকাপড় ভরে প্রৌঢ়া তার গাড়িতে উঠল। নার্সিংহোম যাওয়ার পথে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সংহিতাকে জেরবার করে ফেলল সে। শেষপর্যন্ত বলল, "আমি মরে গেলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করব, মানুষকে কেন এত কষ্ট দেন? এত কষ্ট দিয়ে কী সুখ পান?"

হেসে ফেলল সংহিতা, "তোমার কি মনে হয় তিনি তোমার প্রশ্নের জবাব দেবেন?"

তখন চুপ করল প্রৌঢ়া। আঁচলে চোখের জল মুছতে লাগল।

নার্সিংহোমের অফিস যেন তৈরি হয়েই ছিল। তাদের বিল দেখল সংহিতা। প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। এত ওষুধ, ইনজেকশন ঠিকঠাক দেওয়া হয়েছে কিনা, একদিন দামি অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে পরের দিন সেটা পালটে দেওয়া হলে বাকি ওষুধগুলো কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করলে তিক্ততাই বাড়বে, লাভ কিছুই হবে না। দেখা গেল প্রায় অর্ধেক টাকা ফেরত পাবে মিলা। তার চেক সাতদিনের মধ্যে সংহিতার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। তারপর প্রৌঢ়াকে নিয়ে সংহিতা টিকলির কেবিনে পৌঁছোল।

এখন টিকলির পরনে একটা পাতলা রঙিন ম্যাক্সি। দুটো হাত আর ঘেরাটোপের ভেতরে নেই। নার্স বললেন, "এসে গেছে।"

"হলুদ শাড়ি?" সোজা হয়ে বসল টিকলি।

নার্স মৃদু ধমক দিল, "এই, তোমাকে বলেছি ওই নামে ডাকবে না।"

"ও। সংহিতা মাসি?"

সংহিতা হেসে বলল, "হ্যাঁ। তোমাকে আজ বেশ ফ্রেশ দেখাচ্ছে। আচ্ছা, বলো তো, আমার সঙ্গে কে এসেছে?" সে প্রৌঢ়াকে ইশারা করল পাশে যেতে।

প্রৌঢ়া মুগ্ধ চোখে টিকলির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সে হাত বাড়িয়ে ওর শরীর স্পর্শ করল। কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত আঙুল বুলিয়ে হেসে বলল, "ও মাসি, এতদিন আসোনি কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে টিকলিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বেশ জোরে কেঁদে উঠল প্রৌঢ়া। একটু পরে টিকলি বলতে লাগল, "ও মাসি, কাঁদছ কেন? দেখো, আমি হাত-পা নাড়তে পারছি। আমি হাঁটতে পারছি। তুমি খুশি না হয়ে কাঁদছ কেন?"

প্রৌঢ়া নিজেকে সামলাল। নার্স বলল, "এখন থেকে তোমার আর কোনও চিন্তা নেই। নিজের মানুষ দেখাশোনা করবে। তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো। আবার তো এখানে আসতে হবে। তখন ডাক্তারবাবু মুখ-মাথা-বুক সব ঠিক করে দেবেন।"

"চোখ?" প্রৌঢ়া আচমকা জিজ্ঞাসা করল।

"চোখের জন্যে আলাদা ডাক্তারবাবু আছেন। আগে শরীর ঠিক হয়ে যাক।

তারপর সেই ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে হবে।" নার্স বলল।

সংহিতা এবার তাড়া দিল, "চলো। যেতে হবে।"

টিকলি বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে তো?"

সংহিতা জবাব দেওয়ার আগে প্রৌঢ়া বলল, "বাড়ি তো নোংরায় ভরতি হয়ে আছে। উনি ওখানে গিয়ে থাকবেন কী করে?"

"আমি থাকতে পারলে তুমি কেন পারবে না?"

সংহিতা মাথা নাড়ল, "ঠিক বলেছ, ঠিক।"

হাঁটতে পারলেও টিকলির জন্যে হুইলচেয়ার নিয়ে আসা হল। নার্স সংহিতাকে একটু আড়ালে ডাকল, "দেখুন, ওর অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার পর সবাই এমন ব্যবহার করেছে যেন ওর শৈশব কাটেনি। আর ওই বিশাল ধাক্কা, শরীরের অবস্থাতে ওর মনের বয়স আচমকা কমে গিয়েছিল, নিজেকে বড় ভাবতে পারেনি। তাই এখন থেকে কেউ ওকে বালিকা বা শিশু মনে করে কথা বলবেন না। ওর বয়সি মেয়ের সঙ্গে যেভাবে কথা বলা উচিত, সেই স্বাভাবিক ব্যবহার করবেন।" মাথা নেড়েছিল সংহিতা। নার্সের কথা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল।

গাড়িতে বসতে খুব অসুবিধে হল না। প্রৌঢ়া বসেছিল ড্রাইভারের পাশে। গাড়ি চলতে শুরু করতেই সংহিতার হাত জড়িয়ে ধরল টিকলি, "বাইরেটা কেমন?"

"ভাল। তোমার তো সব জানা। চোখের অপারেশন হয়ে গেলে ওই জানা রাস্তাঘাট আবার দেখতে পাবে।" সংহিতা বলল।

"তোমার সর্দি সেরে গেছে কিন্তু গলাটা আর আগের মতো হল না।" টিকলি শ্বাস ফেলল, "ডাক্তার দেখিয়েছ?"

হাসার চেষ্টা করল সংহিতা, "বয়স হচ্ছে তো, তাই ডাক্তার কিছু করতে পারবেন না।"

খানিকটা যাওয়ার পর রাস্তাটা যেখানে দুটো ভাগ হয়েছে সেখানে পৌঁছে ড্রাইভার পিছন দিকে তাকাল। সংহিতা বলল, "ফিরে চলো।"

টিকলি কী বুঝল সে-ই জানে, বলল, "ওরা আমাকে নার্সিংহোমেই রেখে দিল না কেন? নার্সদিদি খুব ভাল ছিল।"

"সুস্থ মানুষকে কি নার্সিংহোমে রাখে? তা হলে অসুস্থ মানুষেরা এলে কোথায় চিকিৎসার জন্যে থাকবে?" সংহিতা ওর কাঁধে হাত রাখল।

"ব্যথা লাগছে। আমার হাত-পা সব জায়গায় এখনও ব্যথা আছে।"

"ওহো! সরি!"

সিকিউরিটি গার্ড গেট খুলে দিলে গাড়ি লিফটের কাছে নিয়ে গেল ড্রাইভার। তারপর নেমে দরজা খুলে দিল। প্রৌঢ়া এসে অতি সন্তর্পণে টিকলিকে নামাতেই সে বলল, "দোকানগুলো কি বন্ধ? রেডিয়ো বাজছে না কেন?"

"এটা আমার বাড়ি। তুমি যতদিন না পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছ ততদিন এই বাড়িতেই থাকবে। চলো, আমরা এখন লিফ্‌টে ওপরে উঠব।"

"লিফ্‌ট? তোমার বাড়িটা কি খুব উঁচু?"

"না। আমি একটা উঁচু বাড়ির ওপর তলার ফ্ল্যাটে থাকি।"

যে-ঘরটি মিলা ব্যবহার করেছিল সেই ঘরটিতে টিকলির ব্যবস্থা করে দিল সংহিতা। সিক্তা এসে আলাপ করল ওর সঙ্গে। টিকলি বেশ খুশি, বলল, "আমি তুমি, সবাই একসঙ্গে এখানে থাকব?"

প্রৌঢ়া জবাব দিল, "হ্যাঁ গো।"

ছবি আঁকার বাইরের সময়টা যেন কাটতেই চাইত না এতকাল। তিন দশকের একাকিত্ব টিকলি আসামাত্র চলে গেল। সংহিতা হাসল। স্বপ্নে ঈশ্বর বলেছিলেন, ফেরা যায় না। ভুল বলেছিলেন। কারণ পৃথিবীতেও যে স্বর্গ তৈরি করা যায় এটা তাঁর জানা নেই।

মোবাইল ফোন শব্দ করতেই সংহিতা সেটা দেখে অবাক হল। বব্। এখন তো নিউ ইয়র্কে স্যাটান আইল্যান্ডে মধ্যরাত। সুইচ টিপে ওটাকে অন করে সংহিতা প্রায় চিৎকার করে উঠল, "ওঃ বব্! আপনি? কী ভাল যে লাগছে! কিন্তু আপনার ওখানে তো এখন অনেক রাত!"

বব্ হাসলেন, "ইয়েস মাই ডিয়ার, এখন অনেক রাত। কিন্তু এই রাতটা আমি জেগে থাকতে চাই। একটু আগে 'দ্য ডিভাইন কমেডি'-র তৃতীয় ভল্যুমটা শেষ করলাম। করে ভাবলাম তোমার সঙ্গে কথা বলি। তৃতীয় ভল্যুম কী নিয়ে লেখা জানো তো?"

"জানি। প্যারাডাইস।"

বব্ হাসলেন, "পৃথিবীর সর্বত্র ঈশ্বরের মহিমা ছড়ানো ঘোষণা করা সত্ত্বেও দান্তে আমাদের জানাচ্ছেন তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন। স্বর্গে যা দেখেছিলেন তা

এতটাই অতুলনীয় যে, তাঁর পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু বসন্তের দুপুরে এই পৃথিবীতে যখন দেখলেন বিয়েট্রিস একদৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন তিনিও তাকে অনুসরণ করলেন। ভেবে দেখো, আমাদের এই পৃথিবীর কবি অনুভব করলেন ঈশ্বর স্বর্গে আর একটি সূর্য তৈরি করে রেখেছেন, যার ঔজ্জ্বল্য ভয়ানক।" বব্ একটু শ্বাস নিয়ে বললেন, "আচ্ছা, ওই দ্বিতীয় সূর্যকে দেখতে স্বর্গে যেতে হবে, এ কেমন কথা!"

"আপনি এসব কথা ভাবছেন কেন? অনেক রাত হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়ুন।"

"বাঃ, ঘুমিয়ে পড়লে এই ঘর, এই রাতের ঘরটাকে কোনওদিন দেখা হবে না যে!"

"দেখার দরকার কী?"

"না হে। বড় মায়ায় জড়িয়ে ছিলাম এতদিন।"

"কী হয়েছে বলুন তো!"

উত্তর এল না। লাইনটা কেটে গেছে।

সেই বিকেলে, কলকাতায় যখন সাড়ে পাঁচটা তখন সেই ছোটখাটো টাক মাথার মানুষটি, যাঁর চিবুকে সাদা দাড়ি, তাঁকে ফোন করল সংহিতা। বেজে গেল। যেন অনন্তকাল জানান দিচ্ছে তার অস্তিত্ব ফোনের রিং-এ। লাইন কেটে গেল। কেউ ধরছে না ফোনটা? বব্ কি ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন? এখন তো স্যাটান আইল্যান্ডে সকাল আটটা।

আরও ঘণ্টা দুয়েক পরে, কলকাতায় সূর্য ডুবে গেলে বৃদ্ধ মানুষটিকে দ্বিতীয়বার ফোন করল সে। তৃতীয়বারে একটি অচেনা গলা জানান দিল।

সংহিতা ইংরেজিতে বলল, "আমি ভারত থেকে বলছি। বব্‌কে দেবেন।"

"না ম্যাডাম। সম্ভব নয়। আজ সকাল ছ'টায় বব্ ওঁর আফটার লাইফ জার্নি শুরু করেছেন।"

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল শরীরে, মনে। চোখ বন্ধ করল সংহিতা। আফটার লাইফ? জীবনের পরে? হতেই পারে না। জীবনের পরে তো জীবন থাকতে পারে না। বব্-এর মতন মানুষ সেখানে গিয়ে কী করবেন?

কেন যেতে হয় তাঁদের?

সমরেশ মজুমদারের জন্ম ১০ মার্চ ১৯৪৪। শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র। কলকাতায় আসেন ১৯৬০-এ।

শিক্ষা: স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বাংলায় অনার্স, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ।

প্রথমে গ্রুপ থিয়েটার করতেন। তারপর নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লেখা। প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৬৭ সালে। প্রথম উপন্যাস 'দৌড়', ১৯৭৫-এ 'দেশ' পত্রিকায়।

গ্রন্থ: দৌড়, এই আমি রেণু, উত্তরাধিকার, বন্দীনিবাস, বড় পাপ হে, উজান গঙ্গা, বাসভূমি, লক্ষ্মীর পাঁচালি, উনিশ বিশ, সওয়ার, কালবেলা, কালপুরুষ এবং আরও অনেক।

সম্মান: ১৯৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এ ছাড়া 'দৌড়' চলচ্চিত্রের কাহিনিকার হিসাবে বি এফ জে এ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার। ১৯৮৪ সালে 'কালবেলা' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।